বাংলার বৈষ্ণব দর্শন

মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
ডি, লিট (কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

॥ মুখবন্ধ ॥

ক্ষুরধার সূক্ষ্মবুদ্ধির সহিত গভীর রসবোধের একটা বিরোধ আছে বলিয়া আমাদের সাধারণ ধারণা। আমরা মনে করি দীর্ঘদিনের জ্ঞানের চর্চা মানুষের হৃদয়কে শুষ্ক করিয়া দেয়। কিন্তু কথাটি যে সর্বত্র সত্য নহে মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় ছিলেন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাঙ্গলা দেশ যে সকল পণ্ডিতের জন্য গর্ব অনুভব করিতে পারে, তর্কভূষণ মহাশয় ছিলেন অবিসংবাদিতভাবে তাঁহাদের মধ্যে একজন অগ্রণী। ন্যায়, বেদান্ত, স্মৃতি, মীমাংসা, সাহিত্য, অলঙ্কার—প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ছিল তাঁহার সমান পারদর্শিতা; কিন্তু একজন প্রগাঢ় নৈয়ায়িক এবং বৈদান্তিকের চিত্তও যে আবার কতখানি রসস্নাত হইয়া মধুরভাবে দেখা দিতে পারে, তাহা বোঝা যাইত তর্কভূষণ মহাশয় আবার যখন ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনায় ব্যাপৃত হইতেন। ভাগবতপুরাণ তাঁর খুব প্রিয় গ্রন্থ ছিল, তাঁহার মুখে ভাগবত পাঠ শুনিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে, অপূর্ব ছিল তাঁহার এ-বিষয়ে রস-পরিবেষণ। তখন মনে হইত শুধু পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভাগবতের এমন ব্যাখ্যা করা চলে না, শাস্ত্রপারঙ্গামিতার সঙ্গে অনুভূতিশীলতা ব্যতীত ইহা সম্ভব ছিল না।

বাঙ্গলা দেশের বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের একটা গভীর মমতা ছিল। তাঁহার সর্বশাস্ত্রে পরিশীলিত চিত্তকে শেষের দিকে তিনি বাংলার বৈষ্ণব দর্শনের চর্চায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। একদিকে যেমন অদ্বৈত এবং দ্বৈত বেদান্তের সকল মতামতের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, অন্যদিকে পুরাণ-সংহিতাদির সঙ্গে তাঁহার পরিচয়ও ছিল প্রচুর; আবার গোস্বামিগণ-রচিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র এবং সাহিত্য ছিল প্রায় তাঁহার নখদর্পণে। আলোচনার সময়ে তাঁহাকে বড় একটা বই দেখিতে হইত ন

মুখে মুখে প্রায় সব বলিয়া দিতে পারিতেন। শেষের দিকে বৈষ্ণব দর্শন ও ধর্মমত—বিশেষ করিয়া বাংলার বৈষ্ণব দর্শন ও ধর্মমত সম্বন্ধে তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। সেই প্রবন্ধগুলি সুসন্নিবেশিত করিয়াই বর্তমান গ্রন্থখানি প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহার ভিতরকার কোন প্রবন্ধেই কোন প্রসঙ্গের উপর উপর আলোচনা মাত্র হয় নাই; যে প্রসঙ্গকেই তিনি তুলিয়াছেন সেই প্রসঙ্গেই তিনি গভীরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; ইহাই ছিল তাঁহার স্বভাব। প্রবন্ধগুলি একদিকে তথ্যসমৃদ্ধ, অন্যদিকে যুক্তি-বিচার-পরিপূর্ণ। বহু শাস্ত্রের অধিকারী বলিয়া লেখক এক একটি বিষয় সম্বন্ধে নানা দিক্ দিয়া আলোকপাত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু এই সকল দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বকেও তর্কভূষণ মহাশয় যথাসম্ভব সরল এবং সরসভাবেই প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার চিন্তার পরিচ্ছন্নতা তাঁহার প্রকাশের সরলতা ও সরসতার সহায়ক হইয়াছে। আশা করি তাঁহার লিখিত এই 'বাংলার বৈষ্ণব দর্শন' গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠকগণ শুধু লাভবান্ হইবেন না, প্রচুর আনন্দও লাভ করিবেন।

১১।১০।১৯৬৩ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥

এই গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলি প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব হইতে মাসিক বসুমতী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশনের সময় সূচীপত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন শিরোনামায় মুদ্রিত হইলেও সমস্ত লেখার মধ্যে বাংলার বৈষ্ণব দর্শন ও রসতত্ত্বের বিবৃতি যোগসূত্ররূপে বর্তমান।

ভারতবিখ্যাত মহামহোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় বিষয়ের ঐক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রবন্ধগুলি সংকলিত করিয়াছেন। তিনিই সমস্ত প্রুফগুলি দেখিয়া দিয়াছেন এবং অনুচ্ছেদের বিষয় সূচনা সংযোজিত করিয়াছেন। তাঁহার পরিশ্রমের জন্যই বইখানি প্রকাশ করা সম্ভবপর হইল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ি অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় ইহার মুখবন্ধে এই লেখকের বৈশিষ্ট্য ও সংগ্রহের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। তিনিই এই বইখানির প্রকাশ সম্বন্ধে আমাকে প্রথম উৎসাহিত করেন।

ইঁহাদের উভয়কেই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

প্রকাশক

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ—

১। মায়াবাদ

২। সনাতন হিন্দু

৩। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (শাঙ্করভাষ্যানুবাদ সমেত)

৪। বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ (বঙ্গানুবাদ সহিত)

৫। বেদান্ত-সূত্র (শাঙ্করভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সহিত)

সূচী

ভারতীয় দর্শনে বাঙ্গালীর দান

(১)

হিন্দু সভ্যতার ভিত্তি দর্শন

হিন্দু সভ্যতারূপ বিরাট মহাপ্রাসাদ নির্ম্মাণের জন্য যে সকল উপকরণ একান্ত অপেক্ষিত হয়, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি উপকরণ বাঙ্গালা হিন্দু-সভ্যতাকে দিয়াছে, ইহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট সুবিদিত। হিন্দু-সভ্যতার মূল ভিত্তি ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম হিন্দুর পক্ষে ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার ইষ্টলাভের সর্ব্বপ্রধান উপায়। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের প্রসার ও উন্নতির জন্য পারলৌকিক মঙ্গলের হেতু যাগ, দান বা হোমই নহে. কিন্তু তাহাদেরই সঙ্গে শিল্প, বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি সামাজিক জীবনে একান্ত আবশ্যক বস্তুনিচয়ও হইয়া থাকে। সামাজিক জীবন গঠনের উপায়স্বরূপ শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতির সৌকর্য্য ও উৎকর্ষবিধানের জন্য ভারতীয় সভ্যতায় বাঙ্গালী মনীষার যে দান, সে বিষয়ে আলোচনা আজ করিব না। কারণ, আমা অপেক্ষা যোগ্যতর মনীষি-গণ এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করিয়া গিয়াছেন—এখনও করিতেছেন। এই প্রবন্ধে আমি কেবলমাত্র হিন্দুসভ্যতার মূলভিত্তিস্বরূপ যে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র, তাহাতে বাঙ্গালীর মনীষা যে অভূতপূর্ব্ব ও অসাধারণ দান করিয়াছে, তাহারই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

অতীন্দ্রিয়ে প্রত্যয়

বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণের পক্ষে যাহাই বক্তব্য থাকুক না কেন, আমার কিন্তু ইহাই দৃঢ়বিশ্বাস যে, অধ্যাত্মবাদ বা দার্শনিকতার উৎপত্তি ভারতবর্ষেই হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সহিত ইষ্ট বিষয়ের সংযোগ হইলে যে সুখ বা দুঃখনিবৃত্তি হয়, তাহাই যে মানবের একমাত্র স্পৃহণীয় এবং তাহা হইতেই মানবজন্ম সাফল্যমণ্ডিত হয়, তাহা নহে। কিন্তু তাহা হইতে বিলক্ষণ অপ্রাকৃত, ইন্দ্রিয়ের অতীত একটা শাশ্বত এবং শান্তিময় জীবন যে মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য,

সেই লক্ষ্যে উপনীত না হইতে পারিলে পশুপক্ষীর জীবন হইতে মানব-জীবনের কোন পার্থক্য থাকিতে পারে না, এই সিদ্ধান্ত ভারতেই সর্ব্বপ্রথমে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে, এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। কারণ, ঋগ্‌বেদ-সংহিতা হইতে প্রাচীনতর গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই; সেই ঋগ্‌বেদ-সংহিতার পুরুষসূক্তে উপরিলিখিত সিদ্ধান্ত যেরূপ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ঋগ্‌বেদ-সংহিতার আবির্ভাব-সময়ে ভারতীয় ধর্ম্ম ও সভ্যতা উল্লিখিত দার্শনিক সিদ্ধান্তরূপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সিদ্ধান্ত উপনিষদে, ধর্ম্মসূত্রে, পুরাণে ও রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ইতিহাসে উত্তরোত্তর উন্নতি, প্রসার ও স্থিরতা লাভ করিয়াছিল, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট সুবিদিত। এই সিদ্ধান্তের প্রচারক মহর্ষিগণের মধ্যে কেহ বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন কি না, এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপযোগী প্রমাণনিচয় সুলভ নহে। এই কারণে আপাততঃ সে আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া আমি ঐতিহাসিক দার্শনিক যুগে বাঙ্গালী মনীষার দর্শন-শাস্ত্রে দান বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

শঙ্করের পূর্ব্বে আচার্য্যগণ

ঐতিহাসিক ভারতীয় দর্শনযুগে আচার্য্য শঙ্করের নাম সর্ব্বাপেক্ষা সুবিদিত ও গৌরবমণ্ডিত, ইহা সকলেই জানেন। আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি দার্শনিক মত নিরাকরণ করিয়া অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ঐ প্রতিষ্ঠার দ্বারা সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। আপাততঃ প্রতীয়মান বহুবেদ-সমন্বিত সনাতন ধর্ম্মের উপাসনা-পদ্ধতিসমূহ ঐ এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপ মহাভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত আছে, ছিল এবং চিরদিন থাকিবে। এই সিদ্ধান্তের প্রচার ও যুক্তির সহিত ব্যবস্থাপনের দ্বারা আচার্য্য শঙ্কর শতধা বিভক্ত, পরস্পর-বিবদমান, ভিন্ন ভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ঐক্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেই ঐক্য তাৎকালিক ও পরবর্ত্তী হিন্দুসমাজে নবজীবন আনিয়া দিয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। ভগবান্ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পর আচার্য্য শঙ্করের ন্যায় প্রতিভাশালী মহামনীষী মহাপুরুষ আর কেহ এ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু আচার্য্য শঙ্করের অবলম্বিত প্রমাণ

ও যুক্তিনিচয় যে তাঁহারই দ্বারা আবিষ্কৃত এবং ঐ সকল যুক্তি ও প্রমাণের প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিক দার্শনিক আচার্য্যগণের অনুসৃত পথ অবলম্বন করেন নাই, এ কথা বলা যায় না। কারণ, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিক আচার্য্য শবরস্বামী, কুমারিলভট্ট প্রভৃতি বেদপ্রামাণ্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপযোগিতা ও বৌদ্ধ প্রভৃতি দার্শনিক মতের অসারতা বিষয়ে যে সকল যুক্তি ও প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন, প্রায় সকল স্থলে আচার্য্য শঙ্কর তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। নূতনভাবে প্রাঞ্জলভাষায় বলিবার শক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল বলিয়া ঐ সকল কথা নূতন বলিয়া আপাত-প্রতীয়মান হইলেও উহার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক যে পরিপূর্ণভাবে আলোচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। অপর দিকে বৌদ্ধ দর্শনাচার্য্য নাগার্জ্জুন, মৈত্রেয়, আর্য্যাসঙ্গ, বসুবন্ধু ও দিঙ্‌নাগাচার্য্য প্রভৃতি ব্যবহারিক দ্বৈতবাদ নিরাকরণের জন্য ও বিজ্ঞানবাদ এবং শূন্যবাদ স্থাপন করিবার জন্য যে সকল যুক্তি ও প্রমাণের অবতারণা করিয়াছিলেন, আচার্য্য শঙ্করও অদ্বয়ব্রহ্মবাদের স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সেই সকল প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্য যে অধিক মাত্রায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাও অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বিদিত আছেন। সুতরাং মৌলিক তত্ত্ব ব্যবস্থাপনের অনুকুল যুক্তি ও প্রমাণের অবতারণায় আচার্য্য শঙ্কর যে পূর্ব্বাচার্য্য-গণের প্রদর্শিত পথকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায়।

বৌদ্ধ আচার্য্য শান্তরক্ষিত

আচার্য্য শঙ্করের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে বঙ্গদেশে এক জন বৌদ্ধ আচার্য্যের আবির্ভাব হয়। তাঁহার নাম শান্তরক্ষিত। তিনি বিক্রমশিলা নামক তাৎকালিক প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় বৌদ্ধ-বিহারে আচার্য্য-পদে বহুদিন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নেপাল-রাজের প্রার্থনানুসারে তিব্বতে গমন করিয়া তথায় তিনি সর্ব্বপ্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে 'তত্ত্বসংগ্রহ' নামে একখানি গ্রন্থ কিছু দিন হইল বরোদা ষ্টেট লাইব্রেরী হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলে বাঙ্গালীমাত্রেরই হৃদয় গৌরবে ও আনন্দে স্ফীত হইয়া থাকে। কুমারিলভট্ট, শবরস্বামী প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের উদ্ভাবিত

যুক্তি ও প্রমাণ-সমূহকে তিনি যে ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন ও খণ্ডন করিয়া বৌদ্ধমত-সমূহ সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা দেখিলে দার্শনিকমাত্রেই বিস্ময়াবিষ্ট ও আনন্দিত হইবেন। বাঙ্গালা দেশ তখন বৌদ্ধপ্রধান; বর্ণাশ্রমধর্ম্মমূলক বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি সাধারণতঃ লোকের শ্রদ্ধা নিতান্তই কমিয়া গিয়াছিল, বেদোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান একেবারে কমিয়া গিয়াছিল, এবং প্রসারণশীল বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শনের প্রতি সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই সকল কারণে আচার্য্য শান্তরক্ষিতের আস্তিক-দর্শন খণ্ডনের জন্য এই তত্ত্বসংগ্রহ নামক প্রভাবশালী গ্রন্থের প্রণয়ন তৎকালে বঙ্গীয় মনীষিগণের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছিল, এবং তাহা বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসারের প্রতি বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে আচার্য্য শঙ্করের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া শ্রুতিমূলক বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনর্গঠনবিষয়ে যেরূপ সাহায্য করিয়াছিল, বঙ্গদেশে, নেপালে ও তিব্বত প্রভৃতি সত্যধর্ম্মহীন দেশে বাঙ্গালী বৌদ্ধাচার্য্য শান্তরক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারে ও স্থাপনায় সেইরূপ প্রভাবই যে বিস্তার করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

বাঙলার আস্তিক দর্শন

আচার্য্য শান্তরক্ষিতের পর বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যের প্রভাব ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইলে বহু আস্তিক-মতাবলম্বী দার্শনিকের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ইঁহাদিগের মধ্যে ন্যায়দর্শনে শ্রীধর আচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ তর্কালঙ্কার, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, গদাধর ভট্টাচার্য্য ও বিশ্বনাথ প্রভৃতির নাম বঙ্গের দার্শনিক ইতিহাসে চিরদিনের জন্য সমুজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। বেদান্তদর্শনে পাশ্চাত্ত্য বৈদিককুলভূষণ আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধি, গীতার্থসন্দীপনী ও ভক্তিরসায়ন নামক তিনখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া সমগ্র ভারতে দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে অতুলনীয় খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

মধুসূদন প্রতিভা

বাঙ্গালী নৈয়ায়িক-শ্রেষ্ঠ রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ তর্কালঙ্কার, মথুরানাথ তর্কবাগীশ ও গদাধর ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থ যিনি অধ্যয়ন করেন নাই, বর্ত্তমান সময়ে তিনি যেমন নৈয়ায়িকরূপে সমাদৃত হইতে পারেন না, সেইরূপ আচার্য্য

মধুসূদন সরস্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধি নামক সুবিদিত গ্রন্থের রসাস্বাদনে যিনি অসমর্থ, তিনি কিছুতেই বর্ত্তমান সময়ে বেদান্ত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে, বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু-দর্শন শাস্ত্রে প্রবেশলাভ করিতে হইলে, বাঙ্গালী দার্শনিক আচার্য্যগণের প্রণীত কতিপয় গ্রন্থে ব্যুৎপত্তি একান্ত আবশ্যক। ঐ ব্যুৎপত্তি না থাকিলে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটন কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে, ইহা ধ্রুব-সত্য এবং সংস্কৃত-দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যেও ইহা সুবিদিত। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা বিশেষ গৌরবের বিষয় বলিতে হইবে। সুতরাং সনাতন হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তিস্থানীয় ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রে বাঙ্গালী দার্শনিকগণের যে দান, তাহা অপর সকল দেশীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণের দান অপেক্ষা কোন অংশেই অল্প নহে। প্রত্যুত কোন কোন অংশে ঐ দান যে অতুলনীয়, তাহা বলিতেও কোন দ্বিধা বোধ হয় না।

অধ্যাত্ম দর্শনে মহাপ্রভুর অবদান

এ পর্য্যন্ত আমি বাঙ্গালায় দার্শনিকতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে বাঙ্গালায় অসাধারণ দার্শনিকতার কথা কিছুই বলা হয় নাই। ভারতবর্ষ দার্শনিকের দেশ। ভারতে প্রতি নগর, প্রতি গ্রাম, প্রতি পল্লী অসাধারণ প্রতিভাবান্ দার্শনিক মহানুভবগণের পাদরজঃস্পর্শে চিরদিন পবিত্রীকৃত হইয়া রহিয়াছে। এ দেশের আকাশে, এ দেশের বাতাসে, এ দেশের আলোকে, এমন কি, এ দেশের অন্ধকারেও যে আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ দার্শনিকতার প্রতিচ্ছবি প্রতিমুহূর্ত্তেই পরিস্ফুরিত হইয়া থাকে, তাহার সহিত যাহার পরিচয় নাই, তাহার ভারতে মানুষ হইয়া জন্ম-গ্রহণ নিরর্থক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ হেন দার্শনিক ভারতে সকল প্রদেশেই বড় বড় দার্শনিক আচার্য্য আবির্ভূত হইয়া গিয়াছেন। ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্ররূপ বিরাট প্রাসাদ-নির্ম্মাণে আবশ্যক উপকরণসমূহ ভারতের সকল প্রদেশ হইতেই যথাসময়ে সংগৃহীত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। এই উপকরণ-সংগ্রহকার্য্য যত দিন হিন্দুসভ্যতা বিদ্যমান থাকিবে,—তাহাই বা বলি কেন? যত দিন ভারত বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন অবিশ্রান্তভাবেই চলিবে, এ কথা বলিতে আমি অণুমাত্র সঙ্কোচবোধ করি না। এই কারণে, ভারতের দার্শনিক-ভাণ্ডারে আবশ্যক সমুজ্জল রত্নবিতরণ বিষয়ে জননী বঙ্গভূমির মহাপ্রভাবশালী কৃতী সন্তানগণের যে পরিশ্রম, যে

মনীষা ও যে প্রতিভার ব্যবহার, তাহা যে ভাবে পূর্ব্বে আমি বিবৃত করিয়াছি, তাহাতে বাঙ্গালী মনীষার বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত পরিচয় এখনও পরিস্ফুটভাবে প্রকাশিত হয় নাই। এই পরিচয় পাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে যিনি আমাদের মানস-পথে সমুদিত হইয়া থাকেন, তাঁহারই কথা এইবার আমি বলিব। তাঁহার প্রচারিত দার্শনিকতাময় মহাধর্ম্মের নাম হইতেছে প্রেম-ভক্তি। সেই মহাপ্রভুকে জানিতে হইলে, তাঁহার প্রচারিত প্রেমভক্তিরূপ মহাধর্ম্মকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার আবির্ভাবের সমসাময়িক ভারতীয় দর্শনের রীতি, নীতি, গতি ও অবস্থার একটু আলোচনা আবশ্যক।

(২)

মোক্ষ-সাধনার ত্রিধারা

শ্রৌত যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পৌরাণিক যুগ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ভারতে দার্শনিক চিন্তার ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল ভাগীরথীর—মোক্ষ বা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ অতলস্পর্শ ও অপার মহাসমুদ্রই একমাত্র গন্তব্য ও লক্ষ্যরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। এই যে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বা সর্ব্বপ্রকার বন্ধ হইতে ঐকান্তিক নিষ্কৃতি, ইহাই হইল হিন্দু-সভ্যতার চরম ও পরম লক্ষ্য। এই বন্ধনিবৃত্তি বা পূর্ণ স্বাধীনতা অথবা 'পরিপূর্ণ স্বরাজ' লাভ করিবার যাহা কিছু সাধন, তাহাকেই কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের নেতা মহর্ষিগণ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্ররূপ গঙ্গাপ্রবাহকে তিনটি ধারায় পরিণত করিয়াছিলেন। তাই কর্ম্মধারায় প্রবাহিত ভারতীয় দর্শন—পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন এই নামে অভিহিত হইয়াছিল, জ্ঞানধারায় প্রবাহিত ভারতীয় দর্শন—উত্তরমীমাংসা এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল; আর ভক্তিধারায় বহনশীল ভারতীয়-দর্শন অধ্যাত্মশাস্ত্র বা ঐকান্তিকদর্শন নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পরম পুরুষার্থ মুক্তি

এই আত্যন্তিক বন্ধনিবৃত্তি বা মুক্তি ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের সৃষ্ট বা কল্পিত নহে, প্রত্যুত এই মুক্তিই স্বতঃসিদ্ধ ভাবে ভারতীয় দার্শনিক মহর্ষিগণের অন্তঃকরণে সমুদিত হইয়া ভারতের কি আস্তিক কি নাস্তিক সকল প্রকার

দর্শনেরই সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাই হইল পাশ্চাত্ত্য দর্শন হইতে ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন যাঁহারা করিয়া থাকেন, পাশ্চাত্ত্য দর্শন হইতে ভারতীয় দর্শনের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি যদি না থাকে, তাহা হইলে ভারতীয় দর্শনের সহিত পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মৌলিক বৈলক্ষণ্যদৃষ্টি তাঁহাদের লুপ্ত হইবে, এবং তাহার ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের উৎপত্তি, লক্ষ্য ও প্রগতি বিষয়ে তথ্য-নির্দ্ধারণ তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিবে। আসল কথা এই হইতেছে যে, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় বা নিজের বুঝিবার দোষে পরাধীনতা—সহস্রাধিক বর্ষ ব্যাপিয়া হিন্দুজাতির বুকের উপর অনপনেয় জগদ্দল পাথরের ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিলেও পূর্ণ স্বাধীনতা বা মোক্ষের প্রতি ঐকান্তিক অভিলাষই যে হিন্দুসভ্যতার মূলভিত্তি, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। আত্যন্তিক বন্ধনিবৃত্তি বা মোক্ষই মানবের পরম পুরুষার্থ, ইহা মানবসমাজে সর্ব্বাগ্রে ঘোষণা করিয়াছে হিন্দু-দর্শন। হিন্দু-দর্শনের এই সিদ্ধান্তের উপর হিন্দুর নিখিল শাস্ত্রই অধিষ্ঠিত ছিল, আছে ও ভবিষ্যতেও প্রলয়কাল পর্য্যন্ত থাকিবে, তাহা হিন্দুশাস্ত্র-মর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন। এই সর্ব্ববন্ধনিবৃত্তির কামনা ভারতের জ্ঞানী, কর্ম্মী ও ভক্ত সকলকেই এই পথে পরিচালিত করিয়া থাকে। ভারতের দেবেন্দ্র ও অসুরেন্দ্র উভয়েই একই সময়ে এই কামনার প্রেরণায় সাম্রাজ্য, সুখ, সম্পদ্ প্রভৃতি প্রাপঞ্চিক ভোগ্য-নিচয়কে ঘৃণার সহিত দূরে পরিহার করিয়া, সমিৎপাণি হইয়া মোক্ষোপায়বিদ্ জ্ঞানীর পর্ণকুটিরে শিষ্যভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; এবং দেবর্ষি নারদের ন্যায় মহাজ্ঞানী ও মহাভক্তকেও মহর্ষি সনৎকুমারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। পরলোক আছে কি নাই—এই সংশয়ে বিচার দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় করিবার জন্য শ্রৌত মহর্ষিগণের ঐকান্তিক আগ্রহের পরিচয় শ্রুতিতে, ইতিহাসে, পুরাণে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রচুর পরিমাণে উপলব্ধ হইয়া থাকে।

অবিসংবাদিত তত্ত্ব—মুক্তি কামনা

কিন্তু মোক্ষ বা আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি মানবের পক্ষে সম্ভবপর কি না, এইরূপ সন্দেহ কখনও কোন শাস্ত্রকার মহর্ষির মনে উদিত হইয়াছিল, এই বিষয়ের ইঙ্গিত ও নিখিল সংস্কৃত শাস্ত্রজলধি মন্থন করিলেও খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। মোক্ষের কারণ কি, তাহা লইয়া নানা মতবাদের

বন্যায় হিন্দু দর্শনগ্রন্থ আপ্লাবিত হইলেও মোক্ষের প্রামাণিকত্ব বা স্বতঃসিদ্ধত্ব বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে, ইহা লইয়া মাথা ঘামান নিষ্প্রয়োজন, এইরূপ ধারণা যে প্রত্যেক দার্শনিক আচার্য্যের হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ খুঁজিয়া বাহির করা একান্ত কঠিন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বদ্ধ ব্যক্তির মুক্তির কামনা যে স্বাভাবিক, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

জীবভাব তুচ্ছ

কিন্তু মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে অহমর্থের বা জীবের যে নিবৃত্তি, তাহা ব্যবহারিক মানবের পক্ষে কিছুতেই স্পৃহণীয় হইতে পারে না, ইহা আমরা সকলেই বুঝি। কিন্তু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাকামী বা মুমুক্ষু মনস্বিগণ, জীবভাবের অস্তিত্ব যদি এই পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বা সর্ব্ববন্ধননিবৃত্তির প্রতিকূল হয়, তবে মোক্ষের জন্য জীবভাবের ধ্বংসকেও অস্বীকার করিতে কোন প্রকার সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। ভগবান্ বুদ্ধদেব, মহর্ষি গৌতম, কণাদ ও জৈমিনি, আচার্য্য শঙ্কর ও গৌড়পাদ প্রভৃতি মোক্ষবাদী সকল মহাপুরুষগণই মুক্তির অন্তরায় বলিয়া জীবভাবের বিধ্বংস-সাধনকেও পরম পুরুষার্থের অবিনাভূত বলিতে অণুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

বন্ধের কারণে মতভেদ

বন্ধ যদি আগন্তুক হয় অর্থাৎ জীবের স্বাভাবিক না হয়, তাহা হইলে তাহার আত্যন্তিক নিবৃত্তি যে এক দিন হইবেই, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। ইহাই হইল মুক্তিবাদী দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তকে ভিত্তিস্থানীয় করিয়া সকল আস্তিক দর্শনরূপ মহাপ্রাসাদ রচিত হইয়াছে। বন্ধ যে জীবের স্বাভাবিক অবস্থা নহে, তাহা সকল দার্শনিক আচার্য্য একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু এই অস্বাভাবিক অবস্থা কোন্ কারণ হইতে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা লইয়া দার্শনিক আচার্য্যগণের মধ্যে নানা মতবাদ সৃষ্ট হইয়াছে। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন, জগতে বস্তুমাত্রই ক্ষণিক, কোন বস্তুই একক্ষণের অধিক থাকিতে পারে না, এইরূপ কতকগুলি ক্ষণিক বস্তুকে এক নিত্য ও আত্মা বলিয়া যে জানা, তাহা ভ্রান্তিজ্ঞান, সেই ভ্রান্তিজ্ঞানই প্রমাদের, সকল প্রকার অনর্থ ও অশান্তির মূল,

এই মিথ্যা জ্ঞান বা অবিদ্যা ভোগস্পৃহা বা তৃষ্ণাকে উৎপাদন করিয়া আমাদিগকে সংসারে বদ্ধ করিয়া থাকে। এই অবিদ্যা বা মিথ্যা জ্ঞান কখন্ হইতে দেখা গিয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে কি হইবে, কেমন করিয়া কোথা হইতে কবে ভীষণ শত্রু ঢুকিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা জানিবার উপায় নাই বলিয়া শত্রুর হস্তে আত্মসমর্পণ করায় কোন পুরুষার্থলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই।

বন্ধের নিবৃত্তিই কাম্য

কি হইলে ঐ বন্ধের বিনাশ সাধিত হইবে, তাহার জন্যই চেষ্টা করিতে হইবে, ইহাই হইল বিবেকী ব্যক্তির একমাত্র কর্তব্য, ইহা কে অস্বীকার করিবে? মিথ্যা-জ্ঞান যথার্থ-জ্ঞান দ্বারা উন্মুলিত হয়, ইহা কে না বুঝে? সেই যথার্থ জ্ঞান প্রমাণের অধীন, সুতরাং প্রমাণের সাহায্যে যথার্থ-জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া এই অনিত্য ও ক্ষণিক বস্তুনিচয়ে নিত্য ও স্থায়ী এই প্রকার জ্ঞানরূপ মিথ্যা দৃষ্টিকে বিনাশিত করিতে পারিলেই তন্মূলক বন্ধ বা সংসার হইতে আমরা নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিব। সকল বস্তুই ক্ষণিক, ক্ষণিক না হওয়া বস্তুমাত্রের পক্ষে একবারে অসম্ভব, এইরূপ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। এই যথার্থ জ্ঞান লাভ করিবার উপায় ধ্যান, ধারণা ও সমাধি।

বৌদ্ধ-সন্ন্যাসে সকলের অধিকার

সংসারে থাকিয়া গৃহস্থের পক্ষে এই ধ্যান, ধারণা, সমাধিলাভের সম্ভাবনা নিতান্ত দুর্ল্লভ, তাই মুমুক্ষু ব্যক্তিমাত্রকে সংসারাশ্রম ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে। মুক্তি কামনা বদ্ধ জীবমাত্রেরই স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম, এই কামনার উদয় হইলেই মানবমাত্র সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবার অধিকারী হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রাহ্মণ বা দ্বিজাতিমাত্রের সন্ন্যাসাশ্রমে অধিকার আছে, অপরের নাই, তাহারা চিরকাল বদ্ধ থাকিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এই আস্তিক বা শ্রৌতসিদ্ধান্ত, ভগবান্ বুদ্ধদেব স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে শ্রৌতসিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত, তাহা নহে, শ্রুতি মানুষের রচিত, মানুষের যখন ভ্রান্তি সম্ভবপর, তখন মানুষের রচিত শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে যে যে জ্ঞান হয়, তাহা যে সবই যথার্থ জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান হইবে, ইহা বলা যায় না। এই প্রকার শ্রুতিবিরুদ্ধ মতপ্রচার দ্বারা

ভগবান্ বুদ্ধদেব নাস্তিক্যবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়া মনুষ্যমাত্রেরই জাতিবর্ণ নির্ব্বিচারে যে তত্ত্বজ্ঞানলাভের অধিকার আছে, তাহার প্রচার করেন, ইহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট সুবিদিত।

শূন্যবাদের অসীম প্রভাব

এই ক্ষণিকবাদ বৌদ্ধ দর্শনের মূলভিত্তি হইলেও কালবশতঃ এই ক্ষণিকবাদ ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদে ও সর্ব্বশেষে শূন্যবাদে পরিণত হইয়াছিল। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ বা শূন্যবাদ বৌদ্ধ দার্শনিক আচার্য্যগণের অসাধারণ মনীষার প্রভাবে যেরূপ প্রসার ও উন্নতিলাভ করিয়া ভারতের চতুঃসীমা অতিক্রম পূর্ব্বক সুদূর দেশান্তর-সমূহে প্রভাব বিস্তার করতঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ভারতের কোন আস্তিক দর্শনই যে সেইরূপ ভাবে বৈদেশিক রাজ্যে প্রসার ও উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই, তাহাও ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের নিকট সুবিদিত, সুতরাং এখানে তদ্বিষয়ে অধিক উল্লেখ করিবার কোন আবশ্যকতা বোধ করি না।

মোক্ষ স্বতঃসিদ্ধ

কি ন্যায়, কি বৈদেশিক, কি সাংখ্য, কি যোগ, কি মীমাংসা, কি বেদান্ত—সকল আস্তিক দর্শনও মোক্ষের অস্তিত্বে সন্দেহ উত্থাপন করে না। কিন্তু তাহা যে স্বতঃসিদ্ধ, কারণ তাহাই জীবের স্বাভাবিক অবস্থা, তাহা সকল আস্তিক দর্শনেই অঙ্গীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বন্ধ বা অস্বাভাবিক অবস্থার নিরাকরণ করিতে হইলে কোন্ উপায় অবলম্বন করিবে অর্থাৎ কি প্রকার জ্ঞানের সাহায্য অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা লইয়া পরস্পরের মধ্যে নানা মতবাদ সৃষ্ট হইয়াছে। মোক্ষের আত্যন্তিক বন্ধনিবৃত্তিরূপতা ও মোক্ষের স্বাভাবিকত্ব বিষয়ে সকল আস্তিক দার্শনিকই একমত। এইভাবে যে মোক্ষপ্রবণতা, ইহাই হইল ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রসমূহের বৈশিষ্ট্য, এই মোক্ষকামনাই ভারতীয় সভ্যতার প্রাণ। শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণ কাব্য ও অলঙ্কার প্রভৃতি যে কোন শাস্ত্রেই দৃষ্টিপাত করা যায়, সেইখানেই সুস্পষ্টভাবে ভারতীয় আত্মার এই সংহত মোক্ষকামনারূপ ভাগীরথী কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটি পথকে অবলম্বন করিয়া আত্যন্তিক বন্ধনিবৃত্তি বা পূর্ণ স্বাধীনতা বা ভারতীয় স্বরাজরূপ অগাধ অতলস্পর্শ মহাসমুদ্রের

দিকে অনিবার গতিতে ধাবমান হইতেছে, অনাদিকাল হইতে এই মুক্তিকামী বিরাট ভারতীয় জনসঙ্ঘ, সহস্রাধিক বর্ষ ব্যাপিয়া কেন যে পরাধীনতা সহন করিতেছে, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

মুক্তির স্বরূপ রহস্যময়

এই মুক্তি বা পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতীয় কি নাস্তিক কি আস্তিক সকল দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য হইলেও এবং হাজার হাজার বৎসর ব্যাপিয়া ভারতীয় দর্শনাচার্য্যগণ এই মুক্তিরই সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য বর্ণনায় কায়মনোবাক্যে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিলেও ইহার স্বরূপ যে চিরদিনই কুহেলিকাময় রহিয়াছে, তাহা কিন্তু অস্বীকার করিবার সম্ভাবনা দেখি না। কেন যে দেখি না, তাহা বলি।

মুক্তি আত্মার স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ, কিন্তু এই স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপকে আত্মা হারাইল, যদি একবার হারাইয়াছে, তবে তাহা ফিরিয়া পাইলেও আবার হারাইবে না কেন? এই তিনটি প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে যে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আমার মনে হয় না। উত্তর অনেক প্রকার অনেক গ্রন্থেই লিখিত আছে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সকল উত্তরের মধ্যে কোন উত্তরটিই যে অনুসন্ধানপর প্রমাণপরতন্ত্র হৃদয়ের সন্তোষকর নহে, এ কথা ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের প্রতি গাঢ় বিশ্বাসসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কর্ণপীড়াকর, ইহা আমার অবিদিত নহে। কিন্তু ইহা যে বস্তুস্থিতি অর্থাৎ ইহা যে বাস্তব সত্য, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

অনাদি অজ্ঞান-প্রবাহ

সৃষ্টি কবে হইয়াছে, তাহা বলা যায় না; কারণ, সৃষ্টিপ্রবাহের কোন আদি নাই; সুতরাং জীবের সকল অনর্থের মূলীভূত কারণ যে মিথ্যা জ্ঞান, তাহা ধারাবাহিকভাবে চলিতেছে, এই মাত্র। ঐ অজ্ঞান-প্রবাহের মধ্যে কোন্ অজ্ঞান-ব্যক্তিটি সকলের আদি, তাহা ধরিবার সামর্থ্য কাহারও নাই, ইহাই হইল সকল দার্শনিকেরই একমাত্র উত্তর। এই উত্তর না মানিলে নাস্তিকতার তীব্র অপবাদ অনতিক্রমণীয় হইয়া থাকে, তাহা আমাদের কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কার্য্যকারণ-তথ্য নির্ণয়ের জন্য ব্যাকুল দার্শনিক অন্তঃকরণ যে এই উত্তরে সন্তোষলাভ করিবে, তাহার জিজ্ঞাসার দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইবে,

ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। তাই বলিতেছিলাম, ভারতীয় সকল দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য যে মুক্তি, তাহার স্বরূপ চির-কুহেলিকাবৃতই রহিয়াছে। বন্ধের তত্ত্ব না বুঝিলে মুক্তির তত্ত্ব যে বুঝা অসম্ভব ব্যাপারের মধ্যে নিপতিত হয়, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

একজীববাদে অ-মুক্তি

মুক্তির তত্ত্ব নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক আচার্য্য শঙ্কর স্বকৃত শারীরক সূত্রের ভাষ্যে একজীববাদের স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া, এখনও পর্য্যন্ত কাহারও মুক্তি হয় নাই, এই কথা বলিতে কোন দ্বিধাবোধ করেন নাই। তখন নিঃসঙ্কোচে ইহা বলিতে পারা যায় যে, ভারতীয় দার্শনিক আচার্য্যগণের মুক্তি-সাধনান্বেষণা এখনও সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই, কখনও যে হইবে, সে আশাও অতি বিরল। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র-সমূহের ইহা উৎকর্ষদ্যোতক বা অপকৃষ্টতার পরিচায়ক, তাহার উত্তর এ প্রবন্ধে দিবার কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। কিন্তু মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রেমভক্তিসিদ্ধান্তের রহস্য বুঝিতে হইলে ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিক মত-সমূহের মুক্তি বিষয়ে যে এইরূপ অস্পষ্টভাবের উত্তর, তাহা জানা একান্ত আবশ্যক বলিয়াই আমি এ স্থলে তাহার অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন

চরম পুরুষার্থ—মুক্তি না ভক্তি?

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য। ইহা বাঙ্গালীর নিজস্ব জিনিষ। বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বৈষ্ণবপ্রধান দেশ। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য্য রামানুজ হইতে বল্লভাচার্য্য পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ভক্তিবাদ বিভিন্ন দার্শনিক সিদ্ধান্তের আনুকূল্যে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। এই অবিচ্ছিন্ন ভক্তি-সাধনা শ্রীমন্মহাপ্রভুর রাধাভাবদ্যুতি-শবলিত ভক্তিতত্ত্বে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। সুতরাং বঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ভারতবর্ষের সকল প্রকার বৈষ্ণব ধর্ম্ম হইতে বিলক্ষণ ও বিশিষ্ট। মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি দার্শনিক কিম্বা ভক্তমণ্ডলী সকলেই মোক্ষকে চরম পুরুষার্থরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভক্তিকে কোথাও সাধ্য বলেন নাই, মুক্তির সাধনরূপেই ইহার স্থান। সুতরাং ভক্তিই শ্রেষ্ঠতম পরম পুরুষার্থ ইহা একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুই প্রচার করিয়াছেন। আর্য যুগে, বিশেষতঃ পৌরাণিক যুগে, চরম পুরুষার্থরূপে যে সকল সিদ্ধান্ত রহিয়াছে—তাহার যে পরিমাণ গভীর গবেষণার প্রয়োজন ততটা এখনও হইতেছে না। সবিশেষ পরিশ্রম সহকারে বৈদিক সংহিতাদি শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া তাহাতে ভক্তিকে অথবা মুক্তিকে চরম পুরুষার্থ বলা হইয়াছে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কিন্তু এই বিষয়ে এ পর্য্যন্ত আমাদের যাহা উদ্যম হইয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে।

মুক্তির সাধন নহে—ভক্তিই সাধ্য

বৈদিক যুগে কি সিদ্ধান্ত ছিল তাহা জানিতে হইলে আচার্য্যগণের গ্রন্থ প্রণিধানযোগ্য। দর্শনযুগে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, মোক্ষই চরম পুরুষার্থ। বৌদ্ধযুগেও মুক্তিকে অধ্যাত্ম-জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া প্রচার করা হয়। আচার্য্য শঙ্কর জ্ঞানবাদী। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, বেদান্ত সূত্র, গীতা ও উপনিষদের মুখ্য প্রতিপাদ্য প্রয়োজন মুক্তি। অদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্করের পরবর্ত্তী আচার্য্য রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। তিনি দ্বৈতপ্রপঞ্চের

অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন বটে কিন্তু তাঁহার মতে মুক্তিই অধ্যাত্ম সাধনার চরম পরিণতি। মধ্বাচার্য্যও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। তাঁহারও সিদ্ধান্ত ছিল মোক্ষই মনুষ্য জীবনের চরম আপ্তব্য, পরম পুরুষার্থ।

শ্রীচৈতন্যের স্বাতন্ত্র্য

কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ইহাই হইল যে, মুক্তি হইতেও ভক্তির উৎকর্ষ সমধিক। অর্থাৎ ভক্তিই চরম ও পরম পুরুষার্থ। বঙ্গের এই বিলক্ষণ ভক্তিতত্ত্ব শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামিদ্বয় প্রচার করিয়া বঙ্গীয় দার্শনিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীজীব গোস্বামীও ভক্তিতত্ত্বের গভীর বিশ্লেষণ দ্বারা মোক্ষবাদী ভারতবর্ষকে এক অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব অভিনব রসসম্ভার দান করিয়াছেন। বৌদ্ধ অভ্যুদয়ের পর হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মোক্ষবাদ প্লাবিত ভারতবর্ষ এইরূপ অপূর্ব্ব শিক্ষার সন্ধান পায় নাই।

মুমুক্ষা পিশাচী

শ্রীরূপ গোস্বামী অতি পরিষ্কার করিয়াই বলিয়াছেন—

"ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ ভক্তি-সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

—ভক্তিরসামৃত সিন্ধু

যতদিন পর্য্যন্ত মনুষ্যহৃদয়ে ভোগস্পৃহার মত মুক্তিস্পৃহা পিশাচী-তুল্য বাস করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভক্তিসুখ তাহাতে প্রবেশ করিবে না। যে ভারত যুগযুগান্তর হইতে উদাত্ত কণ্ঠে মুক্তির মহিমা প্রচার করিয়া আসিতেছে, সেই ভারতেই কন্থা-কৌপীনধারী একজন বাঙ্গালী বৈরাগী দৃঢ়কণ্ঠে নিঃসঙ্কোচে বলিলেন—মুক্তিস্পৃহা পিশাচী তুল্য। ইহাই হইল বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য। শ্রীগৌরাঙ্গের শক্তিসমৃদ্ধ শ্রীসনাতন তদীয় বৃহদ্‌ভাগবতামৃত গ্রন্থে এই ভক্তিবাদ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত হইল, শ্রীমদ্‌ভাগবত সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক ভক্তিশাস্ত্র এবং ইহা উপনিষদের সার। সেই সমস্ত উপনিষদের মর্ম্মার্থ শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় বিধৃত রহিয়াছে।

গীতার সংক্ষিপ্ত উপদেশ স্থিতপ্রজ্ঞ

অনেকগুলি শ্লোক দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞের বা জীবন্মুক্তের লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে- শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়। যেমন—দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ—নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ, এই প্রকার বহু উক্তি দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞের স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। স্থিতপ্রজ্ঞ কর্ম্ম করিবেন বটে কিন্তু কর্ত্তৃত্বের অভিমান তাঁহাতে থাকিবে না। অথচ শ্রীভগবানের উপদেশ হইল, "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ"—কেহই এক মুহূর্ত্তও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং শ্রীভগবদুপদেশ অনুসারেই তিনি কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য হইয়া লোকহিতার্থ কর্ম্ম সম্পাদন করেন। তাঁহার দেহ সক্রিয় হইলেও অন্তরে তিনি 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ অহঙ্কার দ্বারা সর্ব্বথা অস্পৃষ্ট। যন্ত্রি-চালিত যন্ত্রবৎ তিনি ভগবৎ প্রেরণানুসারেই কর্ম্ম করিয়া যান।

জীবন্-মুক্তি

"শান্তিং নির্ব্বাণ পরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি"—এই শ্লোকে নির্ব্বাণ-মুক্তির কথাও বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহা খুব সংক্ষেপেই উক্ত হইয়াছে। নির্ব্বাণমুক্তির অবস্থায় জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য তিরোহিত হয়। জীব ও ব্রহ্মের ভেদ কল্পিত, সুতরাং উহা অবিদ্যারই কার্য ও অপারমার্থিক। ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ। এই তত্ত্বের অনুশীলন জীবভাব দূর করিবার পক্ষে অনুকূল। কিন্তু ব্রহ্মাত্মবোধ সম্পাদন অত্যন্ত দুষ্কর। তাই শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন—"অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।" নিরুপাধিক ব্রহ্মতত্ত্বের উপলব্ধি যতক্ষণ দেহাত্মবুদ্ধি থাকিবে ততক্ষণ হইবে না। উপর্য্যুক্ত মুক্তির দ্বৈবিধ্য থাকা সত্ত্বেও সাধকসম্প্রদায় জীবন্মুক্তির দিকেই সবিশেষ আকৃষ্ট হন। মনের এমন একটা অবস্থা আসিবে যখন সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব চলিয়া যাইবে, চিত্তে অনুদ্বেগময় প্রশান্তি বিরাজ করিবে, দেহ আছে তাহার প্রযত্নও রহিয়াছে অথচ আভিমানিক কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি নাই, পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় জীবাত্মা শীতোষ্ণাদি দ্বারা অস্পৃষ্ট, অবিকৃত রহিয়াছে—শ্রেষ্ঠ সাধকগণ এই অবস্থা লাভ করিবার জন্যই যত্নশীল হইয়া থাকেন।

খারামতা সুকর—সনাতন মত

কিন্তু শ্রীসনাতন গোস্বামী মুক্তি ও ভক্তির স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে

অতি পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন স্বারামতা অর্থাৎ জীবন্মুক্ত অবস্থার প্রাপ্তি ত সহজ। অহঙ্কার পরিত্যাগক্রমে তাহা স্ব-করই হইয়া উঠে। ভূয়োদর্শন ও বিবেক দ্বারা সংসারের অবস্থার সম্যক্ উপলব্ধি হইলে জীবের ভ্রান্ত কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি চলিয়া যাইতে পারে। সৃষ্টির অভাবনীয় বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য করিলে একটি বিলক্ষণ শক্তি যে তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে এইরূপ বোধ আপনিই আসে। তখন সাধক আপনার কর্ত্তৃত্ব যে নিতান্তই আভিমানিক তাহা বুঝিতে পারেন। ঈশ্বরের বিভুত্ব ও অমিত শক্তিমত্তা সাধককে বুঝাইয়া দেয় যে আমার স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব কোথায়? আমি ত যন্ত্রিচালিত একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র মাত্র!

আত্মারাম চরিতার্থ—প্রেম চির অতৃপ্ত

সুতরাং ভগবদ্‌ভক্তি যতই প্রগাঢ় হইবে—ততই কর্ত্তৃত্বের মিথ্যাভিমান-শূন্যতারূপ জীবন্মুক্ত অবস্থার দিকে সাধক অগ্রসর হইবেন। মুক্তি দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হয়। ভক্তির চরম ফল পাইবার পূর্ব্বে ইহা সাধকের কাম্য হইতে পারে। কিন্তু ইহা ভক্তির একটি অবান্তর ফল। মনে রাখিতে হইবে, ভক্তের পক্ষে এই আত্মারামত্ব অর্থাৎ জীবন্মুক্ত অবস্থাও গ্রাহ্য নহে, কেন না ইহা প্রেমবিরোধী—"তথাপি নাত্মারামত্বং গ্রাহ্যং প্রেমবিরোধিত্বাৎ" (—বৃহদ্‌ভাগবতামৃত)। শ্রীভগবানের প্রতি নিরবধি প্রীতিই হইল প্রেম। তজ্জন্য প্রেমে অনন্ত অতৃপ্তি। স্বভাবতই উহা তৃপ্তির অভাব "তৃপ্ত্যভাব স্বভাবতঃ।" আত্মারাম কৃতকৃত্যতা আনে, এই অবস্থায় সাধক নিষ্ক্রিয় হন। তাঁহার নিকট প্রাপঞ্চিক ব্যাপার স্বপ্নবৎ ঐন্দ্রজালিক মনে হয়। জীবের সাক্ষাৎস্বরূপ চৈতন্যের উপলব্ধি করিয়া তিনি আত্মরতি আত্মক্রীড়, সুতরাং পরিতৃপ্ত থাকেন। "আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে"—এই হইল তাঁহার অবস্থা। নিবিড় জ্ঞানের চর্চ্চা দ্বারা দেহাত্মবাদ দূর করিয়া তিনি কৃতকৃত্যতা বোধ করেন মাত্র। "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে" প্রভৃতি গীতোক্তি জীবন্মুক্তের চরিতার্থতা প্রচার করিতেছে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলিয়াছেন—যে হৃদয়ে চরিতার্থতা আসিয়াছে তাহাতে ভক্তি প্রবেশ করে না। সর্ব্বপ্রকার যুক্তির অনুশীলন দ্বারা তাঁহারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—প্রেমে কৃতকৃত্যতা নাই। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে এই প্রকার সিদ্ধান্ত রহিয়াছে।

ভক্তি মুক্তির সাধন নহে

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রামানুজাচার্য্য হইতে বল্লভাচার্য্য পর্য্যন্ত সকল বৈষ্ণবাচার্য্যগণ মুক্তিকেই সাধ্য বলিয়াছেন, ভক্তি মুক্তির সাধন। ভক্তি উপায়, মুক্তি উপেয়। কিন্তু বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত হইল ভক্তি সাধ্য, সাধন নহে। ইহা পঞ্চম পুরুষার্থ, ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ ব্যতিরিক্ত—ইহাদের অতীত অবস্থা। নামকীর্ত্তন, আত্মসমর্পণাদি দ্বারা এই প্রেম ভক্ত হৃদয়ে অনুভূত হয় এবং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল। লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়ে পরশ না গেল॥" ইহাই হইল ভক্তের অনন্ত অপরিসীম অতৃপ্তি বা সর্ব্বাত্মভূত সচ্চিদানন্দরসঘন মূর্ত্তি। শ্রীভগবানের প্রতি প্রেমলক্ষণাভক্তি, ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অনর্পিতচরী ভক্তির অসাধারণ সিদ্ধান্ত।

হ্লাদিনী চির সক্রিয়

ভক্তি হ্লাদিনী শক্তির পরিণামবিশেষ। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ভগবানের বহিরঙ্গ শক্তি, আর হ্লাদিনী তাঁহার অন্তরঙ্গ শক্তি। ভগবান্ তাঁহার বহিরঙ্গ শক্তি দ্বারা এই বিপুল বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রপঞ্চের উৎপত্তি-বিলয় প্রসঙ্গে শ্রুতিও বলিয়াছেন—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।" শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ শক্তি কিন্তু তাঁহার স্বরূপভূতা। ভগবান্ আনন্দস্বরূপ হইলেও আনন্দের অনুভবিতা নন। হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা তিনি স্ব-স্বরূপ আনন্দের অনুভবিতা হন। বিষ্ণুপুরাণে হ্লাদিনী শক্তির পরিচয় আছে। মানুষের জীবনের উপর হ্লাদিনী শক্তি সক্রিয় আছেন। প্রত্যেক মানুষ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই হ্লাদিনী শক্তির প্রভাবে আপনাকে বিমল আনন্দরসের অধিকারী করিয়া তুলে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।" আনন্দ যেমন রহিয়াছে তাহার অনুভবেরও প্রয়োজন। আনন্দের সাক্ষাৎক্রিয়মানত্ব না থাকিলে চরিতার্থতা কোথায়? চরিতার্থতার অভাব অতৃপ্তি আনয়ন করে। হ্লাদিনী আনন্দকে অনুভবের বিষয়ীভূত করিয়া অতৃপ্তির পর্য্যবসান করে।

জ্ঞানের ফল ভাব

ভক্ত চান জ্ঞানও থাকুক, ভাবও থাকুক। জ্ঞান হইল প্রমাণজন্য বৃত্তি।

ভাব আসে জ্ঞানের পর। বিষয়ের অনুভূতি প্রমাণের ফল। অনুভূতির পর বিষয়ের প্রতি আনুকূল্য জন্মে। বিষয় অধিগত না হইলে বিষাদ, ব্যাকুলতা ও অতৃপ্তিতে চিত্ত ভরিয়া উঠে। অদ্বৈতবাদী জ্ঞানকে পাইয়া সন্তুষ্ট কিন্তু প্রেমমার্গী বৈষ্ণব জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী ফল না পাইলে অতৃপ্ত। বিধাতা মস্তিষ্কও সৃষ্টি করিয়াছেন, হৃদয়ও সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং হৃদয়রাজ্যের ব্যাপার মোটেই উপেক্ষণীয় নহে। জ্ঞানের জন্য তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে জ্ঞানমার্গী সংসার পরিত্যাগ করেন—"যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।" ভক্ত কিন্তু আভিমানিক কর্তৃত্ববোধ দূর করিয়া নিত্য কৃষ্ণ-কৈঙ্কর্য্যে তন্ময় হইয়া থাকেন। তাঁহার নিকট ভগবানই সব; তিনি অকর্তা, ভগবানই একমাত্র কর্তা—নিয়ন্তা। ভক্ত হ্লাদিনীর প্রভাবে প্রপঞ্চের মধ্যে থাকিয়াও শ্রীভগবানের সেবা করেন।

বৌদ্ধ ভক্তিবাদ

জ্ঞান সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিলে মানুষের পরিণতি হয় উন্মত্ততা। দুই পথ রাখিয়া চলিবার যে পথ সেইটিই হইল ভক্তিমার্গ। নির্ব্বাণবাদী বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ অবস্থা আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ভক্তিবাদ তখন তাহাতে আসিয়াছিল। তখন বোধিসত্ত্ব, অমিতাভ প্রভৃতি বৌদ্ধগণের উপাস্য হন। বোধিসত্ত্ব বা অমিতাভের কল্পনা (conception) বৌদ্ধসংস্কৃতির পরিণতি নহে, উহা হিন্দু ভক্তিশাস্ত্রের অবদান।

ভক্তির অশেষ বৈচিত্র্য

শ্রীভগবানের নিকট ভক্তের নিরন্তর এই প্রার্থনা, "হে ভগবন্, আমি সুখৈশ্বর্য্য চাই না, অপুনর্ভব চাই না। আমি সকলের আর্ত্তি—নিজের করিয়া নিতে চাই। যেখানে দুঃখের অনুভূতি, তুমি শক্তি দাও আমি যেন সেখানে প্রবিষ্ট হইতে পারি।" কেবলমাত্র ভোগরাগের আড়ম্বরেই শ্রীহরির সেবা হয় না। সকল প্রাণীর যিনি সেবা করিতে পারেন তিনিই যথার্থ শ্রীহরিভক্ত। ভগবান্ যে বিরাট বিশ্ব সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহার সেবার ভার ভক্তের উপর। ভক্ত সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, সকল লাবণ্যের আশ্রয়, মাধুর্য্যময় ভগবৎস্বরূপের অনুভূতি করিয়া তাঁহার সেবার জন্য নিত্য উন্মুখ থাকিবেন। ভক্তের অনুভূতি আকাঙ্ক্ষাবিমিশ্র—'যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি

কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥'—এই বুদ্ধি লইয়া ভক্ত কর্ম্মে নিরত থাকিবেন। শ্রীরূপ গোস্বামী তাই এই প্রেমভক্তির পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"স্তোত্রং যত্র তটস্থতামুপনয়ৎ চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাম্
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরীহাসশ্রিয়ং বিভ্রতী।
দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন পৃথুতাং কেনাপ্যনাতন্বতী
প্রেম্নঃ স্বারসিকস্য কস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া ॥"

—বিদগ্ধমাধব

যাঁহার প্রেম স্বারসিক হইয়াছে তিনি ভাবিবেন, যে ব্যক্তি তাঁহার স্তুতি করেন তিনি নিশ্চয়ই তাঁহাকে আপনার বলিয়া ভাবেন না। যিনি তাঁহার নিন্দা করেন তিনি যেন তাঁহার স্বজন বন্ধু। বন্ধুর মত তাই পরিহাস করিতেছেন। দোষ দর্শনে প্রেমিকের প্রেম ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। গুণবর্ণনে প্রেমিকের প্রেম বৃদ্ধিও লাভ করে না। এই অহেতুকী প্রীতির বিবর্তই হইল বাঙ্গালীর প্রেমধর্ম্ম। ইহাই হইল বাঙ্গালার প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কলিহত জীবের উদ্ধারের জন্য অসাধারণ দান বা অনর্পিতচরী ভক্তি।

জাতীয় কল্যাণের উৎস

আজ বাঙ্গালীর চতুর্দ্দিকে দুরবস্থা। আমাদের জীবন প্রেমহীন কলহমুখর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালী আপনার নিজস্ব প্রেমধর্ম্ম ভুলিয়াছে বলিয়া আজ তাহার সর্ব্বত্র বিড়ম্বনা! পুনর্ব্বার প্রেম মহাবৃক্ষের শীতল ছায়ায় না আসিলে কি আমাদের অশান্তি দূরীভূত হইবে? বর্ত্তমানে প্রেম কামে পরিণত হইয়াছে, ভোগবাসনাকেই আমরা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম মনে করি। আমাদের এই জাতীয় দুর্দ্দিনে প্রেমধর্ম্মের অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। প্রেমধর্ম্মের রাধাভাবদ্যুতির শ্রেষ্ঠতম ব্যাখ্যাতা শ্রীচৈতন্যদেবের শরণাপন্ন হইলে আমরা এই প্রেমের অপ্রাকৃত বিমল আনন্দ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব, অন্যথা নহে। এই মহান্ সত্যের প্রতি অনাদর বা উপেক্ষা যেন আমাদের দুর্গতির পথকে আরও প্রশস্ত, আরও সুগম করিয়া না তুলে।

পারমার্থিক রস

(১)

ভরত নাট্যসূত্র

রস কি, তাহা বুঝাইবার জন্য অলঙ্কার-শাস্ত্র রচিত হইয়াছে, ইহা সংস্কৃত-সাহিত্যবিদ্ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, সুতরাং রসতত্ত্ব বুঝিতে হইলে অগ্রে অলঙ্কার-শাস্ত্রের অনুশীলন যে একান্ত আবশ্যক, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এই সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র কত কালের, তাহা ঠিক করিয়া বলা বড়ই কঠিন। প্রতীচ্য প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মতে ভারতের আদি নাট্যাচার্য্য ভরত-মুনির নাট্যসূত্রই অলঙ্কার-শাস্ত্রের মূলগ্রন্থ। কারণ, নাট্যশাস্ত্র অপেক্ষা কোন প্রাচীনতর সংস্কৃত গ্রন্থে আমরা এই রসতত্ত্ব-বিশ্লেষণের কোন চিহ্ন দেখিতে পাই না; প্রতীচ্যদেশীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মতে কিন্তু এই ভরত-মুনি খৃষ্টজন্মের পরবর্ত্তী প্রথম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে ছিলেন; কিন্তু আমাদের প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতগণের মতে ভরত-মুনি খৃষ্টজন্মের বহু শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী। যাহাই হউক, রসশাস্ত্রের প্রচলিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ভরত-মুনি-প্রণীত নাট্যশাস্ত্র যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। এই নাট্যশাস্ত্রে রসলক্ষণ যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, পরবর্ত্তী রসশাস্ত্রের আচার্য্যগণ তাহাই মানিয়া লইয়াছেন, কেহই তাহার বিরুদ্ধবাদী হয়েন নাই। তবে ভরত-মুনি-কৃত রসলক্ষণের ব্যাখ্যা সকলের একরূপ নহে, তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদও ঘটিয়াছে; তাহার আলোচনা প্রকৃত স্থানে করা যাইবে।

রস-লক্ষণ

প্রথমে ভরত-মুনির রসলক্ষণ কিরূপ, তাহারই কিঞ্চিৎ অনুশীলন করা যাইতেছে। সে লক্ষণটি এই—

"বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাৎ রসনিষ্পত্তিঃ।" ইহার মোটামুটি তাৎপর্য্য এই—

বিভাব (কারণ), অনুভাব (কার্য্য) ও ব্যভিচারী (সহকারী) ভাবসমূহের সংযোগে রসনিষ্পত্তি হয়। মোট কথা এই দাঁড়াইল যে, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী পরস্পর সংযোগে যাহার নিষ্পত্তি হয়, তাহাই রস।

ইহা কিন্তু বড়ই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। ইহাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইলে, বিশেষ বিস্তারের আবশ্যকতা আছে। অনুকূল উদাহরণের সাহায্য না লইলে এই ভরত-মুনি-কৃত রসলক্ষণের গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে না। সেই জন্য এক্ষণে তাহার অনুসরণ করা যাইতেছে।

মনে কর, আমরা কোন নাট্যমন্দিরে রাম-সীতা-চরিত্রের অভিনয় দেখিবার জন্য কয়েক জন সমভাবাপন্ন বন্ধুর সহিত গমন করিয়াছি। আমাদের সম্মুখে দীপালোক-সমুদ্ভাসিত রঙ্গমঞ্চ—তখনও যবনিকা উত্তোলিত হয় নাই, একতানবাদ্য চলিতেছে। কিয়ৎকাল পরে বাদ্য বন্ধ হইল এবং যবনিকা উত্তোলিত হইল, এখন সকলের সমুৎসুক দৃষ্টি রঙ্গমঞ্চের মধ্যভাগে যুগপৎ আকৃষ্ট হইল।

অভিনয়ের অঙ্গসমূহ

কি দেখিলাম? দেখিলাম, পঞ্চবটী—সম্মুখে প্রস্রবণগিরির পাদদেশে, বেতসলতা-কুঞ্জ শোভিত। উভয় তীর প্লাবিত করিয়া প্রখর-বেগশালিনী গোদাবরী কলকলনাদে দিগন্ত মুখরিত করিতে করিতে সমুদ্রের দিকে ছুটিয়াছে। জলপ্রবাহের ও পুলিনের সন্ধিক্ষেত্রে ঈষদুন্নত সমতল নীল-শিলাফলকের উপর শ্রীরামচন্দ্রের বেশে জটাবল্কলধারী কোপীনবসন এক যুবা বসিয়া আছেন। শিলাফলকের এক কোণে সৌমিত্রি বিষণ্ণবদনে রামচন্দ্রের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। লক্ষ্মণ যে নিকটে আছেন, শ্রীরামচন্দ্রের সে জ্ঞান নাই, উদাস লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে মৃদু পবনান্দোলিত গোদাবরীর লহরীমালার দিকে তিনি চাহিয়া আছেন। কিছু কাল এই ভাবে কাটিয়া গেল, হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস যেন তাঁহার হৃদয়পঞ্জরসমূহ বিদলিত করিয়া বাহির হইল, সঙ্গে সঙ্গে দুর্নিবার অশ্রুপ্রবাহ নয়নদ্বয় হইতে প্রবল বেগে দরদরিতভাবে বহিতে লাগিল। শ্রীরামচন্দ্র বিরহদিগ্ধ গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন—

"কষ্টং কষ্টম্! দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগং দ্বিধা ন তু ভিদ্যতে
বহতি বিকলঃ কায়ো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্।
জ্বলয়তি তনূমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ
প্রহরতি বিধির্মর্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্॥"

হায়, কি ভীষণ কষ্ট! দুর্ব্বিষহ উদ্বেগে হৃদয় যে দলিত হইতেছে, কিন্তু কৈ, একবারে ত বিদীর্ণ হয় না? অবসাদ-বিবশ দেহকে মোহ যেন জড়াইয়া

ধরিতেছে, কিন্তু চৈতন্য ত বিলুপ্ত হইতেছে না! অন্তরের নিদারুণ দাহে সর্ব্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হইতেছে, কিন্তু, তবু ত তাহা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে না! সকল মর্ম্মস্থানই যেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া বিধি কঠোর প্রহার করিতেছেন, কিন্তু, হায়, পোড়া জীবন ত এখনও যাইতেছে না!

এই দৃশ্য দেখিয়া, শ্রীরামচন্দ্রের এই মর্ম্মস্পর্শী বাক্য শুনিয়া, সহৃদয় দর্শকগণের মানসিক অবস্থা তৎকালে কিরূপ হইয়া থাকে, এক্ষণে তাহাই দেখা যাক্।

দর্শকের বাসনা

রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অভীপ্সিত অভিনয় দেখিয়া এক প্রকার অনির্ব্বাচ্য সুখ-বিশেষের অনুভব করিবার আকাঙ্ক্ষা সহৃদয় দর্শকমাত্রেরই হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে, ইহা আমরা সকলেই জানি। এই আকাঙ্ক্ষা যাহার হৃদয়ে জাগে না, সে থিয়েটারে যায় তামাসা দেখিবার জন্য, রসাস্বাদনের জন্য নহে। এই আকাঙ্ক্ষা আমাদের যে সংস্কারবিশেষ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, আলঙ্কারিক আচার্য্যগণ তাহাকেই বাসনা বা রতি প্রভৃতি ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহারই স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাইয়া সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—

"ন জায়তে তদাস্বাদো বিনা রত্যাদিবাসনাম্।
নির্বাসনাস্তু রঙ্গান্তঃকাষ্ঠকুড্যাশ্মসন্নিভাঃ॥"

রত্যাদিবাসনা না থাকিলে রসাস্বাদ হইতে পারে না, যে দর্শকগণ এই প্রকার বাসনারহিত, তাহারা রসাস্বাদ-বিষয়ে রঙ্গশালাস্থিত কাষ্ঠ, দেওয়াল বা প্রস্তরসদৃশ।

অষ্ট ভাব

এই শ্লোকটিতে যে 'রত্যাদিবাসনা' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার তৎপর্য্যার্থ কি, তাহাই অগ্রে দেখান যাইতেছে। আদি শব্দের দ্বারা কোন্ কোন্ অর্থ গৃহীত হইয়াছে, তাহা পরে দেখাইব, এক্ষণে রতিশব্দের কিরূপ অর্থ অলঙ্কারশাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে, তাহাই দেখা যাক্।

সাহিত্য-দর্পণকার বলিতেছেন—

"রতির্মনোঽনুকূলার্থে মনসঃ প্রবণায়িতম্।"

যাহা চিত্তের অনুকূল অর্থাৎ যাহাকে পাইলে মানুষ আপনাকে সুখী বলিয়া বোধ করে, সেই বস্তুতে মনের যে তন্ময়ীভাব বা আসক্তি, তাহারই নাম হইতেছে রতি।

এই রতিকে আলঙ্কারিকগণ ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ভাব শব্দে যে কেবল রতিকে বুঝা যায়, তাহা নহে; হাস্য, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় ও শম, এই আটটি মনোবৃত্তিও অলঙ্কারশাস্ত্রে ভাব শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। হাস্য, শোক প্রভৃতি আটটি ভাবের কথা বিস্তৃতভাবে পরে বলা যাইবে। এখন রতি-ভাব সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যাইতেছে।

সুন্দরের আকাঙ্ক্ষা

যাহাকে দেখিলে, যাহার কথা শুনিলে, যাহাকে স্পর্শ করিলে, যাহার সৌরভ আঘ্রাণ করিলে বা যাহার আস্বাদন করিলে আমরা আপনাকে সুখী বলিয়া বোধ করিয়া থাকি, এ সংসারে তাহাকেই আমরা সুন্দর বলিয়া বিবেচনা করি। এ সংসারে একের নিকট যাহা সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়, অপরের নিকটও যে তাহাই সুন্দর বলিয়া প্রতীত হইবে, তাহা নহে। রুচিভেদে, সংস্কারভেদে, পারিপার্শ্বিক অবস্থানিচয়ের তারতম্যে, অভ্যাসের বৈচিত্র্যে প্রত্যেক নরনারীর নিকট সৌন্দর্য্য স্বানুভব-সম্বেদ্য, পৃথক্ ও অসাধারণ হইতে পারে এবং অধিকাংশ স্থলে হইয়াও থাকে; কিন্তু তাহা হইলেও উপরে যে সুন্দরের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আশা করি, কাহারও মতদ্বৈধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এক কথায় বলিতে গেলে হৃদয় অনুকূলভাবে যাহাকে চাহিয়া থাকে, তাহাই সুন্দর, ইহাই হইতেছে সর্ব্বসম্মত সুন্দরের লক্ষণ।

রতি ভাব

এই সুন্দরের প্রতি অন্তঃকরণের তন্ময়ীভাব বা অপরিবর্ত্তনশীল যে তীব্র আসক্তি, আলঙ্কারিকগণ তাহাকেই রতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সংসারী ব্যক্তিমাত্রেরই কোন না কোন প্রাপঞ্চিক বিষয়ে একরূপ রতি বা আসক্তি বিদ্যমান আছে। এই আসক্তি বা রতি সদ্যঃ প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় উল্লাসপ্রবণ—অচিরজাত শিশু হইতে মৃত্যুর দ্বারে উপনীত জরাজীর্ণ

আধিব্যাধিবিড়ম্বিত জীবন পর্য্যন্ত মানবমাত্রেরই স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক ধর্ম্ম,—মোহ, সুষুপ্তি, তীব্রতম দুঃখানুভূতি ও মৃত্যুদশায় ইহার প্রাকট্য অন্তর্হিত হয় মাত্র। কিন্তু ইহার আত্যন্তিক উচ্ছেদ কোন ব্যক্তির পক্ষে ইহজীবনে—কোন অবস্থাতেই সংসারী জীবের পক্ষে সম্ভবপর নহে, ইহাই হইল হিন্দু মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত। এই বিষয়-বিশেষে আসক্তি বা রতি কখনও প্রকট অবস্থায় থাকে, কখনও বা অপ্রকট অবস্থায় থাকে। প্রকট অবস্থায় যখন থাকে, তখনই ইহাকে মনোবৃত্তি বলা যায়, আর যখন অপ্রকট বা সূক্ষ্ম অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, তখনই ইহাকে রতিবাসনা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

বাসনা হইতে রসাস্বাদের অধিকার

নাট্যশালায় যে বিষয়টির অভিনয় হয়, তৎসংসৃষ্ট বস্তুনিবহের প্রতি যাহার হৃদয়ে এইরূপ রতিবাসনা বিদ্যমান থাকে এবং অল্পমাত্র উদ্দীপনের সাহায্যে সেই বাসনা প্রকটভাবে প্রাপ্ত হইয়া আস্বাদ্যবৃত্তি বা রতিরূপে পরিণত হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই নাট্যশালায় রসাস্বাদকারী সহৃদয় সভ্য হইবার অধিকারী হইয়া থাকে। যাহাদের এরূপ হয় না, তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া সাহিত্য-দর্পণকার বলিয়াছেন,—

"নির্ব্বাসনাস্তু রঙ্গান্তঃকাষ্ঠকুড্যাশ্মসন্নিভাঃ॥"

দ্বিবিধ বিভাব

এক্ষণে প্রকৃতের অনুসরণ করা যাক্। এই ভাবরূপা রতির যাহা বিষয়রূপ কারণ, তাহা অলঙ্কারশাস্ত্রে 'আলম্বনবিভাব' শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, আর সেই রতিকে যাহা ক্রমবিকাশশীল বা উদ্দীপ্ত করিয়া থাকে, তাহার নাম উদ্দীপন-বিভাব। বিভাব বলিলে এইরূপ রতির দ্বিবিধ কারণকেই বুঝা যায়, সুতরাং ভরতসূত্রে যে বিভাব শব্দটি আছে, তাহার অর্থ এইরূপ আলম্বন ও উদ্দীপনরূপ দ্বিবিধ বিভাব। সুতরাং ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, যাহাকে আলম্বন বা বিষয় করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে রতি আবির্ভূত হয়, সেই আমাদের রতির আলম্বন। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে, শ্রীরামচন্দ্রের রতির আলম্বন শ্রীজানকী। মলয়-মারুত, জ্যোৎস্না, কুসুম-কানন, কোকিলরুত প্রভৃতিই উদ্দীপন-বিভাব বলিয়া পরিগণিত। অন্তঃকরণে এই রতি আলম্বন ও উদ্দীপনের দ্বারা প্রকটভাব লাভ করিলে শরীরে আমাদের যে সকল কার্য্য

উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহারই নাম অনুভাব। এই অনুভাব দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম—সাত্ত্বিক বা স্বাভাবিক, দ্বিতীয়—ইচ্ছাকৃত বা প্রযত্ন-সম্পাদ্য।

সাত্ত্বিক অনুভাব

কাহাকেও ভালবাসিতে আরম্ভ করিলে সেই ভালবাসা বা রতি ক্রমে প্রগাঢ় ভাব প্রাপ্ত হইতে থাকে। সময়বিশেষে উদ্দীপনের সমাবেশবশতঃ সেই ভালবাসা যখন উদ্দীপ্ত হইয়া অত্যন্ত তীব্রতা বা প্রাবল্য লাভ করে, তখন সেই প্রেমিকের অন্তঃকরণ দ্রুতভাব বা তারল্য প্রাপ্ত হয়। এই চিত্তের দ্রবীভাব বা তারল্যকে আলঙ্কারিকগণ 'সত্ত্বোদ্রেক' বলিয়া থাকেন। হৃদয়ে এইরূপ সত্ত্বোদ্রেক বা দ্রবীভাব উৎপন্ন হইলে স্বভাববশতঃ আমাদের অনিচ্ছাকৃত যে সকল বিকার মানবদেহে উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম সাত্ত্বিক অনুভাব। এই সাত্ত্বিক অনুভাব অষ্টবিধ হইয়া থাকে। তাই সাহিত্য-দর্পণকার বলিয়াছেন,—

"স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥"

অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহের স্তব্ধীভাব বা স্ব স্ব ক্রিয়াকরণে অসামর্থ্য, স্বেদবারিবিনির্গম, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, গাত্রসমূহে বিষমকম্প, দেহের স্বাভাবিক বর্ণের বিপর্য্যয়, নয়ন হইতে অশ্রুধারাপাত এবং মোহ অর্থাৎ চৈতন্যবিলয়, সাত্ত্বিকভাব এই আট প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে।

প্রযত্ন সাধ্য অনুভাব

হৃদয়ে অনুরাগ উৎপন্ন হইলে যাহাতে অনুরাগ বা রতি হইয়াছে, তাহাকে তাহা জানাইবার জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অনুরক্ত ব্যক্তি যে সকল ব্যাপার যত্নের সহিত করিয়া থাকে, তাহাই অসাত্ত্বিক বা প্রযত্নসম্পাদ্য অনুভাব। দূতী-প্রেষণ, প্রেমপত্র-রচনা, কটাক্ষ, ভ্রূনিক্ষেপ, সঙ্গীত ও হস্তাদিচালন দ্বারা আহ্বানাদিই এই দ্বিতীয় প্রকারের অনুভাবমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

এখন ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব কাহাকে বলে, তাহাই দেখা যাক। পূর্ব্বে রতি প্রভৃতি যে নয়টি প্রধান ভাব বলা হইয়াছে, আলঙ্কারিকগণ সেই প্রধান ভাব বা মনোবৃত্তিকে স্থায়িভাব এই শব্দের দ্বারাও নির্দ্দেশ করিয়া

থাকেন। এই স্থায়িভাবের পরিপোষক অন্তরঙ্গ অথবা সহচর স্বরূপ মনোবৃত্তিনিচয়কেই আলঙ্কারিকগণ ব্যভিচারী ভাব বা সঞ্চারী ভাব এই দ্বিবিধ নামের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব

অন্তঃকরণে ভালবাসা বা রতি সমুদ্ভূত হইলে সেই রতির বিষয়ীভূত বস্তুকে পাইবার জন্য উৎকণ্ঠার উদয় হয়, কেমনে তাহার সহিত মিলিত হইব, তাহার জন্য নিরন্তর চিন্তা হইয়া থাকে, তাহাকে দেখিতে না পাইলে বিষাদ, দৈন্য, নৈরাশ্য প্রভৃতি বৃত্তিগুলি স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে। এই সকল স্থায়ী ভাবের সহচর বা পরিপোষক অস্থায়ী ভাব বা মনোবৃত্তিনিচয়কেই আলঙ্কারিকগণ ব্যভিচারী ভাব বা সঞ্চারী ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই ব্যভিচারী ভাব সর্ব্বসমেত তেত্রিশ প্রকার হইয়া থাকে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে সেই সকলের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া যাইবে। এই প্রকার বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের পরস্পর সংযোগে রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। ইহা নাট্যসূত্রকার ভরত-মুনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক্ষণে রস কাহাকে বলে এবং তাহার নিষ্পত্তিই বা কিরূপ, তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। ইহাই বুঝিবার জন্য পূর্ব্বে গোদাবরীতীরে পঞ্চবটীবনে শিলাফলকে সমুপবিষ্ট সৌমিত্রিসেবিত শ্রীরামচন্দ্রের চিত্র উদাহৃত হইয়াছে—নাট্যশালার এইরূপ দৃশ্যে সহৃদয় দর্শকগণের রসাস্বাদন কি ভাবে হইয়া থাকে বা হইতে পারে, তাহাই বুঝাইবার জন্য ঐ দৃশ্যটি উদাহৃত হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাক্, ঐ দৃশ্যের অন্তরে কোন্ অংশে কোন্ আলম্বন প্রভৃতি রসাস্বাদনের অনুকূল বস্তুনিচয় কি ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া পরে রস ও তাহার আস্বাদনের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা বুঝা যাইবে।

রস নিষ্পত্তি

উক্ত দৃশ্যে শ্রীরামচন্দ্রের সীতাদেবীর সহিত প্রথম বিরহের অবস্থা অভিনীত হইতেছে। এই অভিনয়দর্শনে সহৃদয় দর্শকগণ যে রসের আস্বাদন করিয়া থাকে, তাহার নাম বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার। সদ্যোজাত দুর্ব্বিষহ বিয়োগের বশে সংধুক্ষিত শ্রীরামচন্দ্রের জানকীবিষয়ক যে অনুরাগ বা রতি, তাহাই হইতেছে এ ক্ষেত্রে স্থায়ী ভাব—সেই স্থায়ী ভাবের আলম্বন-বিভাব হইতেছেন জানকী।

মৃদু মারুতান্দোলনে চঞ্চল লহরীমালাসঙ্কুল গোদাবরী ও তদীয় তীরস্থিত স্নিগ্ধ-শ্যামল কোমল লতারাজি-বিরাজিত প্রশান্ত গম্ভীর বনরাজি প্রভৃতি সেই রতির উদ্দীপন-বিভাব, শ্রীরামচন্দ্রের নীলোৎপলনিভ বিস্ফারিত নয়নদ্বয়ে মুহুর্মুহুঃ উপচীয়মান অনিবার্য অশ্রুধারা প্রভৃতি ইহার সাত্ত্বিক অনুভাব, আর "দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগং" এই প্রকার পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট কবিতাটিতে প্রকাশিত তৎকালে জানকী-বিরহে বিক্ষুব্ধ শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয়গত ভাব-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালাসদৃশ তীব্র উদ্বেগে মোহ মরণাভিলাষ প্রভৃতি ভাবনিচয়ই ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব। উক্ত স্থলে এই সকল আলম্বন-বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী পরস্পর সম্মিলিত হইয়া সহৃদয় দর্শকের মনোবৃত্তিতে আরূঢ় হইয়া কি ভাবে রস-নিষ্পত্তি করিয়া থাকে, তাহা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইবে।

(২)

স্বাদই রস

রসের আস্বাদনই হইল কাব্যসৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য। কিন্তু আলঙ্কারিকগণ রসের আস্বাদনকে রস হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ করেন না, তাঁহাদিগের মতে রসেরই স্বরূপ হইতেছে—আস্বাদ বা আস্বাদনা। আলঙ্কারিকদিগের এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য কি, তাহা বুঝিতে হইলে রসতত্ত্বের স্বরূপ বিষয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক হয়। একজন প্রাচীন আলঙ্কারিক বলিয়াছেন—

"স্বাদঃ কাব্যার্থসম্ভেদাদাত্মানন্দসমুদ্ভবঃ।"

অর্থাৎ কাব্যের যে অর্থসমূহ, তাহাদের পরস্পর মিলনে যে অনাবিল আনন্দের অনুভূতি হইয়া থাকে—তাহারই নাম—'স্বাদ'। এই স্বাদ ও রস বস্তুতঃ ভিন্ন নহে। রস ও স্বাদ একই বস্তু, যদিও আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি যে, রসের আস্বাদন হয়। বাস্তবিক কিন্তু 'রসের আস্বাদন' এইরূপ যে প্রয়োগ, তাহা মুখ্যার্থের প্রয়োগ নহে; কিন্তু ঔপচারিক প্রয়োগ। যেমন রাহুর মস্তক—এইরূপ প্রয়োগ ঔপচারিকই হয়; কারণ, রাহু মস্তক হইতে ভিন্ন নহে, মস্তকও যাহা—রাহুও তাহা, অথচ আমরা প্রয়োগ করিয়া থাকি যে 'রাহুর মস্তক'। অর্থাৎ অভিন্ন বস্তুতে ভেদের আরোপ করিয়া যে ব্যবহার

করা হয়, তাহাকেই ঔপচারিক প্রয়োগ বলা যায়। প্রকৃত স্থলেও তাহাই হইয়া থাকে। কিরূপ আস্বাদনকে রস বলা যায়, এখন তাহাই দেখা যাউক।

চারি প্রকার অভিনয়

মনে কর, আমরা এক সুন্দর রঙ্গশালায় অভিনয় দেখিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি,—যে সকল নট বা অভিনেতা অভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অভিনয়-ব্যাপারে সুদক্ষ। অভিনয় বলিলে চারিপ্রকার অভিনয় বুঝা যায়, কায়িক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক।

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ইচ্ছাকৃত সঞ্চালন করা—এই রূপ যে অভিনয় বা নাট্যোক্ত পাত্র ও পাত্রীর দৈহিক ক্রিয়ার অনুকরণ, তাহাকেই বলে—কায়িক অভিনয়। যেমন হস্তপদাদির সঞ্চালন, দৌড়িয়া যাওয়া, বসিয়া পড়া, অপরের স্কন্ধে ভর দিয়া দাঁড়ান প্রভৃতি, এই সকল ক্রিয়াকেই কায়িক অভিনয় বলিয়া আলঙ্কারিকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অনুকরণীয় পাত্র বা পাত্রীর—বক্তব্য বাক্যের—সদৃশ বাক্যের উচ্চারণকে বাচিক অভিনয় বলা যায়।

অনুকরণীয় শ্রীরাম জানকী প্রভৃতির তাৎকালিক বেশ ও পরিচ্ছদাদির যে ধারণ, তাহাকে আহার্য অভিনয় বলা যায়।

অনুকরণীয় পাত্র বা পাত্রীর যে সাত্ত্বিক অবস্থা অর্থাৎ স্তব্ধতা, রোমাঞ্চ, ঘর্ম্ম, স্বরভঙ্গ, গাত্রকম্পন, মুখাদির বিবর্ণতা, অশ্রুবর্ষণ ও মোহ—এই অবস্থা শিক্ষা-কৌশল দ্বারা যদি অভিনেতারও হয়—তাহা হইলে তাহাকে সাত্ত্বিক অভিনয় বলা যায়।

ভেদ জ্ঞানের লোপ

এই চারি প্রকার অভিনয় যদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তাহা হইলে সহৃদয় শ্রোতৃবর্গের অন্তঃকরণ সেই অভিনয় দেখিতে দেখিতে যে সাত্ত্বিক অবস্থাকে প্রাপ্ত হয়, তাহাই হইল রসাস্বাদের পূর্ব্ব অবস্থা। এই অবস্থার স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া আলঙ্কারিকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

> "পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ।
> তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে।"

অর্থাৎ মনোনিবেশ করিয়া অভিনয় দেখিতে আরম্ভ করিবার পরে দর্শকগণের—অনুকার্য অর্থাৎ রামাদির, অনুকারক অর্থাৎ নট নটী প্রভৃতির এবং অভিনয়-দর্শক সহৃদয়-গণের মধ্যে যে পরস্পর ভেদ আছে, সেই ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন যে অভিনয় করিতেছে, সে আমা হইতে ভিন্ন—এইরূপ বোধও লুপ্ত হইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, সে যে প্রকৃত রামচন্দ্রাদি হইতে ভিন্ন এবং সেই রামচন্দ্রাদিও যে তাহা হইতে ভিন্ন, এরূপ জ্ঞান সহৃদয় দর্শকগণের তৎকালে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

সাধারণীকরণ

রঙ্গমঞ্চের উপর যে সকল অভিনয়-ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, এরূপ জ্ঞানও থাকে না, এবং তাহা যে আমারই বা আমা হইতে ভিন্ন, রামচন্দ্র প্রভৃতিরই—এরূপ জ্ঞানও তখন উৎপন্ন হয় না। শুধু তাহাই নহে, সেই অভিনয়-ক্ষেত্রে দর্শকগণের মধ্যে যত নরনারী বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগেরও পরস্পরের মধ্যে যে কোন প্রকার ভেদ আছে, তাহারও জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়। তুমি, আমি, রাম, শ্যাম, গোপাল এ সকলেরই ব্যক্তিগত রামত্ব শ্যামত্ব তুমিত্ব আমিত্ব বা গোপালত্ব বুদ্ধিও সে সময় বিলোপ প্রাপ্ত হয়। সহৃদয়তা এবং রসাস্বাদনসামর্থ্য এবং অভিনেয় কাব্যের উৎকৃষ্টতা আর তার সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতৃ পুরুষ বা স্ত্রীর শিক্ষাভ্যাসজনিত অপূর্ব্ব অভিনয়-কৌশল যখন পরস্পরে মিলিত হইয়া এক অননুভূতপূর্ব্ব—বিচিত্র—বর্ণনাতীত—সর্ব্বসাধারণের মধ্যে একটা বিরাট্ অখণ্ড একীভাবকে সৃষ্টি করে, সেই একীভাবময় অবস্থার যে অনুভূতি এবং সেই অনুভূতিনিবন্ধন যে চিত্তের দ্রবীময় ভাব, ইহারই নাম সত্ত্বোদ্রেক বা 'সাধারণীকরণ'। এই 'সত্ত্বোদ্রেক' যখন উপস্থিত হয়—তখনই বুঝিতে হইবে যে, অভিনয় জমিয়া গিয়াছে—এইবার রসাস্বাদ হইবে।

একাত্মতা

রসের আস্বাদ বা রসরূপ আস্বাদ যাহার হয়, তাহার পক্ষে সে সময় রসাস্বাদের অনুকূল বস্তু ব্যতিরিক্ত অন্য কোন বস্তুর জ্ঞান থাকে না। সে আপনার ব্যক্তিত্বকে ভুলিয়া যায়, 'আমি অমুকের পুত্র' বা 'অমুক আমার পুত্র,' 'আমি ব্রাহ্মণ' বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য অথবা শূদ্র—এ জ্ঞানও তাহার সে সময়

থাকে না, ঐশ্বর্যের—পাণ্ডিত্যের—অভিজাত্যের অভিমান তাহার হৃদয় হইতে সে সময়ে অন্তর্হিত হয়। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তাহার তাৎকালিক মনোবৃত্তির বিষয় হয় না। তাহার সকল ইন্দ্রিয় যেন একীভূত হইয়া সেই সত্ত্বোদ্রেকযুক্ত মনোমধ্যে মিশিয়া যায়, তাহার মনই দেখে, মনই শুনে, মনই আঘ্রাণ করে, মনই স্পর্শ করে। সে যাহা দেখে, সে যাহা শুনে, সে যাহা স্পর্শ করে, সে যাহা ঘ্রাণ করে ও সে যাহা আস্বাদন করে—তাহার কিছুই বর্ত্তমানের নহে, তাহার কোনটাই ভবিষ্যতের নহে, সে তখন সুদূর অতীতের স্বপ্নময় রাজ্যে প্রবেশ করে। রঙ্গমঞ্চ তাহার নিকটে অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। সে দেখে—সেই পঞ্চবটী—কানন, সেখানে গভীর কাননের নিভৃত বেতসকুঞ্জের ছায়া বক্ষে করিয়া কল-কলধ্বনিতে খরতর বেগে স্বচ্ছশীতসলিলা গোদাবরী অবিশ্রান্ত গতিতে লহরীমালা তুলিয়া সমুদ্রের দিকে ছুটিতেছে। সে দেখে—লতাকুঞ্জের উপরিভাগে ময়ূর-ময়ূরী বসিয়া আছে। তাহাদিগের মুখে কেকাধ্বনি নাই, সমুন্নত শালবৃক্ষের উপর কপোত-কপোতী স্থির হইয়া বসিয়া আছে; সেই গোদাবরীতীরে শিলাফলকে উপবিষ্ট নবজলধরশ্যামল কোমলাঙ্গ অশ্রুভারসিক্ত বিশাল-নয়ন শূন্যদৃষ্টি সেই রামচন্দ্রের দিকে তাহাদের নেত্র আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে, শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয়মধ্যে বিক্ষুব্ধ শোক-সমুদ্রের তরঙ্গাবলীর ন্যায় বিরহ-কাতর উক্তিনিচয় তাহার কর্ণে অথবা কর্ণভাবাবিষ্ট মানসে মধ্যে মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, পার্শ্বে অবনতবদনে দণ্ডায়মান সৌমিত্রির বিষণ্ণ উদার মুখ-মণ্ডলের চিত্র তাহার অন্তঃকরণে মুহুর্মুহুঃ প্রতিফলিত হইতেছে; তাহার হৃদয়ে যে সকল কোমল মনোবৃত্তি তৎকালে উৎপন্ন হইতেছে, তাহারই মালা গাঁথিয়া সে যেন তখন সেই কল্পনাময় রামচন্দ্রের গলায় পরাইয়া দিতেছে। তাহার অভিলাষ, তাহার আবেগ, তাহার উৎকণ্ঠা, তাহার দীনতা, তাহার উন্মাদনা—সকলই যেন তাহার মনঃকল্পিত রামহৃদয়ে তৎকালে সমুৎপন্ন সদৃশ বৃত্তিনিচয়ের প্রতিচ্ছবি হইয়া পড়িতেছে, রামের দেখা, রামের শোনা, রামের ভাবনা, রামের বাসনা, রামের আবেগ, রামের বিবেক তাহারই হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল বাহিরের বস্তু বা উদ্দীপন আর ভিতরের বস্তু যে সঞ্চারিভাব, সেগুলি যেন তখন সজীব হইয়া উঠিয়াছে। মৈথিলীর প্রতি—রামচন্দ্রের যে প্রগাঢ় প্রেম, তাহার সহিত মিলিয়া তাহার জন্ম-জন্মান্তরের প্রীতিময় বাসনা তখন এক হইয়া আনন্দময়, বিস্ময়ময় নবজীবন লাভ করিয়া যেন তাহার হৃদয়ের সকল অংশ অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

আনন্দময়ত্ব

এই ভাবে আলম্বন, উদ্দীপন, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারিভাব প্রভৃতি সব মিলিয়া যেন এক হইয়া এক অখণ্ড আনন্দময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার সম্মুখীন হইয়াছে। এই অপূর্ব্বভাব-নিচয়ের আনন্দময় আস্বাদনের প্রবলবন্যায় তাহার পরিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব ভাসিয়া গিয়াছে, এই আস্বাদন বা এই চমৎকারময়—প্রসাদময়—আনন্দময়—অলৌকিক অনুভূতি হইল রসাস্বাদ বা রস। এই রসানুভূতির সৌভাগ্য যাহার ভাগ্যে ঘটে—তাহাকেই আলঙ্কারিকগণ সহৃদয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, সহৃদয়গণের এই অলৌকিক আনন্দময় রসাস্বাদের পরিচয়প্রসঙ্গে 'সাহিত্য-দর্পণ'কার লিখিয়াছেন—

"সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডশ্চ প্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ।
লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ।
স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ॥"

অখণ্ডানুভূতি

সহৃদয়গণের (পূর্ব্ববর্ণিত) সত্ত্বোদ্রেক হইবার পর রসাস্বাদ হয়, এ আস্বাদের বিষয় অনেক হইলেও ইহা অখণ্ড বা ভাগহীন, রসের অনুকূল সব বিষয়গুলি একই সময়ে একই জ্ঞানের বিষয় হয় বলিয়া, ঐ সকল বিষয়ের এক অখণ্ড জ্ঞানময়তা হইয়া যায়, সুতরাং সে আস্বাদনকে অখণ্ড বলা যায়। শুধু তাহাই নহে—সে আস্বাদ দুঃখের আস্বাদ নহে, শোকের বা বিষাদের আস্বাদ নহে, এ আস্বাদ এক কথায় বলিতে গেলে চিদানন্দস্বরূপই হইয়া থাকে; এ আস্বাদনে বেদ্য হইতে বেদনের অর্থাৎ জ্ঞেয় হইতে জ্ঞানের কোন পার্থক্য থাকে না, ইহা সবই যেন চৈতন্যময়।

ব্রহ্মাস্বাদ সদৃশ

রসের অনুকূল বস্তু ছাড়া অন্য কোন বস্তুই এ আস্বাদের বিষয় হয় না, এক কথায় বলিতে গেলে যোগিগণের নির্ব্বিকল্প সমাধিতে প্রকাশমান সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অনুভূতির সহিত ইহা সম্পূর্ণরূপে সদৃশ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, ইহার অন্য দৃষ্টান্ত বা উপমা সম্ভবপর নহে। বাহ্য বস্তুনিচয়ের সর্ব্বথা অপলাপকারী ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মতে যেমন 'নীল'-

জ্ঞানের 'নীল' হইতে কোন পার্থক্য নাই, 'নীল' জ্ঞানেরই আকার—বাহ্যবস্তুর আকার নহে, কিন্তু তাহা জ্ঞানেরই আকার, জ্ঞান হইতে অভিন্ন, সেইরূপ এ রসাস্বাদের বিষয়নিবহ হইতে ইহার কোন পার্থক্যই অনুভূত হয় না; বিষয় ও বিষয়ী, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, মাতা ও মেয়, সব যেন এক হইয়া এই অখণ্ড সচ্চিদানন্দঘন রসাস্বাদে পরিণত হয়। এই রসাস্বাদকে লক্ষ্য করিয়া প্রাচীন এক জন আলঙ্কারিক যথার্থ ই বলিয়াছেন—

"পুণ্যবন্তঃ প্রমিণ্বন্তি যোগিবদ্ রসসন্ততিম্।"

সহৃদয়গণের হৃদয়ে এইরূপ রসাস্বাদ যাঁহার কাব্য হইতে হয়, তিনিই হইলেন যথার্থ কবি; তাঁহারই লেখনীধারণ সার্থক, তিনিই অমর, তাই আগ্নেয়পুরাণেও কথিত হইয়াছে—

"নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।
কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা ॥"

এ সংসারে মানবজন্ম বড়ই দুর্লভ, আবার সেই মানুষের মধ্যে বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানলাভও একান্ত দুর্লভ, আবার সেই সকল বিদ্বান্‌গণের মধ্যে কবি হওয়াও একান্ত দুর্লভ, শুধু কবিতা লিখিয়াই কবি হওয়া যায় না, এইরূপ রসবিতরণ করিবার শক্তিশালী কবি হওয়াই এ সংসারে একান্ত দুর্লভ।

(৩)

কাব্য-রসাস্বাদ সাময়িক

সংস্কৃত-সাহিত্যের রসনিরূপণ করিতে যাইয়া মহামুনি ভরত হইতে আরম্ভ করিয়া সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ পর্যন্ত আলঙ্কারিকগণ যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সার সংগ্রহপূর্ব্বক রস-তত্ত্বের বিশ্লেষণ যতদূর সংক্ষেপে সম্ভবপর, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধ কয়টিতে দেখান হইয়াছে। কিন্তু এই আলঙ্কারিকগণ-সম্মত রস মনুষ্যের আধ্যাত্মিক জীবনে কতদূর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তদ্বিষয়ে ঐ সকল আলঙ্কারিকগণ বিশেষ করিয়া কিছুই বলেন না। তাঁহাদের বর্ণিত রস সহৃদয়গণের হৃদয়-রাজ্যে অভিনয়-দর্শনকালে বা শ্রব্যকাব্যের অনুশীলনকালে ক্ষণিক আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়, তাহা কিয়ৎকালের জন্য রসাস্বাদনকারী সহৃদয়গণকে প্রাকৃত বাস্তব জগৎ

হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এক কল্পনাময় স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়, সে রাজ্যে সাংসারিক মানব কিছুকালের জন্য লৌকিক ব্যবহারের সীমা অতিক্রম করিয়া এক নবীন প্রাতিভাসিক সৃষ্টির আনন্দময় সত্তা অনুভব করিতে সমর্থ হয়। সেই আনন্দানুভূতির প্রবাহে লৌকিক অহমিকার আবর্জ্জনা কোথায় বহিয়া যায়; দ্বেষ, হিংসা ও কলহের অন্তর্দাহকর সন্তাপ অকস্মাৎ নিবিয়া যায়, রক্ত-মাংসের গড়া মানুষ কিয়ৎকালের জন্য চিন্ময় ও আনন্দময় মানুষ হইয়া উঠে—ইহা সত্য এবং সকল হৃদয়েরই স্বানুভব-সম্বেদ্য; কিন্তু এই প্রাকৃত রসের আস্বাদনে মানুষ একবারে চিরদিনের জন্য অপ্রাকৃত মানুষ হইতে পারে না—আবার তাহাকে পার্থিব ব্যবহার-রাজ্যে নামিয়া আসিতে হয়, রসাস্বাদসম্বলিত অপ্রাকৃত স্বপ্নরাজ্য তাহার ভাঙ্গিয়া যায়, থাকে কেবল তাহার উদ্দীপনা-মাখা স্মৃতিমাত্র। সেই স্মৃতিই তাহাকে আবার রঙ্গশালায় দর্শকরূপে লইয়া যায় বা মধুর কাব্যের অনুশীলনে কদাচিৎ প্রবৃত্ত করে; কিন্তু তাহাতে তাহার আশা পূর্ণ হয় না—প্রকৃতির পরিবর্তন হয় না, সে সত্য সত্যই প্রাকৃত মানুষভাব পরিহারপূর্ব্বক জীবনের শেষ শ্বাস পর্যন্ত অপ্রাকৃত বা দিব্য মানুষ হইয়া থাকিতে পারে না।

অপ্রাকৃত রস

লৌকিক বা প্রাকৃত রসের এই অসম্পূর্ণতা পরিহার করিয়া—ইহাকে আধ্যাত্মিক শান্তিপূর্ণ জীবনের প্রধান উপকরণরূপে পরিণত করিবার জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—তাহার ফলে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র নবজীবন লাভ করিয়াছে, ক্ষণিক চিত্তবিনোদনের জন্য সহস্রাধিক বৎসর হইতে প্রবর্ত্তিত রসশাস্ত্র হিন্দু সভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ আধ্যাত্মিক জীবন-সৃষ্টির সর্ব্বপ্রধান উপায়রূপে পরিণত হইয়াছে। এই বিষয়ের অনুসন্ধান ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আজ বাঙ্গালী করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গালার অনেক চিন্তাশীল লেখক এখন এই বিষয়ে ভাল ভাল প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন; ইহা যে বাঙ্গালা সাহিত্যসমুন্নতির একটা বিশেষ সুলক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রূপ গোস্বামীর অবদান

কিন্তু এই কবি-কল্পনা-প্রসূত প্রাকৃত রসকে অপ্রাকৃত রসরূপে পরিণত করিয়া জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়-সাধন দ্বারা বাঙ্গালীর জাতীয়

জীবনে ভাবমন্দাকিনীর প্রথমপ্রবাহ যিনি বহাইয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষ শ্রীরূপ গোস্বামীর অসাধারণ কল্পনা ও ধীশক্তির পরিণতিস্বরূপ গ্রন্থ-নিচয়ের সহিত এখনও আমাদের রসসাহিত্যের লেখকবৃন্দের পরিচয় নিতান্ত অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। এ দিকে আমাদিগের যে ভাবে দেখা উচিত, তাহা আমরা বড় কেহই দেখিতেছি না। সুতরাং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের প্রকৃত উপাদেয়তা কি, তাহা আমরা ভাল করিয়া পরিষ্কারভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না—তাই বাঙ্গালীর বর্ত্তমান কালোপযোগী আধ্যাত্মিক ভাবরাজ্যের বিকাশ সুশৃঙ্খলার সহিত হইয়া উঠিতেছে না। বাঙ্গালী নিজের সমাজকে ভাঙ্গিতেছে, কিন্তু গড়িতে পারিতেছে না। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, তাহার একমাত্র হেতু এই যে, এখনও বাঙ্গালী বাহিরের রসতৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া সে তৃষ্ণা মিটাইবার আশায় পরের মুখের দিকেই চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার গৃহে যে রসামৃতসিন্ধু রহিয়াছে, তাহার খবর এখনও সে ভাল করিয়া পাইতেছে না।

রসাস্বাদ পরমার্থ

এ সংসারে রসের অনুভূতি বা আস্বাদনই হইতেছে মানবের পরম বা চরম পুরুষার্থ,—অনাদিকাল হইতেই প্রাকৃত কবিগণ কল্পিত বা ঐতিহাসিক স্ত্রী-পুরুষরূপ নায়িকা বা নায়ককে আলম্বনরূপে অবলম্বন করিয়া সামাজিক সহৃদয়গণের হৃদয়ে সেই রসানুভূতি করাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন এবং সময়বিশেষে এবং পাত্রবিশেষে তাদৃশ কবিজনেপ্সিত রসের আস্বাদন পূর্ব্বকালে হইয়াছে, এখনও হইতেছে এবং ভবিষ্যৎকালেও হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু এই প্রকার কবিকল্পনাপ্রসূত অনিত্য অথচ প্রাপঞ্চিক আলম্বনাদির ভাবনাময় আস্বাদন হইতে যে প্রাকৃত রস কিয়ৎকালের জন্য সহৃদয়হৃদয়ে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে, তাহা সুখস্বরূপ হইলেও বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজনিত বৈষয়িক সুখ হইতে বিভিন্ন নহে; কারণ, তাহা অচিরস্থায়ী এবং পরিণামে হিতকর নহে, অথচ উপনিষদ্ বলিতেছেন, "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দীভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"—সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই রস, সেই রসস্বরূপ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া এই সংসারী মানব আনন্দের সহিত নিত্যসম্বদ্ধ হইয়া থাকে, এই রসরূপ আনন্দ যদি না থাকিত, তাহা হইলে এ সংসারে কে স্পন্দিত হইত—

কেই বা জীবিত থাকিত? সেই আনন্দরূপ রসই আকাশ অর্থাৎ আকাশের ন্যায় অনাবৃত, অখণ্ড ও সর্ব্বব্যাপী।

প্রাকৃত রসাভাস

ইহাই যদি রসের স্বরূপ হয়, তাহা হইলে এই রস কবিবর্ণিত কাব্য বা নাটকে নাই—হইতেও পারে না, ইহা কে অস্বীকার করিবে? রসের জন্যই আবহমান কাল হইতে কাব্যসৃষ্টি হইয়া আসিতেছে, অথচ সেই সকল কাব্যের অনুশীলনে যাহার সৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে রস নাই—রসের গন্ধমাত্র আছে, রসের নামটি মাত্র আছে। ভক্তের অনুভূতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা পূর্ব্বক বলিতে গেলে বলিতে হয়, ঐ সকল প্রাকৃত কাব্যপ্রসূত উন্মাদনাময় চিত্তবিস্তার বা চিত্ত-বিক্ষোভ পারমার্থিক রসের তুলনায় রসাভাস-ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। কেন এমন হইল? রসসৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত যুগযুগান্তরের কবিবৃন্দ রসের খবর এ পর্য্যন্ত এ সংসারে দিতে পারিলেন না কেন? এই দুরূহ প্রশ্নের উত্তর প্রথমে সুস্পষ্টভাবে যিনি নিজ গ্রন্থে দিয়াছেন, তিনিই শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী। তাঁহার সিদ্ধান্ত কি, তাহারই আলোচনা দ্বারা পরমার্থ-রসের প্রকৃতস্বরূপ কি, তাহাই বুঝাইবার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে: সেই আলোচনা অল্প বিস্তৃত হইবে। বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া, আশা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ এই বিষয়ে অপেক্ষিত অবধান দিতে বিমুখ হইবেন না।

রস সাহিত্য ও অধ্যাত্ম সাহিত্য

মানুষকে প্রাকৃত সুখ-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতময় অবস্থা-বৈষম্যের পঙ্কিল আবর্ত্ত হইতে উদ্ধৃত করিয়া শান্তিময়—প্রসাদময়, অনাবিল সুখসাগরে ডুবাইয়া রাখিবার জন্য ধীশক্তিসম্পন্ন প্রতিভাশালী মানব যতপ্রকার বাঙ্‌ময় বিবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে দুই প্রকার সাহিত্যই সভ্য সমাজে প্রধান বলিয়া বহুদিন হইতে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। প্রথম রস-সাহিত্য, দ্বিতীয় অধ্যাত্ম-সাহিত্য। প্রথম জাতীয় সাহিত্যের প্রভাব মানব-হৃদয়ের ভাবময় রাজ্যের উপর বিস্তারলাভ করিয়াছে, আর দ্বিতীয় জাতীয় সাহিত্যের অর্থাৎ অধ্যাত্ম-সাহিত্যের প্রভাব মানবের প্রমাণজনিত মনোবৃত্তি বা বিবেক-বিজ্ঞানের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এই উভয় প্রকার সাহিত্যের একটি ধারার নাম সাহিত্যশাস্ত্র, অন্য ধারাটির নাম অধ্যাত্মশাস্ত্র। প্রথমের

অধিকার হইতেছে মানবের হৃদয়ে, দ্বিতীয়ের অধিকার হইতেছে মানবের মস্তিষ্কে। ভাবনিচয়ের বা feelingএর উৎকর্ষবিধান দ্বারা মানবকে আনন্দভোগ করানই সাহিত্যশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। অপর দিকে ভাব বা feelingকে উপেক্ষা করিয়া প্রমাণবৃত্তির বা intellectএর সম্যক্ সমুৎকর্ষসাধন দ্বারা মানবের ত্রিবিধ দুঃখ হইতে নিস্কৃতির বিধান ও সেই সঙ্গে পরমানন্দের সম্মুখীকরণ হইতেছে অধ্যাত্মশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। একের উদ্দেশ্য—প্রমাণ-বৃত্তির উপেক্ষা সহকারে ভাবসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয়ের উদ্দেশ্য—ভাবরাজ্যের বিধ্বংস-সাধনপূর্ব্বক প্রমাণ-বৃত্তির সাম্রাজ্যসংস্থাপন। এই উভয়বিধ সাহিত্যের অর্থাৎ রস-সাহিত্যের ও অধ্যাত্মসাহিত্যের উপাসকগণ অনাদিকাল হইতেই বিভিন্ন-পথাবলম্বী হইয়া পরস্পর পরস্পরকে উপেক্ষা করিয়া স্বীয় মতের প্রাধান্যরক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া আসিতেছেন। রস-সাহিত্যের উপাসকগণ আপনাদিগকে রসিক বলিয়া পরিচয় দিতে যেমন গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকেন, তেমনই অধ্যাত্মশাস্ত্রের ঐকান্তিকভাবে অনুশীলনকারিগণকে শুষ্ক দার্শনিক বলিয়া উপহাস করিয়া তৃপ্তির অনুভব করিয়া থাকেন। অপরদিকে অধ্যাত্ম-সাহিত্যের উপাসকগণ রস-সাহিত্যের ঐকান্তিকভাবে অনুশীলনকারিগণকে প্রাকৃত কামী পুরুষ বলিয়া নিন্দা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না এবং আপনাদিগকে জ্ঞানী পরমার্থদর্শী বলিয়া পরিচয় দিতে উল্লাস বোধ করিয়া থাকেন। এইরূপে এই বিভিন্ন পথাবলম্বী দ্বিবিধ সাহিত্যিকগণের মতবিরোধ অতি প্রাচীনকাল হইতেই শুধু ভারতে নহে, সকল সভ্য দেশেই বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, কোন কালে যে তাহা একেবারে বিরত হইবে, সে আশাও সুদূরপরাহত।

মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের বিরোধ

মস্তকের সহিত হৃদয়ের এই বিরোধ, জ্ঞানের সহিত ভাবের কলহ উভয় প্রকার সাহিত্যের অর্থাৎ রস-সাহিত্য ও অধ্যাত্মসাহিত্যের অসম্পূর্ণতার হেতু হইয়া দ্বিবিধ সাহিত্যের পরিপূর্ণ বিকাশে বাধা প্রদান করিয়া আসিতেছে। এই বাধার বিষময় পরিণাম পূর্ব্বকালবর্ত্তী আচার্য্যগণ যে দেখেন নাই তাহা নহে; কারণ, নব্য অলঙ্কারশাস্ত্রের উদ্ভাবয়িতা আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য—ভাবহীন জ্ঞান এবং জ্ঞানহীন ভাব এই উভয়ের কোনটিই মানুষের হৃদয়ে স্বতঃসিদ্ধ রসাস্বাদনাভিলাষকে চরিতার্থ করিতে পারে না, এই কথা তাঁহার 'ধ্বন্যালোক'

নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বড়ই সুন্দরভাবে একটি শ্লোকের দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন। সে শ্লোকটি এই—

"যা ব্যাপারবতী রসান্ রসয়িতুং কাচিৎ কবীনাং নবা
দৃষ্টির্যা পরিনিষ্ঠিতার্থবিষয়োন্মেষা চ বৈপশ্চিতী।
তে দ্বে অপ্যবলম্ব্য বিশ্বমখিলং নির্বর্ণয়ন্তো বয়ং
শ্রান্তা নৈব চ লব্ধমব্ধিশয়ন ! ত্বদ্‌ভক্তিতুল্যং সুখম্ ॥"

এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য এই যে,—নানাপ্রকার রসকে আস্বাদন করাইবার জন্য সর্ব্বদা সমুদ্যত যে কবিগণের নিত্য নবীন প্রতিভাময়ী দৃষ্টি এবং অব্যভিচারি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ পারমার্থিক বস্তুতত্ত্বের প্রকাশ করিতে সমর্থ যে প্রমাণপরতন্ত্র জ্ঞানী পুরুষগণের দৃষ্টি, আমরা এই উভয় প্রকার দৃষ্টির সাহায্যে এই অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্ব-রহস্যের উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইয়া আজীবন পরিশ্রম করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। হে ক্ষীরোদশায়িন্ রসঘন চিদানন্দময় পুরুষ! তোমাকে ভালবাসারূপ যে ভক্তিরস—সে রসাস্বাদনরূপ সুখ কিন্তু এই উভয় প্রকার দৃষ্টির সাহায্যে আমরা লাভ করিতে পারিলাম না।

কবি ও জ্ঞানীর দৃষ্টি অপর্য্যাপ্ত

রসাস্বাদই মানবজীবনের চরম পুরুষার্থ; কারণ, রসই জীবের সারাজীবনের আকাঙ্ক্ষিত, সেই চিরবাঞ্ছিত রস আস্বাদন করিবার জন্য কবিদৃষ্টির সাহায্য যেমন নিষ্ফল, সেইরূপ প্রমাণৈকশরণ শুষ্ক জ্ঞানীর দৃষ্টিসাহায্যও অকিঞ্চিৎকর; সুতরাং কেবল জ্ঞানমার্গের বা কেবল ভাবমার্গে রসকে পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য যে খেদ করিয়াছেন এবং সেই খেদকে মিটাইবার জন্য, ভক্তিরসাস্বাদরূপ নিত্য সুখের আশায় অব্ধিশয়ন শ্রীভগবানের চরণাম্বুজে নিজের যে ব্যাকুলতাময় প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছেন, সেই খেদ ও প্রার্থনা নিবৃত্ত ও পূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্যের যুগে নহে, তাহা পূর্ণ হইয়াছিল আমাদের জন্মভূমির প্রিয় সন্তান কৌপীনমাত্র সম্বল শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর অমরকৃতি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর আবির্ভাব হইবার পর, শ্রীগৌরাঙ্গচরণাশ্রিত শত শত ভক্তসাধকবৃন্দের। বাঙ্গালা গৌড়ীয় ভক্তিসম্প্রদায়ের ইতিহাস এ বিষয়ে জাজ্বল্যমান প্রমাণ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে তাই নিঃসঙ্কোচে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে ॥"

রসস্বরূপ ভগবান্

এই যে ভগবৎস্বরূপভূত রস, ভক্তিহীন মানবসমূহ কর্ত্তৃক দুরূহ, শ্রীভগবানের পাদপদ্মযুগলই যাহাদের সর্ব্বস্ব, সেই ভক্তগণই এই ভগবৎস্বরূপ রসের আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

এই শ্লোকটিতে শ্রীগোস্বামিপাদ সাক্ষাৎ ভগবান্‌কেই রস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ"—হৃদয়ে ভক্তি না থাকিলে, এই রসাত্মা ভগবানের আস্বাদন হইতে পারে না, ইহাও স্পষ্টভাবে এই শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—সেই ভক্তির অধিকারীকে তাহাই বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়া গোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেই বলিয়াছেন,—

"ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥"

ভোগলিপ্সা ও মুমুক্ষারূপ পিশাচী যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত সে হৃদয়ে ভক্তি-সুখের উদয় হইবার সম্ভাবনা কোথায় ?

এই শ্লোকটির ভিতর পারমার্থিক রসতত্ত্বের যে নিগূঢ় রহস্য রহিয়াছে, এইবার তাহারই আলোচনা করিব।

(৪)

আলঙ্কারিকের লক্ষ্য

নাট্যশাস্ত্রকার মহামুনি ভরতের সময় হইতে পণ্ডিতরাজ রসগঙ্গাধর-রচয়িতা জগন্নাথ কবির সময় পর্য্যন্ত অলঙ্কার-শাস্ত্রের সহিত দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় করিবার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা বিরাট সংস্কৃত-সাহিত্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। কল্পিত বা ঐতিহাসিক নায়ক-নায়িকার প্রাকৃত অনুরাগকে প্রধানভাবে অবলম্বনপূর্ব্বক বিরচিত রস-সাহিত্যের বিশ্লেষণ ও সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্য এই দীর্ঘকাল ধরিয়া সংস্কৃত ভাষার আলঙ্কারিক পণ্ডিতগণ প্রভূত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

দার্শনিকের প্রযত্ন

অপর দিকে ঔপনিষদ যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গদেশে ন্যায়শাস্ত্রের রচয়িতা রঘুনাথ শিরোমণির সময় পর্য্যন্ত বড় বড় দার্শনিক আচার্য্য ও প্রতিভাসম্পন্ন

পণ্ডিতকুল দার্শনিক চিন্তার সাহায্যে মানবের মানসিক বৃত্তিনিচয়ের বিশ্লেষণ-পূর্ব্বক মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য মুক্তি বা নির্ব্বাণের পথ কি, তাহাই দেখাইবার জন্য বিশ্ব-বিস্ময়াবহ প্রযত্ন করিয়া গিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে আলঙ্কারিকগণ মানব-হৃদয়ের সুকোমলবৃত্তিনিচয়কে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও পরিস্ফুট করিয়া রসসৃষ্টির অদ্ভুত কৌশল দেখাইয়া গিয়াছেন, আর ভারতের দার্শনিক পণ্ডিতগণ মানব-হৃদয়ের সকল প্রকার সুকোমল বৃত্তিনিচয়কে সংসারবন্ধনের হেতু বলিয়া উপেক্ষাপূর্ব্বক কেবল শুষ্ক জ্ঞানেরই উপর নির্ভর করত পরমপুরুষার্থ-লাভের প্রকৃষ্ট পন্থার অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। আলঙ্কারিকগণ মানবের হৃদয় লইয়াই লীলা-খেলা করিয়া গিয়াছেন, আর দার্শনিকগণ হৃদয়কে উপেক্ষা করিয়া কেবল মস্তিষ্কের উৎকর্ষসাধন করিবার চেষ্টায় জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু মনুষ্যত্বের পুর্ণ বিকাশ, মানব-জন্মলাভের চরিতার্থতা, দুঃখময় সংসারকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করা মস্তিষ্কহীন হৃদয়ের দ্বারা হয় না, অথবা হৃদয়হীন মস্তিষ্কের দ্বারাও হয় না, এই জাজ্বল্যমান অখণ্ডনীয় সত্যের উপর বিশ্বাস প্রাচীন আলঙ্কারিক ও প্রাচীন দার্শনিকের মধ্যে কাহারও ছিল না। এই কথা শুনিলে অনেকে হয় ত বিস্মিত হইবেন, কেহ বা রুষ্ট হইবেন, অন্যে হয় ত এই প্রকার উক্তিকারীর প্রতি অবজ্ঞার ভ্রূকুটিপাতও করিবেন, ইহা আমি অস্বীকার করি না; কিন্তু যুগযুগান্তব্যাপী সংস্কৃত দর্শন-সাহিত্যের ইতিহাস অনুশীলন করিলে এইরূপ উক্তির সার্থকতা বিস্পষ্টভাবে যে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, তাহা আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

সমন্বয়

বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা বড়ই শ্লাঘা ও গৌরবের বিষয় যে, ৪ শত বৎসরের পূর্ব্বে বাঙ্গালার এক জন কন্থা-কৌপীন-সম্বল বৈরাগী এই মহান্ সত্য জগতে প্রথম প্রচার করিয়া বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের ও বাঙ্গালীর হৃদয়ের কল্পনাকুশলতা ও ভাবপ্রবণতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বিভিন্ন পথে ধাবমান আলঙ্কারিকতা ও দার্শনিকতাকে একই উদ্দেশ্যের দিকে প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ শ্রীরূপ গোস্বামিপাদই সেই বাঙ্গালী জাতির

কন্থা-কৌপীনসম্বল বৈরাগী। তাই তিনি 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' নামক স্বরচিত গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

অর্থাৎ মানবের হৃদয়ে যত কাল পর্য্যন্ত ভোগের স্পৃহা ও নির্ব্বাণ-মুক্তির আকাঙ্ক্ষারূপ পিশাচী বিদ্যমান থাকে, সে পর্য্যন্ত সে হৃদয়ে ভক্তিরূপ যে অতুলনীয় সুখ, তাহার উদয় হইতে পারে না। শ্রীরূপ গোস্বামীর এইরূপ উক্তির মধ্যে যে কী গভীর তাৎপর্য্য নিহিত আছে, তাহার একটু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক মনে করি।

ভোগস্পৃহা

ভোগের স্পৃহা কাহাকে বলে? দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতে যাহার আত্মাভিমান আছে বা আত্মীয়ত্বের অধ্যাস হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তির যে পর্য্যন্ত প্রকৃত বিষয়নিবহের বিনশ্বরতা ও ঐকান্তিক দুঃখরূপতা অনুভূত না হয়, সেই পর্য্যন্ত প্রাকৃত বিষয়নিবহের সেবনে আমি সুখী হইব, সুখভোগই আমার জীবনের পরম উদ্দেশ্য, এইরূপ বুদ্ধিবশে বিষয়ভোগ করিবার জন্য যে ঐকান্তিক অভিলাষ, তাহারই নাম ভোগের স্পৃহা। অপর দিকে বিবেকের সাহায্যে যে ব্যক্তি প্রাপঞ্চিক বিষয়সমূহের বিনাশশীলতা ও দুঃখময়তা উপলব্ধি করিয়া এই সংসারের ভোগ্য বিষয়নিবহে বৈরাগ্যযুক্ত হয়, তাহার হৃদয়ে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির জন্য যে ইচ্ছা সমুদিত হয়, তাহারই নাম মুক্তির স্পৃহা।

মোক্ষস্পৃহা

ভুক্তির স্পৃহা অপরাবিদ্যার সাহায্য গ্রহণ করে, সেই অপরাবিদ্যার সাহায্যে নিজের সংস্কার ও অভিরুচির অনুকূল ভোগ্য বিষয়নিবহের সম্পাদনের জন্য সর্ব্বপ্রকারে প্রযত্নপরায়ণ হইয়া থাকে। এই সকল ভোগস্পৃহাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা সুকোমলমতি, তাহাদিগকে আনন্দ দিবার জন্য অভিলষিত ভোগনির্ব্বাহের জন্য অপরাবিদ্যার অন্যতম শাখাস্বরূপ লৌকিক রসশাস্ত্র বা অলঙ্কারশাস্ত্র রচিত হইয়াছে। সেই অলঙ্কারশাস্ত্রের রাজ্য ভোগপরায়ণ মানবসমূহের হৃদয়ের উপর আবহমানকাল হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। অপর দিকে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির স্পৃহা বা মুমুক্ষা যাহাদিগের

হৃদয়ে সত্য সত্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহারা ঐকান্তিকভাবে পরা বিদ্যা বা অধ্যাত্মশাস্ত্রের শরণাপন্ন হইয়া থাকে। এই অধ্যাত্মশাস্ত্রের অনুশীলনফলে প্রাপঞ্চিক বিষয়সমূহের অনিত্যতা, অসারতা ও দুঃখময়তার অনুভূতি যতই প্রবল হইতে থাকে, সেই পরিমাণে মানবহৃদয়ে মোক্ষের স্পৃহা প্রবল হইয়া থাকে, এ বিষয়ে বোধ হয় কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতবৈষম্য নাই।

পরমার্থ ভগবদ্ভক্তি

শ্রীরূপ গোস্বামী উক্ত শ্লোকে ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন যে, এই ভোগস্পৃহা বা মোক্ষের স্পৃহা কোনটিই পারমার্থিক রসাস্বাদনের অনুকূল নহে—প্রত্যুত প্রতিকূল। মনুষ্যত্বের পূর্ণতা যেমন ভোগস্পৃহা ও ভোগসাধনের সামগ্রী সম্পাদনের উপর নির্ভর করে না, সেইরূপই মোক্ষস্পৃহা ও মোক্ষের সাধনস্বরূপ অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান-সম্পাদনের উপরও মনুষ্যত্বের পূর্ণতা বা সফলতা নির্ভর করে না। পারমার্থিক রসের নিরন্তর আস্বাদনই মনুষ্যজীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া থাকে। কারণ, এই পারমার্থিক রসের আস্বাদনেই মানবের সকলপ্রকার বিশুদ্ধ মনোবৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের পরিপূর্ণতা লাভ হয়; এবং সেই পারমার্থিক রসই হইতেছে ভগবদ্ভক্তি। এই ভক্তির উদয় হইলে মানুষ প্রকৃত জীবসেবা করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, দেহাত্মাভিমানের করালগ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করে, বিশ্বজনীন প্রেমের অমৃতময় হ্রদে নিরন্তর নিমগ্ন হইয়া সকল প্রকার ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। তাহার জীবন নিজের ভোগ বা মোক্ষের জন্য থাকে না, কিন্তু তাহা বিশ্বমানবের দুঃখনিবারণ ও সকলেরই চিত্তের নির্ম্মলতা-সম্পাদনপূর্ব্বক বিশ্বজনীন প্রেমের অতুলনীয় আনন্দানুভবের উপায় সম্পাদনে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকে। সে পারমার্থিক রস কি, এবং তাহার কার্য্যই বা কি, কে তাহাতে অধিকারীই বা হইয়া থাকে, তাহাই 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' নামক বিস্তৃত গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ নিরূপণ করিয়াছেন।

এই পারমার্থিক রসের বন্যা বহাইবার জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ দেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অনেকেই এ রহস্য অবগত না হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেব-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উপর অযথা নিন্দা ও বিদ্রূপের কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ও স্বরূপ না জানাই এই সকল নিন্দা ও বিদ্রূপের হেতু হইয়া থাকে।

আত্মতৃপ্তি নহে—জগৎতৃপ্তি

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম মানুষকে সংসার ত্যাগপূর্ব্বক একান্তে বসিয়া জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া পারিপার্শ্বিক জীব-নিবহের সুখে-দুঃখে সহানুভূতি-বিরহিত হইয়া নিজের জন্যই আনন্দানুভব করিবার সাধন নহে। এই তত্ত্বের সহিত যাঁহার পরিচয় নাই, তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি কুটিল-কটাক্ষ করিয়া থাকেন, কিন্তু 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'কার স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে এ প্রকার আত্মতৃপ্তির সাধন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে। তাই তিনি বলিয়াছেন—

"যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি।"

অর্থাৎ যে হরির অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হয়, তাহার দ্বারা জগতের তৃপ্তি সাধিত হইয়া থাকে। শুধু তিনিই এ কথা বলিয়াছেন, তাহা নহে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলপ্রমাণ গ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবতেও ইহাই লিখিত হইয়াছে—

"যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন—
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥"

উপায় অচ্যুতার্চন

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বৃক্ষের পত্র, পুষ্প, শাখা, স্কন্ধ, প্রশাখা প্রভৃতির তৃপ্তি ও পুষ্টিসাধন করিতে হইলে তাহাদিগের উপর জলবর্ষণ করিলে কোন কাজ হয় না; কিন্তু বৃক্ষের যাহা মূল, তাহাতেই যদি বিহিতভাবে জলসেক করা যায়, তাহা হইলে তাহাদিগের তৃপ্তি, পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে; এবং যেমন চক্ষু, নাসা, ত্বক্ ও শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নিচয়ের পুষ্টি ও তৃপ্তিসাধন করিতে হইলে কেবল সেই সেই ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়-নিচয়ের সংগ্রহমাত্রে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রাণের প্রতি বা ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের মুখ্য উপাদান জীবনী শক্তির পুষ্টি-বিষয়ে উদাসীন হইলে কোন ইন্দ্রিয়েরই ভোগ বা পুষ্টি হয় না; কিন্তু ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের প্রতি প্রাতিস্বিক-ভাবে লক্ষ্য না করিয়া সকল ইন্দ্রিয়ের উপাদানভূত মূল প্রাণশক্তির পুষ্টিসম্পাদন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ঐ সকল ইন্দ্রিয় স্বতঃই পুষ্টিলাভপূর্ব্বক অভিলষিত বিষয়ভোগে সমর্থ হয়, সেইরূপ এ সংসারে যদি সকল মানুষকে তৃপ্ত করিতে চাহ—সকলের অভাব মিটাইয়া সকলকে দুঃখমুক্ত করিতে চাহ, তাহা হইলে সকলের আত্মার সহিত

অচ্যুতভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া যে পরমাত্মা এ সংসারে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন, 'তাঁহারই পূজা করিবে এবং তাহা হইলে তোমার সকলেরই পূজা করা হইবে, সকলেই তোমার উপর প্রীত হইবে, সকলেই সকল প্রকার তৃপ্তি সাধনের প্রধান হেতু বলিয়া তোমাকে বোধ করিবে।

আর্তির কামনা

এই যে সর্ব্বপূজার দ্বার স্বরূপ শ্রীভগবানের পুজা, ইহাই হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম। এই পূজার পরম সাধন হইতেছে যে পারমার্থিক রস, তাহাই 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। এই পরমার্থ-রস বা ভগবদ্‌ভক্তি মানুষকে প্রাকৃত মনুষ্যত্বাভিমান হইতে দূরে লইয়া যায়। এক কথায় বলিতে গেলে মানুষকে শ্রীভগবানের পার্ষদরূপে পরিণত করে। এই পার্ষদ অবস্থার বর্ণন করিতে যাইয়া ভক্তিশাস্ত্রের আচার্য্যগণ কি বলিয়া থাকেন, তাহা শুনুন :—

"ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরাং
অষ্টর্দ্ধিযুক্তাং অপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজাং
অন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিবার পর তিনি যখন আমাকে বর দিতে উদ্যত হইবেন, আমি তখন তাঁহার নিকট ইন্দ্রাদিলোকপ্রাপ্তিরূপ পরম গতি প্রার্থনা করিব না—যে গতিলাভ হইলে মানুষ অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া থাকে। আমি তাঁহার নিকট হইতে আমার আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ নির্ব্বাণেরও কামনা করিব না। আমি প্রার্থনা করিব—হে ভগবন্! এ সংসারে যত প্রাণী আছে, তাহাদের সকল প্রকার দুঃখ—সকল প্রকার মনের পীড়া যেন আমাতে সংক্রান্ত হয়, তাহাদের সকল পীড়া আমি নিজে গ্রহণ করিব এবং তাহারা যেন সকল প্রকার দুঃখ হইতে আমার সাধনার ফলে সম্পূর্ণভাবে মুক্তিলাভ করে।

এই যে বিশ্বজনীন প্রেম—ইহাই হইল পারমার্থিক রস, প্রাকৃত রসের ন্যায় এ রসেও স্থায়িভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাব ও উদ্দীপনবিভাব এবং আলম্বনবিভাব—সকলই আছে। কি ভাবে কিরূপ অবস্থায় কোন্ সাধনার বলে সেই স্থায়িভাব ও বিভাব প্রভৃতি পারমার্থিক রসরূপে পরিণত হইয়া

মানুষকে সর্ব্বজীবসেবার প্রকৃত সাধনস্বরূপ শ্রীভগবানের সেবাকার্য্যে অধিকারী করিয়া তোলে, তাহারই আলোচনা অতি বিস্তৃতভাবে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে' শ্রীরূপ গোস্বামী করিয়াছেন।

(৫)

রতি স্থায়িভাব

লৌকিক রসের মূলীভূত বস্তুকে আলঙ্কারিকগণ ভাব শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করেন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শৃঙ্গার বা আদিরসের মূলীভূত ভাবকে বা স্থায়ী ভাবকে তাঁহারা রতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সেই রতি কাহাকে বলে, তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক্ষণে তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক হইয়াছে।

সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন, "রতির্মনোঽনুকূলেঽর্থে মনসঃ প্রবণায়িতম্॥" অর্থাৎ মন যাহাকে চাহে, তাহার প্রতি মনের যে আনুকূল্য, তাহারই নাম রতি। এই আনুকূল্য বা প্রবণভাব কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। মনে মনে যে বস্তুকে আমি সুখের সাধনা বলিয়া বুঝি—যাহা আমার আয়ত্ত হইলে আমি বড়ই সুখী হইব বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেই বস্তুটি মনে পড়িবামাত্র আমার মন যখন অন্য সকল বস্তু ছাড়িয়া একান্তভাবে তন্ময়তা পায় এবং তাহার দিকে নিরন্তরভাবে ঝুঁকিয়া পড়ে, শুধু তাহাই নহে—তাহার প্রতি ঔদাসীন্যশূন্য হয়, বিদ্বেষ, ঘৃণা বা কঠোর ভাব হইতে বিমুক্ত হইয়া কোমলতার অনুভূতির সঙ্গে যেন তাহাতেই মিশিয়া যায়, প্রিয় বস্তুর প্রতি এইরূপ যে মানসিক অবস্থা, ইহাকেই আলঙ্কারিকগণ রতি বা আনুকূল্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

রতির অনুভব-রূপ ও সংস্কার-রূপ

এই আনুকূল্য বা রতি দ্বিবিধ;—সংস্কাররূপা রতি এবং অনুভূতিরূপা রতি। অর্থাৎ মানব হৃদয়ে জন্মজন্মান্তরের অনুভবের পরিণামস্বরূপ যে সংস্কার বা সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত রতি-বাসনা, তাহারই নাম সংস্কাররূপা রতি; আর বর্ত্তমান জন্মে কোন প্রিয়বস্তু দর্শনের পর তাহাকে অবলম্বন করিয়া সেই জন্মান্তরীণ সংস্কাররূপা রতির যে অনুভূতিরূপে পরিণতি, তাহারই নাম প্রীতি, ভালবাসা

বা অনুভবরূপা রতি। এই উভয়বিধ রতির পরিচয় মহাকবি কালিদাসের একটি শ্লোকে বড়ই সুন্দরভাবে পরিস্ফুটিত হইয়াছে—

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥" (অভিজ্ঞান-শকুন্তল)

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থানিচয়ের আনুকূল্য বশতঃ সময়বিশেষে আপনাকে যখন মনে করে, আমি বেশ সুখে আছি, বেশ স্বচ্ছন্দভাবে আরামে আমার দিন কাটিতেছে. সেই সময় হঠাৎ কোন প্রকার চিত্তাকর্ষক সুন্দর বস্তুটি দেখিয়া বা কোন মধুর ধ্বনি অকস্মাৎ শ্রবণ করিয়া সে যেন কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠে, যেন আত্মহারা হইয়া উঠে, যেন চিরবিস্মৃত একটি কোন প্রিয় বস্তুর অস্পষ্ট স্বপ্নময় অনুভূতির আকস্মিক উদয়ে তাহার অন্তরাত্মার অন্তস্তল পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠে, চিরবিস্মৃতের—চিরপ্রিয়ের আকস্মিক কল্পিত অনুভূতিতে হৃদয়ে নূতন ভাবের উন্মাদনা উদিত হয়, এই যে জন্মান্তরীণ ও ইদানীন্তন সংস্কার, ইহা হইতে সমুদ্ভূত যে কোমলতাময় অনুভূতি, ইহাই অলঙ্কারশাস্ত্রে অনুরাগ বা রতি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

মধুর রসের স্বতন্ত্র স্থায়িভাব

গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রের আচার্য্যগণ কিন্তু এই রতিকে পরমার্থ-রস বা মধুর-রসের স্থায়িভাব বলিয়া অঙ্গীকার করেন না; তাঁহাদের মতে রতি বা অনুরাগ বা প্রেম প্রাপঞ্চিক মনোবৃত্তির বহির্ভূত বস্তু; কারণ, প্রাপঞ্চিক স্থায়িভাব লৌকিক রসের উপাদান হইতে পারে, কিন্তু তাহা পারমার্থিক রসের স্থায়ী ভাব হইতে পারে না। কবিরাজ গোস্বামী—'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' এই কথাই স্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছেন—

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে' শ্রীরূপ গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন—

"নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই—রতিনামে প্রসিদ্ধ যে স্থায়ী ভাব, তাহা নিত্যসিদ্ধ অর্থাৎ তাহার উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি মনোদর্পণের

মলিনভাব অপনীত হইলে সেই নিত্যসিদ্ধ রতিভাবের যে প্রকটতা বা প্রতিবিম্বের প্রতিফলন, তাহাই সাধ্য বা উৎপন্ন হয় বলিয়া রতিকেই সাধ্য বা উৎপাদ্য অথবা অনিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় এইমাত্র।

নিত্যসিদ্ধ রতি

সেই নিত্যসিদ্ধ বা জন্মবিনাশরহিত রতির প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহাই বিশদভাবে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ আরও বলিয়াছেন—

"শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥"

ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু।

ইহার অক্ষরার্থ এইরূপ—

নিত্যোদিত প্রেম সূর্য্যসদৃশ, সূর্য্যের সহিত সূর্য্যরশ্মির যেরূপ সম্বন্ধ, প্রেমের সহিত রতির সম্বন্ধ ঠিক সেই প্রকার। সেই রতির প্রকৃত স্বরূপ হইতেছে, তাহা শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ—তাহার অভিব্যক্তি হইলে হৃদয় পরমার্থ সদ্বস্তুর আস্বাদন বিষয়ে অলৌকিক অভিলাষনিকরের আবির্ভাবে গলিয়া যায়, অননুভূতপূর্ব্ব কোমলতাসম্পন্ন হয়। ইহাই হইল রতিনামক স্থায়ী ভাবের যথার্থ স্বরূপ।

লৌকিক রসে সাময়িক দ্রবতা

লৌকিক দৃশ্যকাব্যের অভিনয়দর্শনে বা সুকবি-প্রণীত সৎকাব্যের অনুশীলনে সহৃদয়গণের রসাস্বাদের উপাদানস্বরূপ যে রতির উদয় হইয়া থাকে, তাহার সহিত পারমার্থিক রসের উপাদানস্বরূপ এই রতির একরূপতা সম্ভবপর নহে; কারণ, নাটক দেখিয়া বা কাব্য পড়িয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া আমরা যে রতি বা অনুরাগের আস্বাদন করিয়া থাকি, তাহাতে আমাদের চিত্তে মসৃণভাব বা কোমলতা আসে না। যতক্ষণ নাটক দেখি বা কাব্যের অনুশীলন করি, সেই সময় বোধ হয়, আমাদের মন যেন গলিয়া গিয়াছে; রঙ্গশালার বা কাব্যানুশীলন-গৃহের বাহিরে যে কঠোর সংসার, তাহাকে লইয়া ব্যবহার করিতে হইলে আমাদের অন্তঃকরণে যে কঠোরতা—যে অহমিকা—যে পরিচ্ছিন্ন আত্মভাব বা সঙ্কীর্ণতা—যাহাকে ছাড়িলে আমার আমিত্বই ঘুচিয়া যায়, তাহা আমাদিগকে কিয়ৎকালের জন্য ছাড়িয়া সরিয়া যাইলেও, রসাস্বাদনের নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই আবার আসিয়া তাহাই জগদ্দল পাথরের ন্যায় আমাকে

চাপিয়া ধরে। কাব্যরসানুভূতি আনন্দময় হইলেও তাহা প্রাপঞ্চিক বিষয়ের অনুভব হইতে উৎপন্ন আনন্দের ন্যায় বিনশ্বর, ক্ষণস্থায়ী এবং পরিণতিবিরস, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, যেহেতু তাহার উপাদান নিত্যসিদ্ধ বস্তু নহে অর্থাৎ নিত্যোদিত প্রেমসূর্য্যের সতত ভাস্বর রশ্মিস্বরূপ পরমার্থ-রতি নহে, এই কারণেই তাহা হইতে সমুদ্ভূত যে রস, তাহাও বৈষয়িক রসেরই ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ও পরিণামবিরস। তাই শ্রীমদ্‌ভাগবতে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

"ন যদ্‌বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা
ন যত্র হংসা বিরমন্ত্যুশিকৃক্ষয়াঃ॥"

যাহাতে মনোরঞ্জন বিচিত্র পদসমূহ বিন্যস্ত হইয়া থাকে, কিন্তু কথনও ভুবনপাবন শ্রীহরির কীর্ত্তি বর্ণিত হয় না, এরূপ সাহিত্য কাকসেবিত তীর্থের সদৃশ। কারণ মানসহংস সে তীর্থে বাস করে না, কারণ অনাবিল পরমানন্দসেবী মানসহংসগণ সে তীর্থে যাহা প্রকৃত আনন্দ, তাহার সন্ধান পায় না বলিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইতে পারে না।

প্রেম-সার ভাব

পারমার্থিক রসের উপাদানস্বরূপ এই রতি নিত্যোদিত ভগবৎপ্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণসদৃশ, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই প্রেম কি? তাহারই আলোচনা এইক্ষণে করা যাইতেছে।

চরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

"হ্লাদিনীর সার প্রেম সার ভাব।
ভাবের পরম কাষ্ঠা হয় মহাভাব॥"

চরিতামৃতকারের এই প্রেমলক্ষণ বুঝিতে হইলে হ্লাদিনী কাহাকে বলে এবং তাহার সারই বা কি, তাহা অগ্রে বুঝা আবশ্যক, এই কারণে প্রথমে হ্লাদিনীর পরিচয় সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

বিষ্ণু নামের অর্থ

বিষ্ণুপুরাণে শ্রীভগবান্‌কে বিষ্ণুনামে অভিহিত করা হইয়াছে। বিষ্ণু শব্দের যৌগিক অর্থ হইতেছে—যাহা সকল জগৎকে ব্যাপিয়া বিরাজমান থাকে, তাহাই

বিষ্ণু অর্থাৎ যাহা কার্য্যে ও কারণে, সতে অসতে, ভাল মন্দে, সুন্দরে অসুন্দরে, অণুতে বিন্দুতে, সূক্ষ্মে ও স্থূলে, সকল বস্তুতেই অনুস্যূত আছে—সকল প্রকার বিকারের আশ্রয় বা অধিষ্ঠান হইয়াও যাহা নিজে সর্ব্বদা অবিকৃত এবং একরূপ শাশ্বত, তাহাই হইল বিষ্ণু। নিজে যাহা অবিকৃত, তাহাই আবার কি প্রকারে সকল বিকারের উপাদান বা অধিষ্ঠান হইয়া থাকে, এই প্রকার শঙ্কার নিরাকরণ করিতে যাইয়া ভগবান্ বেদব্যাস বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ।
কথং সর্গাদিকর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে॥" (মৈত্রেয় প্রশ্ন)।

যাহাতে কোন গুণ নাই, যাহা কোনপ্রকার প্রমার বিষয়ীভূত নহে, সর্ব্বপ্রকার দোষ হইতে যাহা বিনির্মুক্ত, সেই ব্রহ্ম কি প্রকারে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন ?

শক্তির আধার

এই প্রশ্নের উত্তর মহর্ষি পরাশর এইরূপ দিয়াছিলেন—

"শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ॥
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা।"

এ সংসারে যতপ্রকার বস্তু কারণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কার্য্য করিতে শক্তি ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের সেই শক্তি হইতে তাহারা ভিন্ন কি অভিন্ন অথবা সেই শক্তির সহিত তাহাদের সম্বন্ধই বা কিরূপ ? তাহা চিন্তা করিয়া কেহই বুঝিতে পারে না বা বিচার করিয়া অপরকে বুঝাইতেও পারে না। অথচ তাহাদের সেই শক্তির অস্তিত্ব-বিষয়ে আমাদের কাহারও অসম্মতি নাই অর্থাৎ তাহাদের সেই শক্তির অস্তিত্ব আমরা সকলেই অঙ্গীকার করিয়া থাকি। ব্রহ্ম হইতেই সমুদ্ভূত এই সকল প্রাপঞ্চিক বস্তুনিবহে যখন এইরূপ চিন্তার অবিষয় শক্তি আমরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি, তখন সেই সকল প্রকার অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন বস্তুনিচয় যাহা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে, সেই সর্ব্বকারণ-কারণ পরব্রহ্মে যে সকল জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অনুকূল অনন্ত শক্তি বিদ্যমান আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

শক্তি ও শক্তিমান্

সুতরাং তিনি স্বয়ং নির্ব্বিকার হইলেও অসংখ্যাত বিকারের অনুকূল শক্তিনিচয় তাঁহাতে বিদ্যমান আছে, অথচ ঐ সকল শক্তি তাঁহা হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন, তাহা চিন্তা বা বিচার দ্বারা নির্ণীত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত অগ্নি হইয়া থাকে, অর্থাৎ অগ্নি দাহ, পাক ও তাপ প্রভৃতি কার্য্যের কারণ, সুতরাং তাহাতে দাহিকা, পাচিকা ও তাপিকা শক্তি বিদ্যমান আছে, ইহা স্থির। সেই দাহিকা, পাচিকা ও তাপিকা শক্তি পরস্পর বিভিন্ন হইলেও দাহ, পাক ও তাপরূপ কার্য্য যখন না থাকে, তখন ঐ শক্তিত্রয় অগ্নি হইতে পৃথক্ বলিয়া কাহারও প্রতীতিগোচর হয় না, অথচ যখন পাকাদি কার্য্য দৃষ্ট হয়, তখন এই শক্তিত্রয়কে আমরা পৃথক্ বলিয়া বিবেচনা করি এবং সেইরূপ নির্দ্দেশও করিয়া থাকি। প্রকৃত স্থলে ব্রহ্মকেও সেই অনন্ত বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে, অথচ ঐ সকল শক্তি তাঁহা হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন, তাহা তর্কের দ্বারা ব্যবস্থাপিত হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। শ্রুতিই এইরূপ ব্রহ্মশক্তির সাধক, প্রমাণ। কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—

> "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
> ন তৎসমশ্চাপ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
> পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
> স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥"

তাঁহার কোন কার্য্য নাই, কোন কার্য্য-নিষ্পাদনের অনুকূল সাধনও নাই—এ সংসারে তাঁহার সদৃশ কোন পদার্থই নাই—তাঁহা অপেক্ষা অধিক বা বৃহৎ কোন বস্তুই নাই, অথচ সকল কার্য্যের অনুকূল অসংখ্য পরম শক্তিসমূহ তাঁহার আছে—ইহা শ্রুত হইয়া থাকে। তাঁহার শক্তি, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার বল ও ক্রিয়া তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

সকল বিরোধের সমন্বয়-ভূমি

সংসারে যে সকল ধর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধ, সেই সর্ব্বাত্মভূত পরমাত্মা বিষ্ণুতে কিন্তু সেই সকল বিরুদ্ধ ধর্ম্মই পরস্পর বিরোধ পরিহারপূর্ব্বক একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া অবস্থান করে, ইহাই হইল সেই বিষ্ণুর অচিন্ত্য স্বভাব। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—

> "পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।
> উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥"

যাহা কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর বর্ত্তমান বস্তু, যাহা কিছু অতীত এবং যাহা কিছু ভবিষ্যৎ, তাহা সকলই এই পুরুষ। তিনি অমৃতত্বের ঈশ্বর অথচ যাহা অন্নের দ্বারা পুষ্টিলাভ করে, তাহাও তিনি।

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুমিমল্লোঁকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥"

সেই পুরুষের কর ও চরণ সকল দিকেই ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তাঁহার নয়ন, মুখ ও মস্তক সকল দিকেই রহিয়াছে, তাঁহার কর্ণ সকল দিকেই আছে, তিনি সকল বস্তুকেই আবৃত করিয়া রহিয়াছেন।

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥"

তাঁহার হাতও নাই, পাও নাই, অথচ তিনি বেগে ধাবনও করেন, হাতে ধারণও করেন; তাঁহার চক্ষু নাই, অথচ তিনি দেখিয়া থাকেন; তাঁহার কাণ নাই, অথচ তিনি শুনিয়াও থাকেন; এই বিশ্ব-সংসারের সবই তিনি জানিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানিতে পায় না, এইরূপ বিরুদ্ধস্বভাব-সম্পন্ন যে মহান্ পুরুষ, তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ এবং সকল বস্তুর আদিভূত।

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥"

তিনি পরমাণু হইতেও অণুতর, অথচ তিনি মহৎ আকাশাদি হইতেও মহত্তর, এই জীবনিবহের তিনিই আত্মা, অথচ তিনি সঙ্কীর্ণ গুহার মধ্যে নিহিত, যে আত্মা ভোগ-লালসা-পূরণের অনুকূল সকল কর্ম্মই পরিত্যাগ করিয়াছে, সে-ই তাঁহাকে দেখিতে পায় এবং তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই জীবের সকলপ্রকার শোক নিবৃত্ত হয়, তখন বিধাতার অনুগ্রহে সে দেখিয়া থাকে যে, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই ভূমা।

এইরূপ অসংখ্য শ্রুতি বিদ্যমান আছে, যাহার দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে যে, সেই বিষ্ণু বা সর্ব্বব্যাপী প্রকাশশীল দেব, সকল প্রকার বিরোধের একমাত্র সমন্বয়ক্ষেত্র, সুতরাং আশ্চর্য্য স্বরূপ ও অচিন্ত্য-শক্তি-নিচয়ের

একমাত্র আধার, লৌকিক প্রমাণের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ বুঝিবার কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও, যাহার প্রতি তাঁহার অহৈতুকী করুণার অভিব্যক্তি হয়, সে-ই তাঁহাকে দেখিতে পায় ও কৃতার্থ হইয়া থাকে।

এই প্রকারে সর্ব্বাত্মভূত সেই বিষ্ণুর স্বরূপ প্রতিপাদন পূর্ব্বক আরও বিশদভাবে সেই বিষ্ণুতত্ত্বকে বুঝাইবার জন্য বিষ্ণুপুরাণ তাঁহার অচিন্ত্য ও বিচিত্র শক্তি সম্বন্ধে কি বলিতেছে, এইবার তাহার অবতারণা করিয়া সেই শক্তি-নিচয়ের মধ্যে পরমা শক্তি যে হ্লাদিনী, তাহার আলোচনা করিব; কারণ, এই হ্লাদিনী শক্তির জ্ঞান ব্যতিরেকে পরমার্থ-রসের উপাদানস্বরূপ যে রতি বা ভগবৎপ্রেম, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

(৬)

ত্রিবিধ শক্তি

বিষ্ণুপুরাণে ভগবানের শক্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাঽপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ স্যাৎ বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বদা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যন্নুসন্ততান্॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই—সকল জীবের ও সকল প্রপঞ্চের আত্মস্বরূপ সেই যে বিষ্ণু, তাঁহার শক্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; প্রথম—স্বরূপশক্তি; দ্বিতীয়—তটস্থা শক্তি; তৃতীয়—বহিরঙ্গশক্তি। তাঁহার স্বরূপভূত যে শক্তি, তাহাই পরাশক্তি; তাঁহার দ্বিতীয় যে শক্তি—যাহাকে তটস্থশক্তি বলা হইয়াছে,—সংসারের সকল জীবই সেই তটস্থশক্তি। তৃতীয় যে শক্তি, যাহা বহিরঙ্গশক্তি বলিয়া কথিত হয়, তাহাকেই অবিদ্যা বা মায়াশক্তি বলা যায়, এই অবিদ্যাশক্তির দ্বারা আক্রান্ত বা অভিভূত হইয়া জীবনিবহ এই সংসারে ধারাবাহিক দুঃখসমূহকে অনুভব করিয়া থাকে, ইহাই হইল—এই শ্লোক কয়টির সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য।

কৃপাই জ্ঞানের উপায়

এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, বিষ্ণুপুরাণের এই দুইটি শ্লোকের দ্বারা অদ্বয়, অখণ্ড পরমাত্মতত্ত্বকে অনন্ত বিচিত্র শক্তিসমূহের দ্বারা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা

হইয়াছে। ঈশ্বরতত্ত্ব কি, তাহা বুঝিতে হইলে ঈশ্বরেরই কৃপা ব্যতিরেকে তাহা বুঝিতে পারা যায় না, ইহাই হইল হিন্দুশাস্ত্রসমূহের অভিপ্রায়। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, লৌকিক এমন কোন প্রমাণই নাই, যাহার সাহায্যে নিজ বিবেকের উপর নির্ভর করিয়া আমরা শ্রীভগবানের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা বুঝিতে পারি। তাই শ্রীমদ্‌ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে—

"অথাপি তে দেব পদারবিন্দ-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্ মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥"

হে দেব! হে ভগবন্! তুমিই লৌকিক সর্ব্বপ্রকার প্রমাণের অগোচর হইলেও, তোমার চরণারবিন্দের প্রসাদ যে পাইয়াছে, সেই তোমার মহিমার স্বরূপ অবগত হইতে সমর্থ হয়। নিজের কর্ত্তৃত্ব ও জ্ঞাতৃত্বের উপর যাহার দৃঢ়বিশ্বাস, এরূপ ব্যক্তি চিরকাল যুক্তি-তর্ক প্রভৃতি দ্বারা অনুসন্ধান করিয়াও তোমার মহিমা অবগত হইতে সমর্থ হয় না।

লৌকিক প্রমাণের উপযোগিতা

সুতরাং ইহাই স্থির হইতেছে যে, যে সকল দার্শনিক অনুমান-প্রমাণের দ্বারা—ঈশ্বরেরই বাক্যস্বরূপ শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণের অপেক্ষা না করিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের শ্রম নিষ্ফলই হইয়া থাকে। তাই বলিয়া অনুমান প্রভৃতি লৌকিক প্রমাণের ঈশ্বরত্ত্ব-নিরূপণবিষয়ে কোন-প্রকার সাহায্য করিবার শক্তি নাই, এ কথাও হিন্দুশাস্ত্রকারগণের অভিমত নহে। শ্রুতির দ্বারা প্রথমতঃ ঈশ্বরতত্ত্বের স্বরূপ কথঞ্চিৎ অধিগত হওয়ার পর তাহাই অনুকূলভাবে যদি অনুমানাদি প্রমাণের প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে শ্রুতির দ্বারা অস্পষ্টভাবে প্রকাশিত ঈশ্বরতত্ত্ব অনুকূল অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা আরও অধিকভাবে হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। অর্থাৎ বিস্পষ্টভাবে—নিঃসন্দিগ্ধভাবে উহা বুদ্ধির বিষয় হইয়া থাকে।

দর্শন, শ্রবণ, মনন ও ধ্যান

তাই শ্রুতিই নির্দ্দেশ করিতেছেন—"আত্মা বাহরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ।" অর্থাৎ এ সংসারতাপ হইতে ঐকান্তিক নিষ্কৃতিলাভ করিতে হইলে আত্মাকে দেখিতে হইবে, দেখিবার উপায় কি? দেখিবার উপায়

হইতেছে শ্রবণ, মনন ও ধ্যান। শ্রুতির এই উক্তির তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে যাইয়া পুরাণ বলিতেছে—

"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ॥"

অর্থাৎ "ভগবানের স্বরূপ কি, তাহা প্রথমতঃ শ্রুতিবাক্যের সাহায্যে বুঝিতে হইবে, তাহার পর সেই শ্রুতিবাক্যের অনুকূল যুক্তিসমূহের দ্বারা আত্মার মনন করিতে হইবে। মননের পর একাগ্রচিত্তে তাহার ধ্যান করিতে হইবে। সুতরাং এইরূপ শ্রবণ, মনন ও ধ্যানই হইতেছে আত্মদর্শন করিবার উপায়।"

সৎ, চিৎ, আনন্দ

এই আত্মার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া উপনিষৎ বলিতেছেন, "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম তৎ সত্যং স আত্মা।" অর্থাৎ বিজ্ঞান ও আনন্দই ব্রহ্ম, তাহাই সত্য এবং সেই ব্রহ্মই সকলের আত্মা, অদ্বৈতবাদিগণ এই উপনিষৎকে অবলম্বন করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আমরা যাহাকে সংসারী বা জীব বলিয়া বুঝি, সেই জীব বস্তুতঃ ব্রহ্মই, তাহাতে যে আনন্দরূপতা ও বিজ্ঞানরূপতা সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে, তাহা অবিদ্যাবশতঃ আমরা ব্যবহার-দশাতে অনুভব করিতে না পারিলেও তাহা সত্যই সেই অবিনাশী অখণ্ড, নির্ব্বিশেষ, সর্ব্বদা একরূপ, সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। ব্রহ্মই অবিদ্যাবশতঃ সংসার-দশাতে জীব বলিয়া ব্যবহৃত হইলেও তাহা প্রকৃতপক্ষে নিজরূপ কখনই পরিত্যাগ করিতে পারে না। এ অবিদ্যা দ্বারা আরোপিত যে সংসার, তাহা তাহার বাস্তবিক রূপ নহে; তাহার বাস্তবরূপ হইল সৎ, চিৎ ও আনন্দ। সৎ, চিৎ ও আনন্দ একই বস্তুর পৃথক্ পৃথক্ ব্যপদেশ মাত্র, অর্থাৎ যাহা সৎ, তাহাই চিৎ ও তাহাই আনন্দ। দুঃখ হইতে তাহা সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, ইহাই বুঝাইবার জন্য তাহাকে আনন্দ-শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায়; জড় হইতে তাহা অত্যন্ত ভিন্ন—ইহা বুঝাইবার জন্য তাহাকে চিৎ—চৈতন্য ও জ্ঞান প্রভৃতি শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়, এবং অসৎ অর্থাৎ মায়িক বা কল্পিত সকল বস্তু হইতে তাহা অত্যন্ত বিলক্ষণ, ইহাই বুঝাইবার জন্য তাহাকে 'সৎ' এই শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়।

নেতি দ্বারা প্রকাশ

সুতরাং তাঁহাদিগের মতে একই বস্তু এই ত্রিবিধ শব্দের দ্বারা নিষেধমুখে প্রতিপাদিত হয়, এই মাত্র বুঝিতে হইবে। এইরূপ নিষেধমুখে সেই অদ্বয় বস্তুকে বুঝান কেন হইয়াছে, ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, এইভাবে নিষেধমুখে তাহার নির্দ্দেশ করা ছাড়া অন্য কোন প্রকারে তাহার নির্দ্দেশ বা প্রতিপাদন হইতে পারে না বলিয়াই শ্রুতি এইরূপ করিয়া থাকে। তাঁহারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে, শব্দ দ্বারা সাক্ষাদ্‌ভাবে যে বস্তু প্রতিপাদিত হয়, তাহা বিশেষণযুক্ত বস্তুই হইয়া থাকে। যাহার কোন বিশেষণ নাই, যাহার সদৃশ বা বিসদৃশ কোন বস্তুই নাই, যাহাতে স্বগত, স্বজাতীয় বা বিজাতীয় কোন প্রকার ভেদ থাকিতে পারে না, এরূপ বস্তুকে সাক্ষাদ্‌ভাবে বুঝাইবার সামর্থ্য কোন শব্দেই নাই বলিয়া অগত্যা এইরূপ নিষেধমুখে সেই অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বের স্বরূপ বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব কল্পিত

এই অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্মের জীবত্ব যেপ্রকার কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা আরোপ মাত্র, সেইরূপই ঈশ্বরত্ব তাঁহাতে কল্পিত বা আরোপ মাত্র। তিনি জীবও নন, তিনি ঈশ্বরও নন, জীবত্ব তাঁহার উপর অজ্ঞান বশতঃ আরোপিত হয়, সেইরূপ ঈশ্বরত্ব তাঁহাতে অজ্ঞান বশতঃ আরোপিত হয় মাত্র। ঈশ্বরত্ব তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ নহে, শুক্তিতে রজতের ন্যায় বা রজ্জুতে সর্পের ন্যায় সেই এক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে জীবেশ্বরভাব কল্পিত অর্থাৎ বাস্তব নহে।

ভক্তিশাস্ত্রের ভিন্নমত

এইরূপ অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্তকে কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রের আচার্য্যগণ অর্থাৎ পরমার্থ-রসের আস্বাদনকারী ভক্তগণ অঙ্গীকার করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে অদ্বৈতবাদীর এইরূপ যে সিদ্ধান্ত, তাহা উপনিষৎ-সমূহের একদেশ-দর্শনের ফল হইতে পারে। কিন্তু সমগ্র উপনিষৎশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে এ প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বিবেকিগণের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। উপনিষদের ব্যাখ্যাতা পরমর্ষিগণ কর্ত্তৃকও এইরূপ সিদ্ধান্ত যে আদৃত হয় নাই, তাহা বেদান্তসূত্রের রচয়িতা মহর্ষিপ্রবর বেদব্যাসেরই উক্তির দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

ব্রহ্ম, ভগবান্, পরমাত্মা

মহর্ষি বেদব্যাস ভাগবতে স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যদ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥"

"তত্ত্ববিদ্‌গণ যাঁহাকে অদ্বয় তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই অদ্বয় তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিনটি শব্দের দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।" ভাগবতের এইপ্রকার উক্তির দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে, অদ্বয় তত্ত্ব যেমন ব্রহ্ম এই শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়, তেমনই তাহা পরমাত্মা ও ভগবান্ এই দুইটি শব্দের দ্বারাও শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

স্বরূপ নির্দ্দেশ

শ্রুতিতে যাহাকে এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং অদ্বৈতবাদিগণের মতে যে বস্তুকে বিধিমুখে কোন শব্দই প্রতিপাদন করিতে পারে না, সেই বস্তুই 'ব্রহ্ম' 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্' এই তিন শব্দের দ্বারাই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, এইরূপ যে ভাগবতের উক্তি, তাহা দ্বারা ব্রহ্মে ভগবত্তা যে কল্পিত, তাহা বুঝিতে পারা যায় না, অথচ অদ্বৈতবাদিগণ সকলেই একবাক্যে ব্রহ্মের ভগবত্তা যে কল্পিত, ইহা অঙ্গীকার করিতে কোন প্রকার কুণ্ঠা বোধ করেন না। আরও এক কথা এই যে, একমাত্র অদ্বয় তত্ত্বই যদি সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য-বিষয় হয়, তাহা হইলে অনেকগুলি শ্রুতিকে উপনিষদের মধ্য হইতে ছাঁটিয়া বাহির করিতে হয়। অদ্বৈতবাদীর মতানুসারে ঐ সকল শ্রুতির অর্থকে অসত্য বা গৌণ বলিয়া মানিতে হয়। সেই সকল শ্রুতি কিরূপ, তাহারও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। শ্রুতিতে দেখিতে পাই— "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দীভবতি। ক এবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদ্যেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।"

"তাহাই (অর্থাৎ ব্রহ্মই) রসস্বরূপ। এ সংসারে কে স্পন্দিত হইতে পারিত, কে বাঁচিয়া থাকিতে পারিত, যদি সেই রসরূপে প্রকাশমান আনন্দ না থাকিত?"

তিনি রস অর্থে আস্বাদ্য

এই শ্রুতিতে পূর্ব্বকথিত সেই অদ্বয়তত্ত্বকে রস বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। 'রস' শব্দের অর্থ—যাহা রসিত হয়, অর্থাৎ আস্বাদিত হয়, তাহাই, সুতরাং রস-শব্দের অর্থ আস্বাদ্য, সেই আস্বাদ্যকেই আবার ঐ শ্রুতি আনন্দ বলিয়া

নির্দ্দেশ করিতেছে। আনন্দই যে ব্রহ্মের স্বরূপ, তাহা ত সকল অদ্বৈতবাদী স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের মতে আনন্দরূপ যে ব্রহ্ম, তাহা আস্বাদ্য নহে। আস্বাদন করিতে হইলে আস্বাদ্য এবং আস্বাদয়িতা এই উভয়েরই সত্তা অপেক্ষিত হইয়া থাকে। আস্বাদয়িতা এবং আস্বাদ্য যদি পরস্পর ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে আস্বাদ্য-আস্বাদক-ভাব বা ভোগ্য-ভোক্তৃভাব কখনই বাস্তব হইতে পারে না। ইহা কে অস্বীকার করিবে? শ্রুতি কিন্তু স্পষ্টভাবে সেই আনন্দরূপ বস্তুকে রসশব্দ প্রয়োগ দ্বারা আস্বাদ্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় অদ্বৈতবাদিগণকে বলিতে হইবে যে, ব্রহ্ম আস্বাদস্বরূপ হইতে পারেন, কিন্তু কিছুতেই আস্বাদ্য হইতে পারেন না। যেহেতু, আস্বাদ ও আস্বাদ্য কখনও এক হয় না। ইহাই যদি তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে যে, উপনিষদের যে অংশে ব্রহ্মকে 'রস' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সে অংশটি গৌণ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত, আর উপনিষদে যেখানে তাহাকে আস্বাদ অর্থাৎ জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই অংশটি বাস্তব প্রামাণ্যযুক্ত।

নানা বিশেষণ

তাহার পর উপনিষদ্ আরও বলিতেছেন—

"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।
স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদ্ আত্মযোনির্জ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ॥
প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ॥"

তাঁহাকেই জানিয়া লোক মৃত্যুকে অতিক্রমণ করিতে পারে। মৃত্যু অতিক্রমণের অন্য পন্থা নাই। তিনি বিশ্ব নির্ম্মাণ করেন, তিনি বিশ্বকে জানেন। তিনি আত্মযোনি, তিনি কালেরও কাল, তিনিই জ্ঞাতা, তিনি গুণী, তিনি সর্ব্ববিৎ, তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের পতি, তিনি গুণেশ, সংসার হইতে মোক্ষ বা সংসারের স্থিতি-বন্ধন, তাহার তিনিই কারণ।

সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তি

এই শ্রুতি আবার বলিতেছেন—

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যে বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং, মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥"

"যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে সকলবেদের উপদেশ করিয়াছেন, সেই আত্মবুদ্ধিতে প্রকাশ দেবকে আমি মুমুক্ষু হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।" এই কয়টি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা জগদীশ্বরের যে স্বরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা অদ্বৈতবাদীর মতানুসারে সগুণব্রহ্ম অর্থাৎ কল্পিত, ইহা বলিতে হইবে। কারণ, তাঁহাদিগের মতে নিগুর্ণ ব্রহ্মের যে জ্ঞান, তাহাই মোক্ষের হেতু। এই শ্রুতিতে কিন্তু স্পষ্টই বলিতেছে যে, মুমুক্ষু জীব যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, তিনি সগুণ, সুতরাং সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা যে মোক্ষলাভের কারণ, তাহা এই শ্রুতির বিস্পষ্ট অর্থ, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্মের যে সগুণ ভাব, তাহা অনিত্য বা কল্পিত, কিন্তু শ্রুতি তাহা বলেন না।

সগুণ ভাব কল্পিত নহে

শ্রুতি স্পষ্টই বলিতেছেন—

"স ঈশে অস্য জগতো নিত্যমেব
নান্যো হেতুর্বিদ্যত ঈশনায়।"

নিত্যসিদ্ধ ঈশত্ব

অর্থাৎ যিনি এই জগতের নিত্য ঈশ্বর, তাঁহার সেই যে ঈশভাব, তাহা অন্য কোন হেতুর দ্বারা জনিত নহে, অর্থাৎ তাঁহার তাহা স্বতঃসিদ্ধ; সুতরাং শ্রুতিতে ব্রহ্মের যে ঈশভাব, তাহা মায়া হইতে বা অবিদ্যা হইতে প্রসূত নহে, ইহা নিজ মুখেই শ্রুতি বলিয়া দিতেছেন। এতাদৃশ দৃঢ়তর প্রমাণ সত্ত্বেও অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মের ঈশভাব বা ঈশ্বরত্ব ব্রহ্মভিন্ন যে মায়া বা অবিদ্যা, তাহার দ্বারাই কল্পিত হইয়া থাকে। জ্ঞানের দ্বারা সেই মায়া বা অবিদ্যা অপনীত হইলে ব্রহ্মের ঈশত্বও বিলুপ্ত হয়। শ্রুতি কিন্তু স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন—ব্রহ্মের যে ঈশভাব, তাহা নিত্য এবং সেই ঈশভাব অন্য কোন কারণ হইতে প্রসূত হয় না। তাহা তাঁহার নিত্যসিদ্ধ স্বভাব। এই প্রকার পরস্পর শ্রুতিবিরোধের সমন্বয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অদ্বৈতবাদিগণ কতকগুলি শ্রুতিকে পারমার্থিক প্রমাণ বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন, এবং কতকগুলি শ্রুতিকে গৌণপ্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকার করেন, অর্থাৎ যে সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মকে নিরাকার, নিগুর্ণ, অদ্বিতীয় ও জ্ঞানস্বরূপ বলা হইয়াছে, সেই সকল শ্রুতিরই পারমার্থিক প্রামাণ্য অদ্বৈতবাদিগণ মানিয়া থাকেন,

আর যে সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মকে সগুণ, সাকার ও জীব হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে, সেই সকল শ্রুতির পারমার্থিক প্রামাণ্য নাই, কিন্তু গৌণ প্রামাণ্য বা ব্যবহারিক প্রামাণ্য বিদ্যমান আছে।

অদ্বৈতীর অর্দ্ধকুক্কুটীয় ন্যায়

অদ্বৈতবাদিগণের এই প্রকার যে ব্যবস্থা, তাহা ভক্তিবাদিগণের নিকট প্রমাণসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হয় না। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিবার মূল প্রমাণ হইতেছে যখন শ্রুতি, তখন সেই শ্রুতি যাহা বলিতেছে অর্থাৎ যে ভাবে ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, অবিকৃতভাবে তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এ স্থলে "অর্দ্ধকুক্কুটীয়" ন্যায় অবলম্বন করা কিছুতেই যুক্তিসহ হইতে পারে না। সেই অর্দ্ধকুক্কুটীয় ন্যায়টি এই প্রকার—

কোন ব্যক্তির নিকটে একটি কুক্কুটী ছিল, সে নিত্য একটি অণ্ড প্রসব করিত। কুক্কুটীর স্বামী সেই কুক্কুটীপ্রসূত অণ্ড প্রতিদিনই একটি করিয়া ভক্ষণ করিতেন, ইহাই তাঁহার অভ্যাস ছিল। কোন সময় তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, কুক্কুটীর অণ্ড ত খাইয়াই থাকি, কিন্তু কুক্কুটীর মাংসও শুনিয়াছি বড় আস্বাদযুক্ত, সুতরাং তাহারও যোগাড় করিতে হইবে। তাঁহার একটি সুবুদ্ধি ভৃত্য ছিল, তাহার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা কর্ত্তা নিজেও যে না করিতেন, তাহা নহে, অন্য অনেকেও করিত। তিনি সেই ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন যে, বাজার হইতে কুক্কুটের মাংস ক্রয় করিয়া আন; কারণ, কুক্কুটের মাংস অদ্য আহার করিতে হইবে। প্রভুর আদেশ পাইয়া সুবুদ্ধি ভৃত্য হাসিতে হাসিতে বলিল যে, কুক্কুটের মাংসের জন্য বাজারে যাইতে হইবে কেন, বাড়ীতে যে কুক্কুটী আছে, তাহাকে মারিলেই ত মাংস পাওয়া যাইবে। কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন যে, তাহা হইলে আমি যে প্রত্যহ কুক্কুটের অণ্ড ভক্ষণ করিয়া থাকি, তাহার কি গতি হইবে? প্রত্যুৎপন্নমতি ভৃত্য তখনই উত্তর করিল যে, আপনার প্রত্যহ কুক্কুটীর অণ্ড ভক্ষণও যাহাতে হয় অথচ বাজারে গিয়া কুক্কুটমাংস খরিদ করিতেও না হয়, তাহার ব্যবস্থা আমি করিতেছি। কর্ত্তা বলিলেন, তাহা কিরূপে হইবে? প্রত্যুৎপন্নমতি ভৃত্য উত্তর করিল যে— আমাদের এই কুক্কুটী যে অংশের দ্বারা অণ্ড প্রসব করে, সেই অংশটি রাখিয়া দিব, তার তাহার শরীরের বাকি অংশ আপনাকে রাঁধিয়া খাওয়াইব।"

কুক্কুটীর অর্দ্ধেক ভাগ নিত্য অণ্ড প্রসব করিবে, আর অর্দ্ধভাগ রন্ধনার্থ

কল্পিত হইবে, ইহা যেরূপ সম্ভবপর নহে, সেইরূপ কোন যুক্তিবিরুদ্ধ বস্তু যদি কেহ মানিয়া তর্ক করিতে উদ্যত হয়, তবে সেই তর্ককে পণ্ডিতগণ "অর্দ্ধকুক্কুটীন্যায়" বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

শ্রুতির মুখ্যগৌণত্ব কল্পনা অযৌক্তিক

অদ্বৈতবাদিগণ পরমাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রুতিকে স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইতেছেন, অথচ সেই শ্রুতিরই বহু অংশ ব্যবহারিক প্রমাণ বা গৌণ প্রমাণ বলিয়া নিজ শিষ্যগণকে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, ইহা কিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে? তাঁহাদিগেরই ন্যায় দ্বৈতবাদিগণ বলিবেন যে, শ্রুতির মধ্যে দ্বৈতপ্রতিপাদক যে অংশ, তাহাই পারমার্থিক প্রমাণ, এবং অদ্বৈততত্ত্বপ্রকাশক যে সকল অংশ, তাহার ব্যবহারিক বা গৌণ প্রামাণ্যই হউক। যে পর্য্যন্ত শ্রুতি হইতে ইহা অর্থাৎ দ্বৈতপ্রতিপাদক শ্রুতি অপ্রমাণ এবং অদ্বৈতপ্রতিপাদক শ্রুতিগুলি প্রমাণ স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা অদ্বৈতবাদিগণ দেখাইতে না পারিবেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের এই যে শ্রুতির ভাগাভাগি করিয়া মুখ্য ও গৌণ প্রামাণ্যের ব্যবস্থা সিদ্ধান্ত, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট "অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়" সদৃশ বলিয়া উপেক্ষিতই হইবে।

(৭)

আনন্দলিপ্সু জীব

শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি ত্রিবিধ, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেই শক্তিত্রয়ের মধ্যে হ্লাদিনীশক্তির সহিত পরমার্থ-রসের সম্বন্ধ বড়ই ঘনিষ্ঠ, সুতরাং তাহারই আলোচনা এক্ষণে করা যাইতেছে। অধ্যাত্মতত্ত্বদর্শিগণ শ্রীভগবান্‌কেই সুখ বা আনন্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের মতে সংসারের সকল জীবই তাঁহাকে যে চাহে, তাঁহাকে যে ভালবাসে, তাঁহাকে পাইতেছি না বা পাইব না, এই ভাবনায় ব্যাকুল হয়, তাহা মানিতেই হইবে।

মানবমাত্রই এ সংসারে জানিয়া শুনিয়া যাহা কিছু করে, সে সকলেরই উদ্দেশ্য যে সুখভোগ, তাহা ত আমরা সকলেই বুঝি। শ্রীভগবান্‌ই যদি সুখ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে পাইবার জন্য বা নিত্যপ্রাপ্ত তাঁহাকে পাইয়াছি বলিয়া অনুভব করিবার জন্য, আমরা যে সকলেই জ্ঞানপূর্ব্বক সকলপ্রকার কার্য্য করিয়া থাকি, তাহাও স্থির; কিন্তু, তাই বলিয়া আমরা যে সকলেই

ভগবৎপ্রেমিক বা শুদ্ধ ভক্ত, তাহা বলিতে পারা যায় না। কেন যে এমন হয়, ইহারই উত্তর দিতে যাইয়া পারমার্থিক রসতত্ত্ববিদ্ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, হ্লাদিনী-শক্তির প্রেমময়ী বৃত্তির অনাস্বাদনই হইতেছে ইহার কারণ। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের এই উক্তির মধ্যে যে গভীর দার্শনিকতা এবং অখণ্ডনীয় সত্য নিহিত রহিয়াছে, এক্ষণে তাহারই অনুশীলন করা যাইতেছে।

শিল্পীর সৌন্দর্য্যসৃষ্টি

বল দেখি—এ সংসারে সুন্দর কে? মানুষ অনাদিকাল হইতে সুন্দরের উপাসনা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া চলিতেছে, কবি সুন্দরকে অনুভূতির গোচর করিয়া তাহারই সৌন্দর্য্য অপরকে অনুভব করাইবার জন্য ভাষার সাহায্য গ্রহণ করে, যাহার ভাষা নিজের অনুভূত সৌন্দর্য্যকে অনায়াসে অপরের হৃদয়রাজ্যে ভাবের সিংহাসনে বসাইয়া একচ্ছত্রী সাম্রাজ্য করাইতে সমর্থ হয়, এ সংসারে সেই ত মহাকবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। শিল্পী নিজের কল্পনা ও প্রতিভাবলে সৌন্দর্য্যের প্রতিমা মনের মধ্যে গড়িয়া অপরকে তাহাই বুঝাইবার জন্য—হয় প্রস্তর, না হয় মাটী, কিম্বা কাষ্ঠ অথবা পটের সাহায্য গ্রহণ করিয়া সেই প্রতিমাকে ফলাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। শিক্ষার বলে, সাধনার প্রভাবে জড়-প্রস্তর, মাটি, কাষ্ঠ বা পটে সেই তাহার মানসী প্রতিমা যদি সজীব হইয়া উঠে, তাহা হইলেই সেই শিল্পী মহাভাস্কর—মহামার্ত্তিক—মহাসূত্রধর বা মহাচিত্রকর বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়, তাহার শিল্পকলা-কৌশল এ সংসারে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই প্রশংসাভাজন হইয়া থাকে। এই সকল শিল্পী যখন দল বাঁধিয়া একত্র সমবেত হইয়া নিজ নিজ কল্পিত ব্যষ্টি সৌন্দর্য্যগুলির সম্মিলনে একীভূত সমষ্টি মানস-সৌন্দর্য্যপ্রতিমাকে গঠিত করিয়া সহস্র সহস্র—লক্ষ লক্ষ মানবের অনুভূতির যোগ্য করিয়া সেই বিরাট মানসী প্রতিমার জীবন দান করিতে সমর্থ হয়, তখনই পৃথিবীতে পিরামিড, তাজমহল, দেওয়ান-আম, দেওয়ানখাস, ভুবনেশ্বর মন্দির, রামেশ্বর তোরণ প্রভৃতি ভুবনবিখ্যাত বিস্ময়াবহ বিরাট বস্তুনিচয় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

সৌন্দর্য্যতত্ত্বে নানামত

কাব্য, নাটক ও শিল্পকলা-কৌশল প্রভৃতি Fine art,—এ সংসারে যাহাকে লইয়া, সেই সুন্দর বস্তু যে কিরূপ—তাহার নিরূপণ করিতে যাইয়া আমরা

কিন্তু, বিষম সমস্যার মধ্যে পড়িয়া যাই। পৃথিবীর সৌন্দর্য্যতত্ত্ববিদ্ মহা মহাপণ্ডিতগণ এই সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইতে যাইয়া এত বিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়া বসিয়াছেন যে, তাহাদের মধ্যে সার বাছিয়া লইয়া সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব নিরূপণ করা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার না হইলেও তাহা যে নিতান্ত কৃচ্ছ্রসাধ্য, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কিরূপ মতভেদ হইয়াছে, তাহাই অগ্রে দেখাইয়া পরে আমাদের বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মত কি, তাহা দেখান যাইতেছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত Baumgarten (বম্‌গার্টেন) বলেন—

"The aim of beauty itself is to please and excite a desire",

আনন্দকে আস্বাদিত করাইয়া কামনার উৎপাদন সৌন্দর্য্যের উদ্দেশ্য বা কার্য্য হইয়া থাকে।

তিনি আরও বলিয়াছেন—

"The highest embodiment of beauty is seen by us in nature"—"The highest aim of art is to copy nature."

আমরা সৌন্দর্য্যের সমুন্নততম মূর্ত্তিকে স্বভাবের মধ্যেই দেখিয়া থাকি; সুতরাং স্বভাবের প্রতিকৃতি-নির্ম্মাণই সমুন্নততম কলা-কুশলতার পরিণতি।

সত্য ও সুন্দরে বিরোধ

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে জার্ম্মাণীর কলাতত্ত্ববিদ্ বম্‌গার্টেন সৌন্দর্য্যের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদনুসারে আমরা ইহাই বুঝিয়া থাকি যে, যাহা হইতে আমরা আনন্দ পাই এবং যাহা আনন্দ উৎপাদন করিয়া আমাদের হৃদয়ে আনন্দের উত্তরোত্তর অনুভূতির জন্য তৃষ্ণা বা আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দেয়, তাহারই নাম সৌন্দর্য্য। কবি, ভাস্কর ও চিত্রকর প্রভৃতি স্বভাবে বা প্রাকৃতরাজ্যে এই সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া, অসাধারণ কলাকুশলতা দ্বারা তাহাই অপরের আনন্দের জন্য অঙ্কিত করিয়া থাকেন মাত্র—সৌন্দর্য্য স্বভাবের ধর্ম্ম, তাহাকে দেখিতে হইলে—বুঝিতে হইলে, অনুভূতির বিষয় করিয়া আস্বাদন করিতে হইলে, স্বভাবেরই শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। সৌন্দর্য্য স্বভাবসিদ্ধ বস্তু, তাহার সৃষ্টি করা যায় না। তাহার প্রতিকৃতি সৃষ্টি করিবার জন্যই কবি প্রভৃতির সাধনা হইয়া থাকে। বম্‌গার্টেনের এইরূপ সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের সিদ্ধান্ত মিলে কি না, এ

বিচার করিতেছি না, কিন্তু, এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে যাইয়া তিনি যে অবতরণিকা করিয়াছেন, তাহার একটু আলোচনা অগ্রে করিতে চাহি।

তিনি বলিয়াছেন,—

"The object of logical knowledge is truth, the object of aesthetic (sensuous) knowledge is beauty."

নৈয়ায়িক বা যথার্থ প্রমাণ হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানের বিষয় সত্য হইয়া থাকে, আর রসগ্রাহী ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান যাহাকে প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহারই নাম সৌন্দর্য্য হইয়া থাকে।

বম্‌গার্টেনের এইরূপ সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করিতে হইলে বলিতে হয়, সৌন্দর্য্য এবং সত্য এক বস্তু নহে ; পারমার্থিক প্রমাণ সৌন্দর্য্যকে বুঝাইতে পারে না, কিন্তু কামনারঞ্জিত ইন্দ্রিয়জনিত ভ্রান্তিস্থলাভিষিক্ত জ্ঞানই সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করে বলিয়া, সৌন্দর্য্য—সত্য বা অবাধিত বস্তু নহে। ফলে দাঁড়াইল যে, যাহা সত্য, তাহা সুন্দর নহে এবং যাহা সুন্দর, তাহা সত্য নহে। এইরূপ সিদ্ধান্তের প্রতি যাঁহার আস্থা আছে, তাঁহার নিকটে হ্লাদিনী শক্তির পরিচয়প্রদান-চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র ; কারণ, হ্লাদিনীর স্বভাব হইতেছে এই যে, তাহা যে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি করাইবার জন্য, সংসারে প্রতি জীবের হৃদয়ে বৃত্তিরূপে পরিণত হইবার জন্য অনাদিকাল হইতে ব্যাপৃত রহিয়াছে, সেই সৌন্দর্য্যই ধ্রুব সত্য এবং সেই সত্যের উপরই বিশ্বসংসার প্রতিষ্ঠিত। যথাসময়ে এই বিষয়ের আলোচনা বিস্তৃতভাবে অগ্রে করা যাইবে।

সত্য শিব সুন্দর কি পৃথক্ ?

বম্‌গার্টেন আরও কি বলিতেছেন, দেখা যাক। তিনি বলিতেছেন—

"Beauty is the Perfect (the Absolute) recognised through the senses ; Truth is the Perfect perceived through reason ; Goodness is the Perfect reached by moral will."

নিরতিশয় যে সৌন্দর্য্য, তাহা ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞানের সাহায্যে অনুভূত হইয়া থাকে ; নিরতিশয় যে সত্য, তাহা যুক্তির সাহায্যে প্রত্যক্ষীকৃত হয়, আর নিরতিশয় যে মঙ্গল, তাহা নৈতিক উদ্যমের দ্বারা লব্ধ হয়।

এই উক্তির সহিতও হ্লাদিনীর উপাসক ভক্ত দার্শনিকগণের ঐকমত্য হওয়া সম্ভবপর নহে। কারণ, ভক্ত দার্শনিকগণের সিদ্ধান্তই হইতেছে যে, যাহা নিরতিশয় সত্য, যাহা নিরতিশয় সুন্দর ও যাহা নিরতিশয় মঙ্গল, তাহা

একই বস্তু। নিরতিশয় সত্য, নিরতিশয় সুন্দর ও নিরতিশয় মঙ্গলস্বরূপ এক অদ্বিতীয় শ্রীভগবান্‌কে আস্বাদিত করাইবার অনুকূল যে শক্তি শ্রীভগবানে নিত্য ব্যাপৃত রহিয়াছে, তাহারই নাম হ্লাদিনী শক্তি। হ্লাদিনীর আবির্ভাব যে পর্য্যন্ত মানব-হৃদয়ে না হয়, সে পর্য্যন্ত মানব নিরতিশয় সত্য, নিরতিশয় সুন্দর ও নিরতিশয় মঙ্গলের অনুভব করিতে সমর্থ হয় না।

অভেদসিদ্ধান্ত

সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল যে এক বস্তু নহে, তিনটি বিভিন্ন বস্তু, বম্‌গার্টেনের এইরূপ সিদ্ধান্ত য়ুরোপে কিন্তু, বেশী দিন সমাদর পায় নাই। তাঁহারই সম-সাময়িক এবং অপেক্ষাকৃত নব্য কলাতত্ত্ববিদ্ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সুলজর (Sulzer) বম্‌গার্টেনের সহিত একমত হইতে না পারিয়া স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন—

"Only that can be considered beautiful which contains goodness, the aim of the whole life of humanity is welfare in social life. This is attained by the education of the moral feelings, to which end art should be subservient. Beauty is that which evokes and educates this feeling."

যাহা মঙ্গলকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকে, তাহাই কেবল সুন্দর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। সামাজিক যাহা হিতকর, তাহাই সমগ্র মানব-জীবনের লক্ষ্য, নৈতিক মনোবৃত্তির শিক্ষার দ্বারাই সেই সমাজহিতকর বস্তু লব্ধ হইয়া থাকে, সমগ্র কলাশাস্ত্রের প্রসারও ইহারই অধীন হওয়া উচিত। তাহাই প্রকৃত সৌন্দর্য্য—যাহা এইরূপ নৈতিক মনোবৃত্তিকে জাগাইয়া দেয় এবং শিক্ষিত করে।

সুলজর সুন্দর ও মঙ্গলকে বিভিন্ন বলিয়া মানিতে পারেন নাই—প্রত্যুত মঙ্গল যাহার মধ্যে প্রবিষ্ট নহে, তাহা সুন্দরই হইতে পারে না, এইরূপ মত প্রকাশ দ্বারা বম্‌গার্টেনের মত খণ্ডন করিয়াছেন। সুলজর সাহেবের পর মেণ্ডেলসন (Mendelssohn) আরও এক পদ অগ্রসর হইয়াছেন—

তিনি বলিয়াছেন—

"Art is the carrying forward of the beautiful, obscurely recognised by feeling, till it becomes the true and good. The aim of art is moral perfection."

সম্পূর্ণরূপে বিলক্ষণ, বাহ্যজগতে সেই সৌন্দর্য্যের এক কণাও সম্যক্‌ভাবে সমুপলব্ধ হইতে পারে না—ইহাই অগ্রে প্রতিপাদিত হইবে। তাহার পূর্ব্বে বাহ্য-সৌন্দর্য্যবাদী পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণের সৌন্দর্য্যতত্ত্ব এই প্রবন্ধে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইতেছে মাত্র।

(৮)

বিচার ও প্রয়োজন-নিরপেক্ষ সুখকরতা

পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণের মধ্যে ক্যাণ্ট এই সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। তিনি বলিয়াছেন—

"Man has a knowledge of nature outside him and of himself in nature. In nature, outside himself, he seeks for truth ; in himself he seeks for goodness. The first is an affair of pure reason, the other of practical reason (free-will). Besides these two means of perception, there is yet the judging capacity (Urteilskraft), which forms judgments without desire. This capacity is the basis of aesthetic feeling. Beauty in its subjective meaning is that which, in general and necessarily, without reasonings and without practical advantage pleases. In its objective meaning it is the form of a suitable object in so far as that object is perceived without any conception of its utility."

সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই—মানবেব অনুভূতি দুই প্রকারের হইয়া থাকে ;—প্রথম, তাহার নিজের বহিঃস্থিত প্রাকৃতপ্রপঞ্চের অনুভূতি ; দ্বিতীয়, প্রাকৃত-প্রপঞ্চে তাহার আত্মস্বরূপের অনুভূতি। বহিঃস্থিত প্রাকৃতপ্রপঞ্চে মানব, যাহা সত্য, তাহারই অনুসন্ধান করিয়া থাকে, নিজের আত্মার মধ্যে সে কিন্তু, যাহা কল্যাণময়, তাহারই অনুসন্ধান করে। প্রথম অর্থাৎ বহিঃস্থিত প্রাকৃতপ্রপঞ্চে এই সত্যানুসন্ধান বিশুদ্ধ বিচারশক্তির ব্যাপার বা পরিণতিবিশেষ, দ্বিতীয় অর্থাৎ অধ্যাত্মপ্রপঞ্চে কল্যাণময়ের যে

অনুসন্ধান, তাহা ব্যবহারিক বিচারশক্তির ব্যাপার বা পরিণতিবিশেষই হইয়া থাকে। দার্শনিকগণ ইহাই 'Freewill' বা অপরতন্ত্র অভিলাষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অনুভূতির এই দুই প্রকার সাধন হইতে পৃথক্ আরও একটি সাধন আছে, তাহার নাম Judging capacity অর্থাৎ বিচারশক্তি। এই বিচারশক্তি অধ্যবসায় বা নির্ণয়াত্মক জ্ঞানকে উৎপাদন করিয়া দেয়, অথচ ইহা যুক্তিতন্ত্রতার অপেক্ষা করে না এবং ইহা মাধুর্য্যময় মনোবৃত্তি উৎপাদন করে।

এই শক্তিই মানবের সকল ভাবানুগত মনোবৃত্তিনিচয়ের মৌলিক উপাদান বা প্রধান ভিত্তি। সৌন্দর্য্য অধ্যাত্মভাবে সেই বস্তুই হইয়া থাকে, যাহা যুক্তির অপেক্ষা রাখে না, ব্যবহারিক সুবিধার সহিতও যাহার কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু তাহা আনন্দের অনুভূতি করাইয়া দেয়। ব্যবহারিক দৃষ্টি অনুসারে আবার এই সৌন্দর্য্যই কোন আবশ্যক বস্তুর আকাররূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে; ব্যবহারিকভাবে সে বস্তু তাহার প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি ব্যতিরেকেই অনুভূতির বিষয় হইয়া থাকে।

সত্য শিব সুন্দরের ঐক্য

পাশ্চাত্ত্য সভ্যজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক মহামনা ক্যাণ্টের এইরূপ উক্তির দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়া থাকে যে, যাহা কল্যাণময়, তাহাই যে সত্য হইবে, এইরূপ কোন নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতের অধ্যাত্মদার্শনিকগণ কিন্তু, এইরূপ সিদ্ধান্তের উপর আস্থাবান্ হইতে পারেন নাই। তাঁহারা প্রত্যুত মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে, যাহা সত্য, তাহাই কল্যাণময় এবং তাহাই সুন্দর —"সত্যং শিবং সুন্দরম্।" ইহাই হইল তাঁহাদের প্রাণের কথা, তাঁহাদের মার্ম্মিক সিদ্ধান্ত। সুতরাং সত্য শিব ও সুন্দরের যাহা স্বরূপ-শক্তি সেই হ্লাদিনীর সন্ধান আমরা ক্যাণ্টের অনুসরণ দ্বারা পাইব, এই প্রকার আশা সুদূরপরাহত।

ক্যাণ্টের মতানুযায়ী অনেক দার্শনিক হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা নিজ নিজ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের সাহায্যে ক্যাণ্টের সৌন্দর্য্যবাদের পরস্পর-বিরুদ্ধ নানাপ্রকার ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। সেই ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার জন্য বিস্তৃত বিচারের অবতারণা পাঠকগণের রুচিকর হইবে না, এই কারণে এ প্রবন্ধে তাহা করা যাইতেছে না; কিন্তু ক্যাণ্টের মতানুসারী বলিয়া প্রথিত তিন জন দার্শনিকের এই বিষয়ে কিরূপ ধারণা,

তাহা আমাদের প্রকৃতের উপযোগিনী হইতে পারে, এই জন্য তাঁহাদের মতেরই যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই প্রসঙ্গে করিতে হইতেছে।

এই তিন জনের নাম Fichte (ফিক্‌টে), Schelling (শেলিঙ) ও Hegel (হেগেল)। ফিক্‌টে বলিয়াছেন—

"That perception of the beautiful proceeds from this; the world i.e. nature—has two sides; it is the sum of our limitations, and it is the sum of our idealistic activity. In the first aspect every object is limited, in the second aspect it is free. In the first aspect every object is limited, distorted, compressed, confined—and we see deformity; in the second we perceive its inner completeness, vitality, regeneration—and we see beauty. So that the deformity or beauty of an object depends on the point of view of the observer, beauty therefore exists not in the world, but in the beautiful soul."

সৌন্দর্য্য মনের আরোপিত ধর্ম্ম

ইহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই—সৌন্দর্য্যশালী পদার্থের প্রত্যক্ষ এই ভাবে হইয়া থাকে—এই যে বিশ্ব অথবা প্রাকৃত প্রপঞ্চ, ইহার দুইটি ভাগ আছে। এক ভাগে আমাদের যত প্রকার সসীমতা আছে, ইহা তাহারই সমষ্টি, অন্য ভাগে ইহা আমাদের সীমা-বিনির্ম্মুক্ত অধ্যাত্মপ্রসূত কার্য্যপ্রবণতা। প্রথম দিক্ দিয়া দেখিলে মনে হয়, এই প্রপঞ্চ সীমাবদ্ধ, দ্বিতীয় দিক্ দিয়া দেখিলে মনে হয়, ইহা সকল প্রকার সীমা হইতে বিনির্ম্মুক্ত অর্থাৎ প্রথম দৃষ্টির অনুসারে এই প্রাকৃত প্রপঞ্চের প্রত্যেক বস্তুই সীমাবদ্ধ, বিকৃত, সঙ্কুচিত ও আবদ্ধ, তাই আমরা ইহার প্রত্যেক বস্তুতেই অসুন্দরতা দেখিতে পাই। আবার অন্যদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই ইহার অন্তর্নিহিত সম্পূর্ণতা, সজীবতা ও পুনরুজ্জীবন, অর্থাৎ এই দিক দিয়াই আমরা সৌন্দর্য্যকে দেখিতে সমর্থ হই। সুতরাং কোন বস্তুর অসুন্দরতা বা সৌন্দর্য্য দ্রষ্টার দৃষ্টিগত প্রকারভেদের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, প্রপঞ্চের কোন বস্তুতেই সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে না, কিন্তু, এই সৌন্দর্য্য বাস্তবভাবে স্বতঃ সুন্দর আত্মাতেই বিদ্যমান আছে। এই মতের সহিত কিন্তু

পরমার্থ-রসতত্ত্ববিদ্ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ঐকমত্য হইবার সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ, এই মতে সৌন্দর্য্য বস্তুর স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম নহে, কিন্তু মানসিক অবস্থা অনুসারে প্রাকৃত প্রপঞ্চের উপর আরোপিত হইয়া থাকে; দ্রষ্টা যে আত্মা অর্থাৎ জীব, সেই আত্মসৌন্দর্য্য বাহিরের প্রপঞ্চের উপর চাপাইয়া তাহাকে সুন্দর বলিয়া বুঝিয়া থাকে। এইরূপ সৌন্দর্য্যবোধিনী শক্তি যে হ্লাদিনী শক্তি নহে, তাহা যথাসময়ে প্রতিপাদন করা যাইবে।

সসীমে অসীমবোধ

কলা-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য যে সৌন্দর্য্য, তাহার নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শেলিঙ কি বলিয়াছেন, তাহাই দেখা যাক :—

"Art is the production or result of that conception of things by which the subject becomes its own object, or the object becomes its own subject. Beauty is the perception of the infinite in the finite. And the chief characteristic of works of art is unconscious infinity. Art is the uniting of the subjective with the objective, of nature with reason, of the unconscious with the conscious, and therefore art is the highest means of knowledge. Beauty is the contemplation of things in themselves as they exist in the prototype. It is not the artist who by his knowledge or skill produces the beautiful, but the idea of beauty in him itself produces it."

কলাকুশলতা বস্তুনিচয়ের সেই প্রকার অনুভূতির পরিণতি বা ফল হইয়া থাকে, যাহার দ্বারা জ্ঞান বিষয় হইয়া যায় এবং সেইরূপ বিষয়ও জ্ঞানে পরিণত হইয়া পড়ে। সসীমের মধ্যে অসীমের অনুভূতিই হইতেছে সৌন্দর্য্য এবং কলাকৌশলপ্রসূত কার্য্যসমূহের প্রধান বিশিষ্টতাও এই যে, ইহা চেতনাবিহীন অসীমতা। বহির্জগতে অধ্যাত্ম-জগতের সহিত মিলন যাহা দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহাই art বা কলাকুশলতা। শুধু তাহাই নহে, ইহা জড়প্রপঞ্চকে বিচারশক্তির সহিত মিশাইয়া দেয়, অচেতনকে চেতন করিয়া তুলে, এই কারণে ইহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে যে, প্রকৃত কলাকুশলতাই অনুভূতির প্রধানতম উপকরণ। দৃশ্যমান বস্তুনিচয় নিজ স্বভাবকে পরিত্যাগ না করিয়া

নিজ মৌলিক উপাদানে যে ভাবে বিদ্যমান আছে, তাহার অনুধ্যানকেই সৌন্দর্য্য বলা যায়। কলাকুশল ব্যক্তি নিজের জ্ঞান বা নৈপুণ্যের দ্বারা সুন্দর বস্তুর সৃষ্টি করিয়া থাকে, ইহা নহে। কিন্তু কলাকুশল ব্যক্তির অন্তর্নিহিত যে সংস্কার বা ভাব, তাহাই সুন্দর বস্তুকে অভিব্যক্ত করিয়া দিয়া থাকে। শেলিঙ সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের যে প্রকার বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহার সহিত হ্লাদিনী-শক্তিবাদিগণের কোন কোন অংশে ঐকমত্য হইতে পারে। হ্লাদিনীর বিস্তৃত পরিচয়প্রসঙ্গে অগ্রে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

সৌন্দর্য্য অধ্যাত্ম বস্তু

সৌন্দর্য্যতত্ত্বসম্বন্ধে ভাবপ্রবণ বিখ্যাত দার্শনিক হেগেলের সিদ্ধান্ত এইরূপ—

"God manifests himself in nature and in art in the form of beauty. God expresses himself in two ways : in the object and in the subject, in nature and in spirit. Beauty is the shining of the Idea through matter. Only the soul and what pertains to it is truly beautiful ; and there the beauty of nature is only the reflection of the natural beauty of the spirit—the beautiful has only a spiritual content. But the spiritual must appear in the sensuous form, only as appearance, and this appearance is the reality of the beautiful. Art is thus the production of this appearance of the idea, and is a means, together with religion and philosophy, of bringing to consciousness and of expressing the deepest problems of humanity and the highest truth of the spirit."

"Truth aad beauty are one and the same thing ; the difference being only that truth is the idea itself, as it exists in itself, and is thinkable. The idea manifests itself, and is thinkable. The idea manifested externally becomes to the apprehension not only true but beautiful. The beautiful is the manifestation of the Idea."

হেগেলের এইরূপ উক্তির সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই :—শ্রীভগবান্ সৌন্দর্য্যের

আকারে প্রাকৃত প্রপঞ্চে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন এবং তিনিই সৌন্দর্য্যের আকারে কলাকৌশলেও আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বিষয় ও বিষয়ী এই দুইটি প্রকারে নিজ স্বরূপকে অভিব্যক্ত করিয়া থাকেন। বিষয় প্রাকৃত প্রপঞ্চ বা বহির্জগৎ হয় এবং বিষয়ী চিদাত্মাই হইয়া থাকে। প্রপঞ্চের মধ্য দিয়া Idea অর্থাৎ বিশ্বচৈতন্যের যে সমুজ্জ্বল প্রকাশ, তাহাই সৌন্দর্য্য, একমাত্র সেই চিদাত্মা এবং সেই চিদাত্মার যাহা স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব, তাহাই যথার্থ সুন্দর, সুতরাং প্রাকৃত প্রপঞ্চে যাহা কিছু সৌন্দর্য্য, তাহা সবই সেই চিদাত্মার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের প্রতিফলন বা প্রতিবিম্ব ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নহে। সুন্দর বস্তুর যাহা অন্তর্নিহিত তত্ত্ব, তাহা জড় নহে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে চিদাত্মারই স্বভাব। কিন্তু সেই চিন্ময় স্বভাবের ঐন্দ্রিয়িক আকারে অভিব্যক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক, সেই চিদাত্মার এইরূপে ঐন্দ্রিয়িক আকারে যে অভিব্যক্তি, তাহা কিন্তু আভাসমাত্র, এবং সেই আভাসমাত্রই প্রপঞ্চের সকল সুন্দর বস্তুর একমাত্র সত্তা বা অস্তিত্ব। কলাকুশলের সৃষ্টি বা Art এই কারণে সেই বিশ্ব-জনীন চিদাত্মার এই আভাসমাত্রের অভিব্যক্তি ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে, অথচ এই Art-ই ধর্ম্ম ও দর্শনের সহিত মিলিত-ভাবে যথাক্রমে এই বিশ্ব-জনীন চিদাত্মার আভাসকে মানবচৈতন্যের বিষয় করাইয়া দেয়, বিশ্ব-মানবের গভীরতম সমস্যাকে প্রকাশিত করিয়া থাকে এবং চিদাত্মার অন্তঃস্থিত পরমার্থ সত্যসমূহের অভিব্যঞ্জক হয়।

প্রপঞ্চে ব্যক্ত চিৎ সৌন্দর্য্য

সত্য এবং সৌন্দর্য্য এই উভয়ই এক ও অভিন্ন বস্তু, কেবল পার্থক্য এই যে, আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত সেই বিশ্বাত্মভূত চিদাত্মাই সত্য বলিয়া অভিহিত হয়েন এবং চিদাত্মরূপ সত্য ধ্যানগম্য, অন্য দিকে সেই চিদাত্মাই যখন আপনাকে প্রাকৃত প্রপঞ্চে অভিব্যক্ত করেন, মানব-বুদ্ধির বিষয়-ভাবকে প্রাপ্ত হয়েন, তখনই তিনি যে কেবল সত্য, তাহা নহে, তখন তিনি সুন্দরও হইয়া থাকেন। সুতরাং সেই বিশ্বজনীন চিদাত্মার বা শ্রীভগবানের অভিব্যক্ত স্বরূপই প্রকৃত সুন্দর।

হেগেল সৌন্দর্য্যতত্ত্ব-নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিতের পক্ষে নূতন বলিয়া প্রতীত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী ভক্ত

দার্শনিকগণ হ্লাদিনীতত্ত্ব-বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে এইরূপ সিদ্ধান্তের পরিপূর্ণতাসাধন করিয়া গিয়াছেন। পারমার্থিক-রসতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ভারতের ভক্তিবাদী মহর্ষিগণের প্রদর্শিত পন্থাকে অবলম্বন করিয়া এই সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণ করা একান্ত আবশ্যক।

প্রপঞ্চাতীত সৌন্দর্যের উৎস

অগণিত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যাহার অন্তর্নিবিষ্ট, সেই প্রাকৃতপ্রপঞ্চের মধ্যে সুন্দর বলিয়া, মনোহর বলিয়া, প্রিয় বলিয়া যাহা কিছু আমাদের নিকট প্রতীত হইয়া থাকে—বস্তুতঃ তাহাদের সেই সৌন্দর্য্য, সেই মনোহরতা ও সেই প্রিয়তা তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে, সৌন্দর্য্য, মনোহরতা ও প্রিয়তা একমাত্র শ্রীভগবানেরই স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম বা স্বভাব, ইহাই হইল ভারতীয় ভক্তিবাদের চরম সিদ্ধান্ত।

"গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপং একান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঈশ্বরস্য ॥"

জানি না, ব্রজের গোপীগণ কোন্ তপস্যা করিয়াছিল? যে রূপ লাবণ্যের সার, যাহার সদৃশ রূপ এ সংসারের কিছুতেই নাই—যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রূপও সম্ভবপর নহে, যে রূপ প্রতিদিনই নূতন হইয়া থাকে, সহস্র প্রযত্ন দ্বারা যাহা সিদ্ধ হয় না এবং যাহা স্বতঃসিদ্ধ, যে রূপ কান্তি, কীর্ত্তি ও ঐশ্বর্য্যের ঐকান্তিক আশ্রয়, শ্রীভগবানের সেই রূপকে তাহারা নয়ন সমূহের দ্বারা পান করিয়া থাকে।

সর্ব্বাত্মভূত শ্রীভগবানের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সম্রাট্ জনককে বলিয়াছিলেন—

"এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ এষোঽস্য পরম আনন্দঃ
এতস্যৈবানন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।"

এই শ্রীভগবানই জীবের পরম গতি, পরম সম্পৎ, ইনিই পরম আনন্দ, এই পরমানন্দের মাত্রাকেই অন্য সকল প্রাণী উপভোগ করিয়া থাকে।

হ্লাদিনী আনন্দাস্বাদিনী শক্তি

আনন্দ যাহার দ্বারা আস্বাদিত হয়, সেই শক্তির নাম হ্লাদিনী, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই আনন্দ বা সুখের স্বরূপ কি এবং তাহার আস্বাদন বা অনুভূতি কি প্রকারে হইয়া থাকে, এই বিষয়ে কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে বহু মতভেদ আছে। হ্লাদিনীকে জানিতে হইলে ঐ সকল মতভেদের আলোচনা আবশ্যক বলিয়া বোধ করি; তাই এক্ষণে সেই আলোচনাই সংক্ষিপ্তভাবে করিতেছি।

সুখের অনুভূতি জীবমাত্রেরই হইয়া থাকে, কিন্তু সেই সুখ বাহিরের বস্তু কি অন্তরের বস্তু, তাহার সন্ধান করিতে যাইয়া দার্শনিকগণ নানাপ্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। দেহই আত্মা, ইহা যাঁহাদের মত, সেই চার্ব্বাক দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন, সুখ দেহের ধর্ম্ম। অভিলষিত বস্তুর সহিত দেহের সম্বন্ধ হইলে এই দেহেই সুখ উৎপন্ন হয়; সুখ বেশীক্ষণ থাকে না, অনেক সময় ধরিয়া একটি সুখের অনুভব হয় না, ক্ষণিক সুখের ধারারই অনুভূতি হয়। এই মতে সুতরাং সুখ বাহ্য বস্তু। কারণ, সুখের আধার যে শরীর, তাহা ত সকলেরই দৃষ্টিগোচর হয় বলিয়া বাহ্য বস্তু ছাড়া আর কি হইতে পারে? কিন্তু বিশেষ এই যে, শরীর সকলের প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও ঐ শরীরের ধর্ম্ম যে সুখ, তাহা কিন্তু সেই শরীররূপ আত্মা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয় না; তাহা যে শরীরের ধর্ম্ম, সেই শরীররূপ আত্মারই তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ধর্ম্ম। শরীরের ধর্ম্ম রূপ ও গন্ধ প্রভৃতি গুণ অপরের প্রত্যক্ষগোচর হইলেও তাহার সুখ বা দুঃখ প্রভৃতি কয়েকটি গুণ তাহারই প্রত্যক্ষসিদ্ধ, অপরের প্রত্যক্ষগোচর হয় না।

ন্যায়মতে সুখ ক্ষণিক আত্মধর্ম্ম

দেহ আত্মা নহে, আত্মা দেহ হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্ বস্তু, ইহা নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক নামে প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণের মত। তাঁহাদের মতে সুখ দেহের ধর্ম্ম নহে, তাহা আত্মারই ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া সুখও আন্তর বস্তু। কারণ, আন্তর বস্তুর যে ধর্ম্ম, তাহা কখন বাহ্য হইতে পারে না। দেহে যে পাঁচটি বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, তাহাদের সহিত অভিলষিত শব্দ, স্পর্শ, রূপ,

রস ও গন্ধ প্রভৃতি বিষয়ের সম্বন্ধ হইলে আত্মাতে সুখ উৎপন্ন হয়, এবং তখন মন বলিয়া প্রসিদ্ধ আন্তর ইন্দ্রিয়ের সহিত সেই সুখের সম্বন্ধ হয়, তাহার পর আত্মাতে সেই সুখের যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকে মানস প্রত্যক্ষ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। যে আত্মাতে এই সুখ উৎপন্ন হয়, সেই সুখের মানস প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়, অপর আত্মার পক্ষে সেই সুখের এইরূপ মানস প্রত্যক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই; তাহা অপর আত্মার অনুমিতির বিষয় বা শাব্দবোধের বিষয় হইতে পারে। সর্ব্বব্যাপী আকাশে যেমন শব্দ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী আত্মাতে সুখ উৎপন্ন হয়, শব্দ যেমন যে ক্ষণে উৎপন্ন হয়, তাহার পরবর্ত্তী ক্ষণে থাকিয়া তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায়, সুখও তেমনই তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয়; শব্দ যেমন আকাশের সর্ব্বাংশে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু যে অংশে পটহ প্রভৃতির আঘাত হয়, সেই অংশেই উৎপন্ন হয়, সুখও সেইরূপ দেহের মধ্যে যে আত্মপ্রদেশ আছে, সেইখানেই উৎপন্ন হয়, দেহের বাহিরে যে আত্মপ্রদেশ আছে, সেইখানে উৎপন্ন হয় না। ইহাই হইল সুখের উৎপত্তি বিষয়ে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিকগণের মত। ইঁহাদের মতে সুখ আত্মার অনিত্যধর্ম্ম এবং তাহা ক্ষণস্থায়ী।

বেদান্ত মতে সুখ ও আত্মার অভেদ

বেদান্তদর্শনে কিন্তু নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণের সুখের অনিত্যত্ব এবং আত্মধর্ম্মত্ব-সিদ্ধান্ত উপেক্ষিত হইয়াছে। এই মতে সুখ উৎপন্ন হয় না, বিনষ্টও হয় না। ইহা আত্মার ধর্ম্ম নহে, অন্তঃকরণও ইহার আশ্রয় নহে। কিন্তু ইহাই আত্মা; সুতরাং আত্মা যেমন অবিনাশী ও নিত্যসিদ্ধ, সেইরূপ সুখও অবিনাশী ও নিত্যসিদ্ধ। এই সুখ ও আত্মার অভেদ-সিদ্ধান্ত স্বতঃপ্রমাণ উপনিষৎসমূহরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। আত্মতত্ত্ববিষয়ে উপনিষদ্‌ই যে একমাত্র প্রমাণ, অনুমান প্রভৃতি লৌকিক প্রমাণ সেই উপনিষৎপ্রমাণের সহকারী মাত্র, ইহাই হইল কি ভক্তিবাদী বা কি জ্ঞানবাদী সকল বৈদান্তিকের অভিমত সিদ্ধান্ত। যে সকল যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার অবতারণা এ প্রবন্ধে বিস্তারভয়ে করা যাইতেছে না, অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ তাহা বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ, অদ্বৈতসিদ্ধি ও চিৎসুখী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বেদান্তগ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। এ স্থলে কেবল আবশ্যক বোধে আত্মার সুখরূপতা-বোধক কয়েকটি উপনিষদ্-বাক্যের আলোচনা করা

যাইতেছে। বেদান্তদর্শনে আত্মা ও ব্রহ্ম যে একই বস্তু, ইহা কাহারও অবিদিত নহে। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক ব্রহ্মকেই আত্মা বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জীবাত্মার পৃথক্ সত্তা থাকিলেও পরমার্থ-দৃষ্টিতে জীবাত্মার কোন পৃথক্ সত্তা নাই, ইহাই হইল অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের সিদ্ধান্ত। পরমার্থরসবাদী বৈষ্ণব দার্শনিকগণ অদ্বৈতবাদীর এই সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করেন না, ইহা সত্য, কিন্তু তাঁহাদের মতেও জীবাত্মা আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহেন; সুতরাং ব্রহ্ম যদি আনন্দস্বরূপ হন, তবে জীবাত্মারও যে আনন্দ-স্বরূপতা আছে, ইহা তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই কারণে আত্মার অর্থাৎ কি ব্রহ্ম বা কি জীবের সুখরূপতা বিষয়ে সকল বৈদান্তিক যে ঐকমত্যযুক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মূল উপনিষদ্ বাক্য

সেই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মার স্বরূপ-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত উপনিষদ্ কি বলিয়া থাকে, এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লীতে এইরূপ পঠিত হইয়াছে—"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি" ইতি।

আনন্দই ব্রহ্ম, ইহা জানিবে। কারণ, আনন্দ হইতেই এই ভূতনিচয় উৎপন্ন হইয়াছে, ইহারা জন্মগ্রহণ করিয়া আনন্দের দ্বারাই জীবিত থাকে, আবার প্রয়াণকালেও ইহারা আনন্দের মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকে পঠিত হইয়াছে—

"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" ইতি।

যাহা ভূমা (মহান্ অর্থাৎ ব্রহ্ম), তাহাই সুখ, যাহা পরিচ্ছিন্ন বা অল্প, তাহাতে সুখ নাই, একমাত্র ভূমাই সুখ; সুতরাং ভূমাই বিজিজ্ঞাস্য।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে পঠিত হইয়াছে—

"এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।"

এই আত্মাই জীবের পরম আনন্দ, এই আত্মস্বরূপ আনন্দের অংশসমূহকে প্রাপ্ত হইয়াই এই সংসারে অন্য সকল প্রাণী বাঁচিয়া থাকে।

তবে সুখান্বেষণ কেন?

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, আত্মা যদি সুখস্বরূপই হয়, তাহা হইলে সুখ পাইবার জন্য লোক কেন এত ব্যাকুল হইয়া থাকে? আত্মা স্বপ্রকাশ, তাহার প্রকাশ বা অনুভূতি বেদান্তমতে ত সর্ব্বদাই রহিয়াছে, আত্মার প্রকাশ বা অনুভূতিই ত সুখের ভোগ। তাহাই যদি হইল, তবে এ সংসারে সকল মানবই সুখ পাইবার জন্য কেন এমন ছুটাছুটি করিয়া মরে? সুখ আমার নাই, তাহাকে পাইবার জন্য আমি যে সারাজীবন প্রাণপণে খাটিয়া বেড়াইতেছি—ইহাই ত সকল মানবের ধারণা। আরও এক কথা এই যে, যাহা নাই, তাহাকে পাইবার জন্যই মানুষের ইচ্ছা হয়; যাহা আছে, যাহা আমার স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব, তাহাকে পাইবার জন্য ত আমার ইচ্ছা হয় না; ইচ্ছা প্রাপ্তির উপায় হইয়া থাকে; কিন্তু প্রাপ্তি ত ইচ্ছার উপায় নহে, প্রত্যুত তাহা প্রাপ্তির দ্বারা নিরুদ্ধ হয়। যাহা নিত্যপ্রাপ্ত, তাহাকে পাইবার জন্য ইচ্ছা হইয়া থাকে, এ কথা উন্মত্তের মুখেই শোভা পায়। দার্শনিক হইয়া বেদান্তিগণ এরূপ সিদ্ধান্ত কিরূপে প্রচার করিতে সাহসী হন, তাহা ত বুঝা যায় না।

সুখের অভাব ভ্রান্তি

ইহার উত্তর দিতে যাইয়া হয় ত বেদান্তী বলিবেন, প্রাপ্ত বস্তুর প্রার্থনা বা ইচ্ছা না হইবে কেন? অনেক সময়ই এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহা আমার আছে, তাহাকেও পাইবার জন্য আমার প্রবল ইচ্ছার উদয় হইয়া থাকে। বাটী হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে টাকা, গহনা ও আবশ্যক দলিল প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ বাক্সটিতে চাবি লাগাইয়া যখন কোন কার্য্যের জন্য গমন করি, খানিক দূর যাইয়া যদি মনে হয়, বাক্সে চাবি দিয়া আসি নাই, তখন আবার গৃহাভিমুখে ব্যস্ত হইয়া দৌড়িয়া আসি। বাক্সে চাবি ত দেওয়াই হইয়াছে, তবে আবার দৌড়াদৌড়ি কেন? ইহা কি প্রাপ্ত বস্তুকে পাইবার জন্য যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তাহা নহে? তোমরা বলিবে, এ স্থলে প্রাপ্তি থাকিলেও ভ্রান্তিবশতঃ তাহা অপ্রাপ্তি হইয়াই দাঁড়াইয়াছে, তাই এই প্রকার প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুলতা হয়। তোমার এই কথা শুনিয়া হাসিয়া বেদান্তী বলিবেন, আমিও ত ইহাই বলিতেছি, আত্মা সুখস্বরূপ, সুতরাং সুখ আমাদের নিত্যপ্রাপ্ত হইলেও অজ্ঞানবশতঃ তাহা আমার নাই, এইরূপ বোধ যখনই

আমাদের হইয়া থাকে, তখনই আমরা সেই নিত্যপ্রাপ্ত সুখকে পাইবার জন্য অর্থাৎ নিত্যপ্রাপ্ত সুখের অপ্রাপ্তি-ভ্রান্তিকে মিটাইবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া বেড়াই, ইহাই ত সংসারের স্বভাব, এই অজ্ঞান-কল্পিত অশ্রান্ত ছুটাছুটির অশান্তিময় করাল গ্রাস হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্যই বেদান্তের সাহায্যগ্রহণ একান্ত আবশ্যক।

চৈতন্য স্বপ্রকাশ, আনন্দ অপ্রকাশ কেন ?

ইহা শুনিয়াই যে তার্কিক নিরস্ত হইবেন, তাহা নহে ; কারণ, বেদান্তীর এইরূপ যুক্তিতে তার্কিকের আশঙ্কা নিবৃত্ত হয় না। তার্কিক বলিবেন—নিত্যসুখবাদীর মতে আত্মাই ত সুখ, আত্মার অনুভূতিই ত বেদান্তীর মতে সুখের অনুভূতি। সুখ ও চৈতন্য যদি একই বস্তু হয়, তাহা হইলে চৈতন্যও যেমন স্বয়ংপ্রকাশ, সুখও সেইরূপ স্বয়ংপ্রকাশ, আর নিত্যসিদ্ধ সুখস্বরূপ আত্মা যখন সর্ব্বদাই আমাদিগের নিকট স্বয়ংপ্রকাশ হইয়াই রহিয়াছে, তখন আবার সুখে অপ্রাপ্তি-ভ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা কোথা হইতে আসিল ? এই কারণে সুখ নিত্য-সিদ্ধ ও আত্মস্বরূপ, এইরূপ অদ্বৈতবাদীর যে সিদ্ধান্ত, তাহার উপর আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না। অনিত্য সুখবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকগণের এই প্রকার যুক্তি আপাততঃ সুন্দর বলিয়া বোধ হইলেও ইহার মূলে কোন সার নাই, অজ্ঞান বা অবিদ্যার কার্য্যপদ্ধতির স্বরূপ না জানা নিবন্ধনই দ্বৈতবাদিগণ এইরূপ অসার যুক্তির অবতারণা করিতে সাহসী হইয়া থাকেন। তাঁহাদের যুক্তি যে বিচারসহ নহে, তাহা বুঝাইবার জন্য আত্মস্বরূপ নিত্য-সুখবাদী বেদান্তিগণ যাহা বলিয়া থাকেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সারাংশ লিখা যাইতেছে।

আবরণ ও বিক্ষেপ সর্ব্বাংশে নহে

বেদান্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, অজ্ঞান বশতঃ আমরা আত্মার সুখরূপতার আস্বাদন করিতে সমর্থ হই না, এই প্রকার বেদান্তীর সিদ্ধান্তে কোন দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না।

বেদান্তমতে আত্মা আনন্দ, সৎ ও চৈতন্যস্বরূপ হইলেও, অজ্ঞান বা অবিদ্যা তাহার সৎ ও আনন্দস্বরূপকেই আবৃত করিয়া থাকে এবং সেই আনন্দ ও সৎস্বরূপের আবরণ করে বলিয়া তাহাতে দুঃখ ও অসত্যরূপতাকে সৃষ্টি করিয়া থাকে। এইরূপ আবরণ ও অন্যথারূপের সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য, অবিদ্যা বা

ভ্রান্তিজ্ঞানের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, ইহা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। আমরা সকলেই দেখিয়া থাকি, যখন আমরা শুক্তিতে রজত-ব্যবহার করি, তখন শুক্তির স্বরূপ আমাদের নিকট আবৃত হয়, অর্থাৎ শুক্তি নাই, শুক্তি প্রকাশ পাইতেছে না—এই প্রকার ব্যবহার আমরা করিয়া থাকি, এই প্রকার ব্যবহারের অনুকূল যে শক্তি অজ্ঞানে বিদ্যমান আছে, তাহাকেই আবরণশক্তি বলা যায়। এইরূপ শুক্তিস্বরূপ আবৃত হইলে শুক্তির যাহা স্বরূপ নহে, সেই রজত শুক্তির উপর আরোপিত হয়, অর্থাৎ আমরা এখানে রজত আছে বা রজত আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে, এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি, এইরূপ ব্যবহারের অনুকূল যে শক্তি অবিদ্যাতে বিদ্যমান আছে, তাহাকেই বিক্ষেপশক্তি বলা যায়। অজ্ঞান যে বস্তুকে আবৃত করিয়া থাকে, তাহার সর্ব্বাংশকেই যে ইহা আবৃত করিবে, এইরূপ দেখা যায় না, কোন অংশ অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয়, আবার কোন অংশ তাহা দ্বারা আবৃত হয় না, এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। শুক্তির শুক্তিত্বরূপ ধর্ম্ম অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয়, কিন্তু তাহার ইদংত্ব বা চাকচিক্য প্রভৃতি অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয় না, সেইরূপ আত্মার সুখরূপতা, অবিনাশিত্ব অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হইলেও তাহার চিদ্রূপতা বা চৈতন্য অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয় না, ঐ অজ্ঞান সুখস্বরূপকে আবৃত করিয়া বিক্ষেপশক্তির প্রভাবে দুঃখের আরোপ করে এবং অবিনাশিত্ব বা সদ্রূপতাকে আবৃত করিয়া তাহার উপর বিনাশিত্ব বা মৃত্যুর আরোপ করিয়া থাকে, তাই আমরা আমাদিগকে সময়ে সময়ে দুঃখী ও মরণধর্ম্মী বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি। এই অজ্ঞান আত্মার আনন্দরূপতা বা সদ্রূপতার আবরণ করিতে সমর্থ, কিন্তু তাহার প্রকাশরূপতাকে আবরণ করিতে সমর্থ হয় না। তাহার কারণ এই যে, প্রকাশের স্বভাবই এই যে, তাহা আবৃত হয় না, প্রত্যুত যে বস্তু তাহাকে আবৃত করিতে উদ্যত হয়, সেই বস্তুও সেই প্রকাশের দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া থাকে। মেঘ আমাদিগের দৃষ্টিতে প্রকাশময় সূর্য্যকে আবৃত করে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সূর্য্যকে আবরণ করিতে উদ্যত মেঘই সূর্য্যপ্রকাশের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে, ইহা আমরা সকলেই অনুভব করিয়া থাকি। সেইরূপ প্রকৃত স্থলে আত্মপ্রকাশ অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয় না, অথচ সেই অজ্ঞানই আত্মপ্রকাশের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া 'আমি কিছু বুঝি না', 'আমি অজ্ঞ', এইরূপ ব্যবহারের গোচর হইয়া থাকে। সুতরাং সুখ নিত্য-সিদ্ধ ও আত্মস্বরূপ হইলেও আত্মার প্রকাশরূপতা অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয় না অথচ আত্মার

আনন্দরূপতা অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে এবং যখনই অজ্ঞান দ্বারা সেই আনন্দরূপতা আবৃত হয়, তখনই আমাদের সুখকে লাভ করিবার জন্য ইচ্ছার উদয় হইয়া থাকে, সুতরাং সুখ নিত্য-সিদ্ধ আত্মার স্বরূপ হইলে তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রাণিগণের হইতে পারে না, এইরূপ অনিত্য সুখবাদী দার্শনিকগণের বেদান্তসিদ্ধান্তের প্রতি যে দোষারোপ, তাহা নিতান্ত নির্যুক্তিক ও বিচারাসহ।

এই নিত্য-সিদ্ধ সুখস্বরূপ আত্মার সুখাস্বাদনের জন্য যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা, তাহা অদ্বৈতবাদী বেদান্তিগণের মতানুসারে মায়িক প্রপঞ্চের অন্তর্গত; সুতরাং তাহা জ্ঞানিগণের একান্ত উপেক্ষণীয়। এ বিষয়ে হ্লাদিনী-শক্তিবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের কি সিদ্ধান্ত, তাহার অবতারণা যথাস্থানে করা যাইবে। এইক্ষণে সেই নিত্য-সিদ্ধ সুখের সাংসারিক আস্বাদন বেদান্তসিদ্ধান্ত অনুসারে কি প্রকারে হইয়া থাকে, তাহারই আলোচনা করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে, তাই তাহারই অবতারণা অগ্রে করা যাইতেছে।

(১০)

আত্মার সুখাংশ আবৃত

সুখ নিত্যসিদ্ধ ও আত্মস্বরূপ হইলেও তাহার অভিব্যক্তি সর্ব্বদা হয় না। কারণ, তাহা অবিদ্যা দ্বারা আবৃত থাকে, সেই অবিদ্যার আবরণ যে অন্তঃকরণ-বৃত্তি দ্বারা অপসারিত হয়, তাহাই এ সংসারে সুখ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ অন্তঃকরণবৃত্তি সকল সময়ে থাকে না, শুভাদৃষ্টবিশেষ দ্বারা অভিলষিত ভোগ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ হইলে, সুখের অভিব্যঞ্জক বা আবরণনিবর্ত্তক অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষ উৎপন্ন হইলে, আমরা মনে করি, সুখ উৎপন্ন হইল এবং ঐ প্রকার বৃত্তিবিশেষ বিনষ্ট হইলে আমরা মনে করি, সুখ বিনষ্ট হইল। বাস্তবপক্ষে সুখ উৎপন্নও হয় না বা বিনষ্টও হয় না, ইহাই হইল বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত। অনাদিকাল হইতেই আত্মার এই সুখাংশে এইরূপ অবিদ্যার আবরণ বিদ্যমান আছে এবং যত দিন সেই আবরণ একবারে বিধ্বস্ত না হইবে, তত দিন আমাদের এই আবরণ ধ্বংস করিয়া আত্মস্বরূপ সুখের অভিব্যক্তির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রযত্ন হইতেই থাকিবে; সুতরাং সুখকে নিত্য ও আত্মস্বরূপ বলিয়া অঙ্গীকার করিলে সুখের জন্য আকাঙ্ক্ষা

ভ্রান্তিজ্ঞানের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, ইহা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। আমরা সকলেই দেখিয়া থাকি, যখন আমরা শুক্তিতে রজত-ব্যবহার করি, তখন শুক্তির স্বরূপ আমাদের নিকট আবৃত হয়, অর্থাৎ শুক্তি নাই, শুক্তি প্রকাশ পাইতেছে না—এই প্রকার ব্যবহার আমরা করিয়া থাকি, এই প্রকার ব্যবহারের অনুকূল যে শক্তি অজ্ঞানে বিদ্যমান আছে, তাহাকেই আবরণশক্তি বলা যায়। এইরূপ শুক্তিস্বরূপ আবৃত হইলে শুক্তির যাহা স্বরূপ নহে, সেই রজত শুক্তির উপর আরোপিত হয়, অর্থাৎ আমরা এখানে রজত আছে বা রজত আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে, এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি, এইরূপ ব্যবহারের অনুকূল যে শক্তি অবিদ্যাতে বিদ্যমান আছে, তাহাকেই বিক্ষেপশক্তি বলা যায়। অজ্ঞান যে বস্তুকে আবৃত করিয়া থাকে, তাহার সর্ব্বাংশকেই যে ইহা আবৃত করিবে, এইরূপ দেখা যায় না, কোন অংশ অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয়, আবার কোন অংশ তাহা দ্বারা আবৃত হয় না, এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। শুক্তির শুক্তিত্বরূপ ধর্ম্ম অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয়, কিন্তু তাহার ইদংত্ব বা চাকচিক্য প্রভৃতি অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয় না, সেইরূপ আত্মার সুখরূপতা, অবিনাশিত্ব অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হইলেও তাহার চিদ্রূপতা বা চৈতন্য অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয় না, ঐ অজ্ঞান সুখস্বরূপকে আবৃত করিয়া বিক্ষেপশক্তির প্রভাবে দুঃখের আরোপ করে এবং অবিনাশিত্ব বা সদ্রূপতাকে আবৃত করিয়া তাহার উপর বিনাশিত্ব বা মৃত্যুর আরোপ করিয়া থাকে, তাই আমরা আমাদিগকে সময়ে সময়ে দুঃখী ও মরণধর্ম্মী বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি। এই অজ্ঞান আত্মার আনন্দরূপতা বা সদ্রূপতার আবরণ করিতে সমর্থ, কিন্তু তাহার প্রকাশরূপতাকে আবরণ করিতে সমর্থ হয় না। তাহার কারণ এই যে, প্রকাশের স্বভাবই এই যে, তাহা আবৃত হয় না, প্রত্যুত যে বস্তু তাহাকে আবৃত করিতে উদ্যত হয়, সেই বস্তুও সেই প্রকাশের দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া থাকে। মেঘ আমাদিগের দৃষ্টিতে প্রকাশময় সূর্য্যকে আবৃত করে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সূর্য্যকে আবরণ করিতে উদ্যত মেঘই সূর্য্যপ্রকাশের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে, ইহা আমরা সকলেই অনুভব করিয়া থাকি। সেইরূপ প্রকৃত স্থলে আত্মপ্রকাশ অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয় না, অথচ সেই অজ্ঞানই আত্মপ্রকাশের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া 'আমি কিছু বুঝি না', 'আমি অজ্ঞ', এইরূপ ব্যবহারের গোচর হইয়া থাকে। সুতরাং সুখ নিত্য-সিদ্ধ ও আত্মস্বরূপ হইলেও আত্মার প্রকাশরূপতা অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয় না অথচ আত্মার

আনন্দরূপতা অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে এবং যখনই অজ্ঞান দ্বারা সেই আনন্দরূপতা আবৃত হয়, তখনই আমাদের সুখকে লাভ করিবার জন্য ইচ্ছার উদয় হইয়া থাকে, সুতরাং সুখ নিত্য-সিদ্ধ আত্মার স্বরূপ হইলে তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রাণিগণের হইতে পারে না, এইরূপ অনিত্য সুখবাদী দার্শনিকগণের বেদান্তসিদ্ধান্তের প্রতি যে দোষারোপ, তাহা নিতান্ত নির্যুক্তিক ও বিচারাসহ।

এই নিত্য-সিদ্ধ সুখস্বরূপ আত্মার সুখাস্বাদনের জন্য যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা, তাহা অদ্বৈতবাদী বেদান্তিগণের মতানুসারে মায়িক প্রপঞ্চের অন্তর্গত; সুতরাং তাহা জ্ঞানিগণের একান্ত উপেক্ষণীয়। এ বিষয়ে হ্লাদিনী-শক্তিবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের কি সিদ্ধান্ত, তাহার অবতারণা যথাস্থানে করা যাইবে। এইক্ষণে সেই নিত্য-সিদ্ধ সুখের সাংসারিক আস্বাদন বেদান্তসিদ্ধান্ত অনুসারে কি প্রকারে হইয়া থাকে, তাহারই আলোচনা করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে, তাই তাহারই অবতারণা অগ্রে করা যাইতেছে।

(১০)

আত্মার সুখাংশ আবৃত

সুখ নিত্যসিদ্ধ ও আত্মস্বরূপ হইলেও তাহার অভিব্যক্তি সর্ব্বদা হয় না। কারণ, তাহা অবিদ্যা দ্বারা আবৃত থাকে, সেই অবিদ্যার আবরণ যে অন্তঃকরণ-বৃত্তি দ্বারা অপসারিত হয়, তাহাই এ সংসারে সুখ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ অন্তঃকরণবৃত্তি সকল সময়ে থাকে না, শুভাদৃষ্টবিশেষ দ্বারা অভিলষিত ভোগ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ হইলে, সুখের অভিব্যঞ্জক বা আবরণনিবর্ত্তক অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষ উৎপন্ন হইলে, আমরা মনে করি, সুখ উৎপন্ন হইল এবং ঐ প্রকার বৃত্তিবিশেষ বিনষ্ট হইলে আমরা মনে করি, সুখ বিনষ্ট হইল। বাস্তবপক্ষে সুখ উৎপন্নও হয় না বা বিনষ্টও হয় না, ইহাই হইল বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত। অনাদিকাল হইতেই আত্মার এই সুখাংশে এইরূপ অবিদ্যার আবরণ বিদ্যমান আছে এবং যত দিন সেই আবরণ একবারে বিধ্বস্ত না হইবে, তত দিন আমাদের এই আবরণ ধ্বংস করিয়া আত্মস্বরূপ সুখের অভিব্যক্তির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রযত্ন হইতেই থাকিবে; সুতরাং সুখকে নিত্য ও আত্মস্বরূপ বলিয়া অঙ্গীকার করিলে সুখের জন্য আকাঙ্ক্ষা

থাকে, ইহাই যদি যাজ্ঞবল্ক্যের অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে তিনি কখনই বলিতে পারিতেন না যে—

"ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে"—দ্রষ্টার দৃষ্টির বিলোপ হইতে পারে না।

একমাত্র দৃষ্টিই যদি বাস্তব হইত, তবে দৃষ্টির বিপরিলোপ হয় না, ইহা বলাই উচিত ছিল। দ্রষ্টার দৃষ্টির বিপরিলোপ হয় না, এইরূপ বলা কখনই সে পক্ষে সঙ্গত হইত না। এইরূপ উক্তি দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, দৃষ্টি অর্থাৎ জ্ঞান যেমন নিত্য, দ্রষ্টা বা জ্ঞাতাও সেইরূপ নিত্য। শুধু কি তাহাই, দৃশ্যও সেইরূপ দ্রষ্টা ও দৃষ্টির ন্যায় সেই অবস্থায় বিলুপ্ত হয় না; কিন্তু তাহা সংসার-দশাতে যেমন বিভক্তভাবে প্রতীত হইয়া থাকে, মোক্ষদশাতে তেমন বিভক্তভাবে থাকে না বা প্রতীত হয় না বলিয়া তাহা নাই বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, এইমাত্র। ইহাই বিস্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

"ন তু দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যৎ প্রবিভক্তং যৎ পশ্যেৎ।"

অন্য কোন বস্তুই তাহা হইতে প্রবিভক্ত থাকে না, সুতরাং দ্বিতীয় কোথায় —যাহাকে সে দেখিবে?

ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত

এই বাক্যে দ্বিতীয় বস্তু নাই, ইহা বলা হইতেছে না; কিন্তু প্রবিভক্ত দ্বিতীয় নাই, ইহাই বলা হইতেছে। যদি ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য হইত, তাহা হইলে "ততোঽন্যৎ প্রবিভক্তং" এইপ্রকার উক্তি নিরর্থক হইত; সুতরাং ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কোন বস্তুই মোক্ষ-দশাতে বিদ্যমান থাকিতে পারে না, এইরূপ অদ্বৈতবাদীর যে সিদ্ধান্ত, তাহা বৃহদারণ্যক শ্রুতি দ্বারা সমর্থিত হইতেছে না; কিন্তু ব্রহ্মই এক হইয়াও অনেক ভাবে বিদ্যমান, এইরূপ যে ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত, তাহাই শ্রুতিনিবহের দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধভাবে সমর্থিত হইয়া থাকে। পরমাত্মা একও বটেন, অনেকও বটেন, তিনি জ্ঞানস্বরূপ অথচ তিনি জ্ঞাতা; তিনি সরূপ, তিনি নীরূপ; তিনি সগুণ, তিনি নির্গুণ; তিনি দ্রষ্টা এবং তিনি দৃশ্য—ইহাই হইল ভক্তিবাদী দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তই শ্রুতিসমর্থিত এবং শ্রুতিতাৎপর্য্যবিদ্ শ্রীবেদব্যাস প্রভৃতি বিশ্ববরেণ্য মহর্ষিগণের অনুমোদিত, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

ব্রহ্মের দ্বিবিধ রূপ

ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণয়ে উপনিষদ্ কি বলিতেছেন, তাহা দেখা যাউক—

"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চৈবামূর্ত্তং চ মর্ত্ত্যং চামৃতং চ" (বৃহদারণ্যক)

ব্রহ্মের দুই-ই রূপ ;—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। তিনি মর্ত্ত্য অথচ তিনিই অমৃত।

"স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়োঽতেজোময়ঃ কামময়োঽকামময়ঃ ক্রোধময়োঽক্রোধময়ো ধর্ম্মময়োঽধর্ম্মময়ঃ সর্ব্বময়ঃ।" (বৃহদারণ্যক)

সেই এই আত্মাই ব্রহ্ম, এই আত্মাই বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ময়, শ্রোত্রময়, পৃথিবীময়, এই আত্মাই কামময় অথচ অকামময়, ইহাই ক্রোধময় অথচ অক্রোধময়, ইহাই ধর্ম্মময় অথচ অধর্ম্মময়, এই আত্মাই সর্ব্বময়।

অণু ও মহান্

"এষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বা, এষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ান্ অন্তরিক্ষাজ্ জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ান্ এভ্যো লোকেভ্যঃ।

সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যানাদর এষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয় এতদ্‌ব্রহ্ম এতমিতঃ প্রেত্য অভিসংভবিতাস্মি"। (ছান্দোগ্যোপনিষৎ)

এই আমার আত্মা হৃদয়মধ্যে রহিয়াছেন। ইনি ব্রীহি, যব, সর্ষপ, শ্যামাক বা শ্যামাকতণ্ডুল হইতেও ক্ষুদ্র। এই আমার আত্মা হৃদয়মধ্যে রহিয়াছেন, ইনি পৃথিবী হইতে বড়, অন্তরিক্ষ হইতে বড়, দ্যুলোক হইতেও বড়, ইনি সকল লোক হইতেও বড়। সকল কর্ম্মই ইঁহার—ইনি সর্ব্বকাম, ইনি সর্ব্বগন্ধ, ইনিই সর্ব্বরস, সকল বস্তুকেই ইনি ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, ইনি কোন কথাই বলেন না, কাহাকেও আদর করেন না, ইনিই ব্রহ্ম, আমার হৃদয়মধ্যে রহিয়াছেন। • এই সংসার ছাড়িয়া আমি ইঁহাতেই আবার মিলিত হইব।

বিপরীত ধর্ম্মের আধার

শ্বেতাশ্বতরীয় উপনিষদেও এইরূপই পরমাত্মতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—

"য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥"

যাঁহার কোন বর্ণ নাই, যিনি নিজ শক্তিবলে অনেক বর্ণ ধারণ করিয়া থাকেন, যাঁহার উদ্দেশ্য অতি দুর্জ্ঞেয়, অন্তকালে যিনি এই বিশ্বকে আত্মস্বরূপে বিলীন করেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনিই একমাত্র ছিলেন।

"তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রস্তদ্‌ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥"

তিনিই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্রমা, তিনিই শুক্র, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই জল, আবার তিনিই প্রজাপতি।

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥
নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্‌ ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা॥"

তুমি স্ত্রী, তুমিই পুরুষ হও, তুমি কুমার, তুমিই কুমারী, আবার তুমি বৃদ্ধ হইয়া দণ্ডের সাহায্যে বিচরণ করিয়া থাক। তুমি নীলবর্ণ, তুমি সূর্য্য, তুমিই হরিদ্বর্ণ, তোমার নয়ন লোহিতবর্ণ, তোমার গর্ভেই তড়িৎ বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমিই ষড়্‌ঋতু, তুমিই সকল সমুদ্র, তোমার আদি নাই, নিজ বৈভবেই তুমি সর্ব্বদা বিরাজমান রহিয়াছ, তোমা হইতেই সকল ভুবন সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।

সগুণ ও নির্গুণ

"গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্ম্মকর্ত্তা
কৃতস্য তস্যৈব ন চোপভোক্তা।
স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা
প্রাণাধিপঃ সংচরতি স্বকর্ম্মভিঃ॥"

যিনি গুণান্বিত হইয়া ফল ও কর্ম্ম নির্ম্মাণ করেন অথচ সেই স্বকৃত কর্ম্মের ফলের যিনি উপভোক্তা নহেন, সকল রূপই তাঁহার, তিনিই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়, কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি তাঁহাকেই পাইবার সাধন, তিনিই প্রাণের নিয়ন্তা, আবার তিনিই নিজ কর্ম্মসমূহের দ্বারা সংসারে বিহার করিয়া থাকেন।

"নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্‌যৎ শরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে॥"

তিনি স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক নহেন। যে যে শরীর তিনি আদান করেন, সেই সেই শরীরের সহিত তিনি সংযুক্ত হইয়া থাকেন।

অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ

এইরূপ শত শত শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইতে পারে, বিস্তারভয়ে তাহা এখানে আর দেখান যাইতেছে না। এই সকল উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য হইতে ইহাই স্পষ্টতঃ প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যার আধারস্বরূপ শ্রুতি-সমূহ কেবল অদ্বৈততত্ত্বেরই সংস্থাপনার্থ সমুদ্ভূত হয় নাই ; কিন্তু পারমার্থিক দ্বৈতাদ্বৈত বা অচিন্ত্যভেদাভেদই উপনিষৎ-সমূহের মুখ্য প্রতিপাদ্য। এই ভেদাভেদ সিদ্ধান্তই যে উপনিষৎপ্রতিপাদ্য, তাহাতে সন্দেহ করিবার অণুমাত্রও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। উপনিষৎ-সমূহের তাৎপর্য্য-বিবরণের জন্যই পুরাণ, স্মৃতি ও ইতিহাস-সমূহ মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। ইহা আস্তিক হিন্দুমাত্রই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। সেই সকল শাস্ত্রও বিস্পষ্টভাবেই এই ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া থাকে, তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে দেখিতে পাওয়া যায়—

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥"

তুমি আদিদেব, তুমিই পুরাণ পুরুষ, এই বিশ্বের তুমিই একমাত্র আধার, তুমি জ্ঞাতা, তুমি জ্ঞেয় এবং তুমিই পরম ধাম অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ। হে অনন্তরূপ, তুমিই এই বিশ্বকে ব্যাপিয়া রহিয়াছ।

দিব্যদৃষ্টিতে ত্রিতয়জ্ঞান

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করিয়াছিলেন—নিজের যথার্থ স্বরূপ কি, তাহাই দেখাইবার জন্য। সেই দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে শ্রীভগবানের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া অর্জ্জুন ভক্তিভরে তাঁহারই স্বরূপবর্ণনাত্মক স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে বলিতেছেন—তুমিই জ্ঞাতা, তুমিই জ্ঞেয়, আবার তুমিই জ্ঞান। ইহা দ্বারা ইহাই ত স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ভগবান্ কেবল নির্ব্বিশেষ জ্ঞানমাত্রই নহেন, তিনি

জ্ঞানও বটেন, জ্ঞাতাও বটেন এবং জ্ঞেয়ও বটেন। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা পরস্পর পৃথক্‌ই হইয়া থাকে, ব্যবহারিক দৃষ্টির সাহায্যে ইহাই আমাদের সকলের সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে, কিন্তু দিব্য বা পারমার্থিক দৃষ্টির সাহায্যে অর্জ্জুন যে পরমার্থ-তত্ত্বের উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা কিন্তু ত্রিতয়াত্মক অর্থাৎ জ্ঞানও বটে, জ্ঞাতাও বটে, আবার তাহাই জ্ঞেয়ও বটে। তাহা যে নিগু'ণমাত্রই, তাহাও নহে। কারণ, অর্জ্জুনের দৃষ্টিতে তাহা অনন্তরূপ। এই অনন্তরূপবিশিষ্ট বস্তুই জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা হইতে পৃথক্ নহে। এইরূপ পরমাত্মতত্ত্বই অর্জ্জুনের পারমার্থিক বা দিব্যদৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াছিল। ইহাই যদি গীতার পরমাত্মতত্ত্ববিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে কেমন করিয়া বলিব জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-ভাববর্জ্জিত একমাত্র অদ্বৈতজ্ঞান-তত্ত্বই উপনিষৎ-সমূহের সিদ্ধান্ত? উপনিষদের সার সিদ্ধান্তই গীতাতে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এ কথা ত অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়া থাকেন। সুতরাং নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতসিদ্ধান্ত যে গীতার একমাত্র সিদ্ধান্ত, ইহা কোন বিবেচক ব্যক্তিই অঙ্গীকার করিতে পারেন না, প্রত্যুত একের অনেকাত্মতা বা অনেকের একাত্মতারূপ যে ভেদাভেদসিদ্ধান্ত, তাহাই উপনিষৎসমূহের বাস্তব সিদ্ধান্ত এবং ভগবদ্‌গীতাও সেই সিদ্ধান্তকেই বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য বিরচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন হেতুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। কেবল গীতাই নহে, মহর্ষি বেদব্যাস-রচিত সকল পুরাণই এই ভেদাভেদ-তত্ত্ব নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রতিপাদন করিয়া থাকে, তাহাই অগ্রে প্রতিপাদন করা যাইতেছে।

(১১)

পুরাণে বেদপ্রতিষ্ঠা

শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে ভালভাবে পুরাণ শাস্ত্রকেই অবলম্বন করিতে হয়, ইহাই আস্তিক-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। জড়, জীব ও পরমেশ্বর এই ত্রিবিধ বস্তুর মধ্যে অচিন্ত্যভেদাভেদই যে শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ, তাহা অতি স্পষ্টভাবেই পুরাণশাস্ত্র প্রতিপাদন করিয়া থাকে; এই প্রসঙ্গে তাহাই দেখান হইতেছে।

স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে লিখিত হইয়াছে—

"বেদবন্নিশ্চলং মন্যে পুরাণার্থং দ্বিজোত্তমাঃ।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি।
ইতিহাসপুরাণৈস্তু নিশ্চলোঽয়ং কৃতঃ পুরা॥
যন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ।
উভয়োর্যন্ন দৃষ্টং হি তৎ পুরাণৈঃ প্রমীয়তে॥"

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি বেদের ন্যায় পুরাণের অর্থকে প্রামাণিক বলিয়া মানিয়া থাকি। সকল বেদই পুরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। অল্পবিদ্য লোক হইতে 'এ ব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবে' এই ভাবিয়া বেদ ভীত হইয়া থাকে, ইতিহাস ও পুরাণসমূহের দ্বারা বেদের প্রামাণ্য দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে, বেদসমূহে যাহা স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হয় না, তাহা স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। বেদে ও স্মৃতিতে যাহা স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হয় নাই, তাহা সকলই পুরাণসমূহের দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥"

হে বরাননে! আমি পুরাণার্থকে বেদার্থ হইতেও অধিক বলিয়া মানিয়া থাকি, সকল বেদ পুরাণের উপরই প্রতিষ্ঠিত আছে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা যখন স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় না, তখন পুরাণের সাহায্যই সর্ব্বাগ্রে অবলম্বনীয়। ইহাই হইল অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত শিষ্ট-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। নব নব উদ্ভাবিত যুক্তি দ্বারা সন্দিগ্ধার্থ—বেদের তাৎপর্য্য নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত কি দ্বৈতবাদী বা কি অদ্বৈতবাদী আচার্যগণ পরস্পর-বিরুদ্ধ নানা মতের দ্বারা বেদের প্রকৃত অর্থবিষয়ে বহু স্থলেই শিষ্টজনগণের বুদ্ধিকে আকুল করিয়া তুলিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব-প্রবর্ত্তিত ঐকান্তিক ভক্ত-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ কিন্তু শ্রীভগবত্তত্ত্ববিষয়ে প্রমাণস্বরূপ বেদবচন-সমূহের তাৎপর্য্য কি, তাহার নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া পুরাণশাস্ত্রেরই সাহায্য প্রধানভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই হইল

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। এই বিষয়ে অধিক অনুসন্ধানে যাঁহার প্রবৃত্তি আছে, তিনি শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর ভাগবত-সন্দর্ভ-নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের তত্ত্বসন্দর্ভাংশের পর্য্যালোচনা করিবেন।

পুরাণে তত্ত্বনির্ণয়

শ্রীভগবানের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই যে পুরাণশাস্ত্রানুমোদিত, সে বিষয়ে কোন বিবেচক ব্যক্তির মতদ্বৈধ হইতে পারে না, তাহাই এক্ষণে দেখান যাইতেছে।

পরমেশ্বর সগুণ কি নির্গুণ? সগুণ হইলে নির্গুণ শ্রুতির প্রামাণ্য থাকে না, আবার নির্গুণ হইলে সগুণ শ্রুতি বাধিত হয়, এই প্রকার সংশয় নিরাকরণের জন্য প্রবৃত্ত হইয়া দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ নির্গুণ শ্রুতি-সমূহের পারমার্থিক প্রামাণ্য খণ্ডন করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। অন্য দিকে অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ সগুণ শ্রুতি-সমূহের প্রামাণ্য খণ্ডন করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই; কিন্তু এ বিষয়ে পুরাণশাস্ত্র অতি স্পষ্টভাবে কিরূপ সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছে, তাহার প্রতি দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী কোন আচার্য্যই আস্থা স্থাপন করেন নাই।

শক্তি অনির্ব্বচনীয় গুণ

বিষ্ণুপুরাণে এই সংশয়ের নিরাকরণার্থ কি উক্ত হইয়াছে, তাহা দেখা যাউক।

"নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ।
কথং সর্গাদিকর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে ॥"

মৈত্রেয় প্রশ্ন করিলেন, যিনি নির্গুণ সুতরাং সকল প্রকার প্রমাণের অবিষয়, যিনি শুদ্ধ ও অমলস্বভাব, সেই ব্রহ্মের (সগুণ ধর্ম্ম) যে সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব, তাহা কি প্রকারে সম্ভবপর হয়?

এই প্রশ্নের উত্তরে মহামুনি পরাশর বলিলেন—

"শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ ॥
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা।"

এই সংসারে মণি, মন্ত্র ও মহৌষধি প্রভৃতি বস্তুতে যে সকল শক্তি আছে, তাহা সকলই যুক্তিবিরুদ্ধ অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে, ইহা সকলেই জানে। এই কারণেই নির্গুণ ও অপ্রমেয় ব্রহ্মেও সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অনুকূল

স্বাভাবিক শক্তিসমূহ আছে, ইহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। বহ্নিতে উষ্ণতা যেমন স্বাভাবিক, এই শক্তি-সমূহও সেইরূপ স্বাভাবিকই জানিতে হইবে।

উল্লিখিত বিষ্ণুপুরাণ-বচনের ব্যাখ্যা শ্রীধরস্বামী এইরূপ করিয়াছেন—

"তদেবং ব্রহ্মণঃ সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বমুক্তং, তত্র শঙ্ক্যতে নির্গুণস্যেতি। সত্ত্বাদিগুণরহিতস্য, 'অপ্রমেয়স্য' দেশকালাদ্যপরিচ্ছিন্নস্য 'শুদ্ধস্য' অদেহস্য সহকারিশূন্যস্য ইতি বা, 'অমলাত্মনঃ' পুণ্যপাপসংস্কারশূন্যস্য, রাগাদিশূন্যস্য ইতি বা। এবম্ভূতস্য ব্রহ্মণঃ কথং সর্গাদিকর্ত্তৃত্বমিষ্যতে, এতদ্বিলক্ষণস্যৈব লোকে ঘটাদিষু কর্ত্তৃত্বদর্শনাদিত্যর্থঃ। পরিহরতি শক্তয় ইতি সার্দ্ধেন। লোকে হি সর্ব্বেষাং ভাবানাং মণিমন্ত্রাদীনাং শক্তয়ঃ অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ, অচিন্ত্যং তর্কাসহং যজ্‌জ্ঞানং কার্য্যান্যথানুপপত্তিপ্রমাণকং তস্য গোচরাঃ সন্তি। যদ্বা অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদিবিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ কেবলমর্থাপত্তিজ্ঞানগোচরাঃ সন্তি। যত এবং অতো ব্রহ্মণোঽপি তাস্তথাবিধাঃ শক্তয়ঃ সর্গাদিহেতুভূতা ভাবশক্তয়ঃ স্বভাবভূতাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব পাবকস্য দাহকত্বাদিশক্তিবৎ। অতো গুণাদিহীনস্যাপি অচিন্ত্যশক্তিমত্ত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ সর্গাদিকর্ত্তৃত্বং ঘটত ইত্যর্থঃ।

সমর্থক শ্রুতি

শ্রুতিশ্চ—"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥"
"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্ধি মায়িনং তু মহেশ্বরম্"।

যদ্বা ইয়ং যোজনা সর্ব্বেষাং ভাবানাং পাবকস্য উষ্ণতাদিশক্তিবদচিন্ত্যজ্ঞান-গোচরাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব। ব্রহ্মণঃ পুনস্তাঃ স্বভাবভূতাঃ স্বরূপাদভিন্নাঃ শক্তয়ঃ "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়ত" ইতি শ্রুতেঃ। অতো মণিমন্ত্রাদিভিরগ্নেরৌষ্ণ্যবন্ন কেনচিদ্ বিহন্তুং শক্যন্তে। অতএব তস্য নিরঙ্কুশমৈশ্বর্য্যম্। তথাচ শ্রুতিঃ—

"স বা অয়মস্য সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ। ইত্যাদি। যত এবং অতো ব্রহ্মণো হেতোঃ সর্গাদ্যা ভবন্তি, নাত্র কাচিদনুপপত্তিঃ।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এইপ্রকারে ব্রহ্মের যে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কর্ত্তৃত্ব পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সে বিষয়ে শঙ্কা করা হইতেছে—"নির্গুণস্য" (ইত্যাদি শ্লোকটির দ্বারা); নির্গুণ শব্দের অর্থ সত্ত্বাদিগুণরহিত, অপ্রমেয় শব্দের অর্থ দেশ ও কাল প্রভৃতির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, শুদ্ধ শব্দের অর্থ অশরীরী অথবা সহকারিরহিত, অমলাত্ম এই শব্দটির অর্থ পুণ্য ও পাপরূপ সংস্কারশূন্য অথবা

রাগদ্বেষাদি-দোষরহিত, এইরূপ যে ব্রহ্ম, তাঁহার সৃষ্টি প্রভৃতি কর্তৃত্ব কি প্রকারে সম্ভবপর? এইপ্রকার যাহার স্বভাব নহে, লোকে ঘট প্রভৃতি কার্য্যের সৃষ্টি প্রভৃতির কর্তৃত্ব সেই ব্যক্তিতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

অর্থাপত্তি প্রমাণ

এইপ্রকার শঙ্কার নিরাকরণ করিবার জন্য "শক্তয়ঃ" ইত্যাদি সার্দ্ধশ্লোকটি রচিত হইয়াছে। (এই উত্তরবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে) লোকে মণিমন্ত্র প্রভৃতি বস্তুর যে সকল শক্তি প্রসিদ্ধ আছে, তাহা অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর; অচিন্ত্য শব্দের অর্থ যাহা যুক্তিসহ নহে অর্থাৎ 'ইহা স্বীকার না করিলে অন্য কোন প্রকারেই এইরূপ কার্য্য হইতে পারে না', এইরূপ যে অর্থাপত্তি-প্রমাণ, তাহা দ্বারা উৎপন্ন হয় যে জ্ঞান, তাহাকেই 'অচিন্ত্য জ্ঞান' বলা যায়। অথবা ইহা ভিন্ন, কিম্বা ইহা অভিন্ন, এইরূপ বিকল্পের দ্বারা যাহার চিন্তাই হইতে পারে না—কিন্তু কেবল অর্থাপত্তিরূপ প্রমাণের দ্বারা যাহা উৎপন্ন হয়, তাদৃশ জ্ঞানই অচিন্ত্যজ্ঞান, এতাদৃশ অচিন্ত্যজ্ঞানের যাহা বিষয়ীভূত, তাহাকেই 'অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর' বলা যায়। যেহেতু মণিমন্ত্রাদিস্থলে প্রসিদ্ধ শক্তি-সমূহের এইপ্রকারই স্বভাব হইয়া থাকে, সেই হেতুই ব্রহ্মে যে সকল শক্তি আছে, তাহাদেরও এইরূপ স্বভাবই হইবে। অর্থাৎ ঐ সকল শক্তি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন, এই চিন্তা দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে না; কিন্তু ঐরূপ শক্তি অঙ্গীকার না করিলে শুদ্ধ নির্গুণ সহকারি-বিরহিত ব্রহ্ম হইতে এই পরিদৃশ্যমান সংসার সৃষ্ট হইয়াছে, এইরূপ যে শ্রুতিপ্রমাণ, তাহার অন্য কোন প্রকারে প্রামাণ্য সম্ভবপর হয় না, এইরূপ অর্থাপত্তিরূপ প্রমাণের দ্বারাই ব্রহ্মে তাহা হইতে ভিন্নাভিন্নত্ববিচারাসহ সৃষ্টি প্রভৃতির অনুকূল শক্তিসমূহ যে আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

অচিন্ত্য ভেদাভেদ

সেই শক্তি শক্তিযুক্ত সেই ব্রহ্ম হইতে আত্যন্তিকভাবে ভিন্ন, ইহা বলা যায় না, আবার তাহা যে ব্রহ্ম হইতে আত্যন্তিকভাবে অভিন্ন, তাহাও বলা যায় না; সুতরাং তাহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বটে, আবার অভিন্নও বটে। এইপ্রকার অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর যে সকল শক্তি ব্রহ্মে আছে, তাহা সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু অথচ তাহা সকলই ব্রহ্মের স্বভাবভূত। অর্থাৎ অগ্নিতে যেমন দাহশক্তি অগ্নির স্বভাবভূত, কল্পিত বা আগন্তুক নহে, সেইরূপ ব্রহ্মের শক্তি-

সমূহও ব্রহ্মের স্বভাবভূত, তাহা কল্পিত বা আগন্তুক অথবা মিথ্যাভূত, ইহা বলিতে পারা যায় না। এই কারণে গুণাদিবিরহিত হইলেও অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত বলিয়া ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি করিয়া থাকেন, ইহাই শ্রুতিরূপ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রুতিই বলিয়া থাকেন, "তাহা হইতে পৃথক্ কোন কার্য্যও নাই, কোন করণও নাই, এ সংসারে তাহার তুল্যও কেহ নাই, তাহা হইতে অধিকও কেহ দৃষ্ট হয় না অথচ সেই ব্রহ্মের নানা প্রকার স্বভাবভূত শক্তিসমূহ বিদ্যমান আছে, ইহা শ্রুতিই বলিয়া দিতেছেন। সেই ব্রহ্মের জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াশক্তি স্বাভাবিক (অর্থাৎ মায়িক বা কল্পিত নহে)।"

শ্রুতি আরও বলিতেছেন—

"ব্রহ্মের প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া বুঝিতে হইবে, সেই মায়ীই মহেশ্বর।"

পরা শক্তিঅর্থে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন শক্তি

অথবা এই ভাবে উক্ত সার্দ্ধশ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে যে, সকল বস্তুরই বহ্নির উষ্ণতাদি শক্তির ন্যায় অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর শক্তি-সমূহ বিদ্যমান আছে। ব্রহ্মের কিন্তু যে সকল শক্তি আছে, তাহা সমস্তই তাঁহার স্বভাবভূত—অর্থাৎ ঐ সকল শক্তি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। 'তাঁহার নানাপ্রকার পরা শক্তি শ্রুত হইয়া থাকে' এইরূপ শ্রুতিতে 'পরা' এই বিশেষণটির দ্বারা ঐ শক্তি-সমূহ যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। এই হেতু ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, যেমন মণিমন্ত্রাদির প্রভাবে অগ্নি প্রভৃতির উষ্ণতাদি শক্তিকে বিনষ্ট করা যায় না, সেই ব্রহ্মেরও ঐ সকল শক্তি কোন উপায় দ্বারা বিনাশিত হইতে পারে না। এই হেতু ব্রহ্মের যে ঐশ্বর্য্য, তাহা সর্ব্বদাই নিরঙ্কুশ অর্থাৎ অপ্রতিহত। এই জন্যই শ্রুতিও বলিতেছেন—"সেই এই পরমাত্মা সকল বস্তুকে আপনার বশীভূত করিয়া রহিয়াছেন। কারণ, তিনি সকলেরই ঈশ্বর, তিনি সকলেরই অধিপতি।"

ব্রহ্মতত্ত্বনিরূপণপর শ্রুতি-সমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিবার জন্য যে পথ জ্ঞানী ও ভক্ত মহর্ষিগণের একমাত্র অবলম্বনীয়, তাহাই বিষ্ণুপুরাণের উদ্ধৃত অংশ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বামিপাদ শ্রীধরাচার্য্যও সেই পথ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বিষ্ণুপুরাণের উপর নির্ভর করিয়া জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের পরস্পর সম্বন্ধ যে অচিন্ত্যভেদাভেদ, তাহাও নিঃসন্দিগ্ধভাবে উদ্ধৃত টীকাংশে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

ব্যবহারিক পারমার্থিক ভেদ—অনার্ষ কল্পনা

এইরূপ পথই ব্রহ্মতত্ত্বপর শ্রুতি-সমূহের তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের ঐকান্তিক অনুকূল, তাহা পক্ষপাতরহিত বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই স্বীকার্য্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ পথ অবলম্বন করিলে ব্রহ্মতত্ত্বপ্রতিপাদনপর শ্রুতিসমূহের মধ্যে কতকগুলি শ্রুতির পারমার্থিক প্রামাণ্য আর কতকগুলি শ্রুতির ব্যবহারিক প্রামাণ্য এইরূপ যে অনার্ষকল্পনা, তাহাও করিতে হয় না। কি দ্বৈতবাদী কি অদ্বৈতবাদী কোন আচার্য্যই অনার্ষকল্পনারূপ দোষ হইতে মুক্ত নহেন, ইহা পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই কারণে এ স্থলে আব তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে না।

শ্রুতিপ্রামাণ্য ইহার ভিত্তি

পরমার্থরসবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই পুরাণসম্মত আর্ষপদ্ধতিকেই অবলম্বন করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাই হইল 'অচিন্ত্যভেদাভেদ।' এই অচিন্ত্যভেদাভেদ-রহস্য সম্যক্‌প্রকারে অবগত না হইতে পারিলে কেহ পরমার্থরস বা প্রেমভক্তির আস্বাদনে অধিকারী হইতে পারে না, শ্রুতিপ্রামাণ্যের প্রতি অবিচলিত দৃঢ়বিশ্বাসই এই পারমার্থিক রসাস্বাদনের অধিকার সম্পাদন করিয়া দেয়, তাই চরিতামৃতকার শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"বিশ্বাসে লভয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর"

তিনি আরও বলিয়াছেন—

"এ অমৃত অনুক্ষণ সাধুমহান্ত-মেঘগণ
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ,
তাতে ফলে প্রেম-ফল ভক্ত খায় নিরন্তর
তার শেষে জীয়ে জগজন।
এ অমৃত কর পান যাহা সম নাহি আন
চিত্তে করি সুদৃঢ় বিশ্বাস,
না পড় কুতর্কগর্ত্তে অমেধ্য কর্কশাবর্ত্তে
যাতে পড়িলে (জীবের) হয় সর্ব্বনাশ।"

শ্রুতি ভগবদ্‌ বাক্য

অগাধ পাণ্ডিত্য বা তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তার উপর একমাত্র নির্ভর করিলে পরমেশ্বরতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া কেহ পরমার্থরসাস্বাদনে মনুষ্যজন্ম সফল করিবেন, ইহা কখনই

সম্ভবপর নহে। দীপাবলি জ্বালিয়া, দিগ্‌দিগন্তোদ্ভাসী বৈদ্যুতিক আলোকপুঞ্জ সৃষ্টি করিয়া, তাহার সাহায্যে এ সংসারে কেহই সূর্য্য দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু আপনার রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া সেই সূর্য্য যখন আপনাকে দেখাইবার উপায় করিয়া দেন, তখন সেই সূর্য্যালোকের সাহায্যেই লোক সূর্যাদর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অগণিত কোটি কোটি সূর্য্য যাঁহার লীলাশক্তির ক্ষণিক বিকাশ ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে সেই সচ্চিদানন্দঘন জ্যোতির্ম্ময় রসবিগ্রহ শ্রীভগবান্ আপনার স্বরূপপ্রকাশের দ্বারা আত্মভূত পারমার্থিক রসাস্বাদনে আত্মাংশ পুণ্যবান্ জীবনিবহকে ধন্য করিবার আত্মস্বরূপপ্রকাশক্ কিরণকল্প শ্রুতিসমূহকে আপনা হইতে আবির্ভূত করিয়াছেন। সেই শ্রুতিসমূহের সাহায্যগ্রহণ ব্যতিরেকে পরমাত্মদর্শনের অন্য কোন প্রকৃষ্ট সাধন নাই, সেই শ্রুতির মধ্যে কোনটি প্রমাণ, আবার কোনটি অপ্রমাণ, এইরূপ কল্পনা করিয়া যাঁহারা পরমেশতত্ত্বের নিরূপণ করিতে প্রয়াস করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে যে ভগবদ্‌বাক্য বলিয়া শ্রুতিপ্রামাণ্যের উপর দৃঢ়বিশ্বাস আছে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। ইহাই হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তে দৃঢ়বিশ্বাসই পাবমার্থিক রসাস্বাদনের প্রকৃষ্ট পন্থা, তাহাই উদ্ধৃত পদ কয়টির দ্বারা চরিতামৃতকার অতি সুন্দরভাবে সমর্থন করিয়াছেন।

(১২)

শক্তি ত্রিবিধ—পরা, তটস্থা, বহিরঙ্গা

সকল পদার্থের আত্মভূত, সকল আশ্চর্য্যের আদর্শ ও সকল সৌন্দর্য্যের নিদান সেই সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবান্‌ই যে অনন্ত ও অচিন্ত্য শক্তিসমূহের একমাত্র আধার, তাহা শ্রুতিরূপ প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী দার্শনিক আচার্য্যগণ ইহা না মানিতে পারেন, কিন্তু সকল পুরাণেই এই সিদ্ধান্তই শ্রৌত সিদ্ধান্ত বলিয়া আদৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে; সুতরাং এই সিদ্ধান্তই যে ঋষিগণ কর্তৃক অবলম্বিত, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীভগবানের সেই অপ্রতিসংখ্যেয় শক্তি-নিচয় পুরাণশাস্ত্রে তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে, যথা—পরা শক্তি, তটস্থা শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তি। প্রথম—পরা শক্তিই অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি। জীবসমূহই তাঁহার তটস্থা শক্তি, জড় প্রপঞ্চরূপে পরিণত মায়াশক্তিই তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাঽপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

এই বিষ্ণুপুরাণীয় বচন দ্বারা শ্রীভগবানের উক্ত শক্তিত্রয় সংক্ষিপ্তভাবে প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

এই ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে পরা শক্তি বা স্বরূপশক্তিই পারমার্থিক রস-নির্ণয়ের জন্য একান্ত অপেক্ষিত হয়, এই কারণে এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সংবিৎ

এই পরা শক্তির পরিচয়প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ কথিত হইয়াছে যে,—

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—

হে ভগবন্, তুমি যেহেতু সকল বস্তুরই আধার, এই কারণে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ এই ত্রিবিধ শক্তিও তোমাতেই বিদ্যমান আছে। এই শক্তি কার্য্যভেদে তিনরূপে প্রসিদ্ধ হইলেও বস্তুতঃ এক। কারণ, তুমি যেহেতু এক, তোমার শক্তিও সেই কারণে একই হইয়া থাকে। সংসারে তাপ ও আহ্লাদের এবং তাপ ও আহ্লাদমিশ্রিত অবস্থার সৃষ্টিকারিণী যে অবিদ্যা, তাহার অণুমাত্রও প্রভাব তোমার উপর হইতে পারে না, কারণ, তুমি মায়াপ্রসূত যে সকল গুণ, তাহা দ্বারা আক্রান্ত নহ।

বিষ্ণুপুরাণের এই শ্লোকটি অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের মূলসূত্রস্থানীয়, সুতরাং পারমার্থিক রসতত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে এই শ্লোকটির অন্তর্নিহিত সুগভীর দার্শনিক তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা একান্ত আবশ্যক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের শিরোমণি শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাই এই শ্লোকটির প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রতিপাদন করিবার জন্য প্রযত্ন করা যাইতেছে।

সৃষ্টির মূলে একাকিত্ব পরিহার

কল্পনার সাহায্যে শ্রীভগবানের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা জানা সম্ভবপর নহে, কিন্তু তাঁহার নিজের ভাষারই সাহায্যে তাঁহাকে জানিতে পারা যায়, ইহা ছাড়া

তাঁহাকে জানিবার অন্য কোন উপায় নাই। ইহাই হইল ভক্তিবাদের সিদ্ধান্ত, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নিজের তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই তিনি বেদবাণীসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই বেদের সাহায্যেই শ্রীভগবান্‌কে বুঝিতে হইবে। এক্ষণে দেখা যাক্, সাক্ষাৎ বেদ সে বিষয়ে কি বলিতেছেন ? শ্রুতি বলিতেছেন— "স একাকী নারমত।" সেই পরমাত্মা একাকী ছিলেন, এই কারণে তাঁহার তৃপ্তি হইতেছিল না। তাহার পরই শ্রুতি বলিতেছেন—"স আত্মানং দ্বিধাঽকুরুত।" তখন তিনি আপনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন এবং সেই ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, ইহা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়া এক্ষণে সেই শ্রুতিই আবার বলিতেছেন— সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম একাকী থাকিয়া সুখী হইতে পারিতেছিলেন না বলিয়া তিনি আপনাকে দুই ভাগে পরিণত করিয়াছিলেন। এই শ্রুতির নিগূঢ় তাৎপর্য্য কি, তাহাই বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য বিষ্ণুপুরাণে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই ত্রিবিধ অন্তরঙ্গশক্তির অবতারণা করা হইয়াছে।

এক শক্তি ত্রিধা বিভক্ত

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এই বিষ্ণুপুরাণোক্ত শ্লোকটির তাৎপর্য্য-পরিচয়প্রসঙ্গে কি বলিয়াছেন, এই স্থানে তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে—

"প্রথমং তাবৎ একস্যৈব তত্ত্বস্য সচ্চিদানন্দত্বাৎ শক্তিরপ্যেকা ত্রিধা ভিদ্যতে। তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে শ্রীধ্রুবেণ—হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, 'সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপই ছিলেন বলিয়া তাঁহার যে স্বরূপভূত শক্তি, তাহাও বস্তুতঃ একই ছিল, সেই শক্তিই তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে।' এই কথাই বিষ্ণুপুরাণে ধ্রুব "হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ" এই শ্লোকটিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

একমাত্র পরব্রহ্ম স্বরূপভূত একমাত্র শক্তিস্বরূপ হইয়া আবার কিরূপে তিন ভাগে বা তিন প্রকারে ভিন্ন হইয়া থাকেন, এই শঙ্কা স্বতঃই লোকের হৃদয়ে উদিত হইতে পারে, কিন্তু লৌকিক প্রমাণ ও প্রমেয় বাক্যের সীমার বহির্ভূত অপ্রাকৃত ভগবত্তত্ত্ববিষয়ে এইরূপ শঙ্কা উত্থিতই হইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, "শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।"

প্রত্যেক বস্তুতেই এমন সব শক্তি বিদ্যমান আছে, যাহা তর্কের দ্বারা সিদ্ধ হয় না, অথচ অনুভূতির বিষয়ও হইয়া থাকে।

পরা বা স্বরূপ শক্তিও এরূপ ত্রিবিধ

ইহাই যদি বস্তুমাত্রেরই স্বভাব হয়, তবে সকল পদার্থের উপাদানস্বরূপ যে ভগবান্, তাঁহাতে যে অচিন্ত্য ও অনন্ত শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

সুতরাং তাঁহার পরা বা স্বরূপশক্তি এক হইয়াও অনেক হইয়া থাকে। তাহা সচ্চিদানন্দাত্মক শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন হইয়া ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে, ইহাই হইল শ্রুতিসম্মত সিদ্ধান্ত। সকল কার্য্যই যখন তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, তখন ঐ সকল কার্য্যের অনুকূল শক্তিনিচয় যে তাঁহাতেই আছে অথচ বহ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় সেই শক্তি তাঁহা হইতে পৃথক্, তাহাও বলিবার যো নাই। ইহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই ত্রিবিধ পরা শক্তির স্বরূপ কি, তাহাই এখন দেখা যাউক। ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ এই ত্রিবিধ শক্তির পরিচয় এইভাবে দিয়াছেন যে,—

"তত্র চ সতি ঘটানাং ঘটত্বমিব সর্ব্বেষাং সতাং বস্তূনাং প্রতীতে নিমিত্তমিতি কচিৎ সত্তাস্বরূপত্বেন আম্নাতোঽপ্যসৌ ভগবান্ 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' ইতি সদ্রূপত্বেন ব্যপদিশ্যমানো যয়া সত্তাং দধাতি ধারয়তি চ সা সর্ব্বদেশকালদ্রব্যাদি-প্রাপ্তিকরী সন্ধিনী। তথা সম্বিদ্রূপোঽপি যয়া সম্বেত্তি সম্বেদয়তি চ সা সম্বিৎ। তথা হ্লাদরূপোঽপি যয়া সম্বিদুৎকর্ষরূপয়া তং হ্লাদং সম্বেত্তি সম্বেদয়তি চ, সা হ্লাদিনীতি বিবেচনীয়ম্।"

সত্তার আধার সন্ধিনী

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সেই ভগবত্তত্ত্ব পূর্ব্বে যে ভাবে উক্ত হইয়াছে, তাহাতে *বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, ঘটত্ব যেমন সকল প্রকার ঘটের অনুভূতির নিমিত্ত,* সেইরূপ সৎ বলিয়া লোকে যাহা কিছু ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই সকল বস্তুরই যে অনুভূতি হয়, তাহার নিমিত্তও কিছু নিশ্চয়ই আছে, এবং সেই নিমিত্তই সত্তা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, সেই সত্তাস্বরূপ বলিয়াই শাস্ত্রে ভগবান্ উক্ত হইয়া থাকেন। "হে সৌম্য, এই পরিদৃশ্য নিখিল প্রপঞ্চসৃষ্টির

পূর্ব্বে একই ছিল” এইরূপ শ্রুতিবাক্যেও সেই সকল-প্রকার সদ্‌ব্যবহারের নিমিত্তস্বরূপ ভগবান্ সৎস্বরূপ বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। সেই একমাত্র সৎস্বরূপ শ্রীভগবান্ যে অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে নিজে সত্তার আধার হইয়া থাকেন এবং সকল সদ্‌বস্তুকে সত্তার আধাররূপে পরিণত করিয়া থাকেন, সেই শক্তিরই নাম সন্ধিনী। শুধু তাহাই নহে, এই সন্ধিনী শক্তিই সকল-প্রকার দেশ, কাল ও অন্যান্য দ্রব্যসমূহের যথাসম্ভব যে পরস্পরপ্রাপ্ত আধারাধেয়ভাবরূপ সম্বন্ধ, তাহারও নিমিত্ত হইয়া থাকে।

চিৎ ও আনন্দের আধার সম্বিৎ ও হ্লাদিনী

তেমনই ভগবান্ স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও যে শক্তির প্রভাবে নিজে জ্ঞাতা হইয়া থাকেন এবং জ্ঞানস্বরূপ সকল জীবকেই জ্ঞাতা করিয়া থাকেন, তাহারই নাম সম্বিৎ। সেইরূপ শ্রীভগবান্ স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়াও যে শক্তির প্রভাবে নিজে আনন্দের অনুভব করেন এবং সকল জীবকেই সেই আত্মস্বরূপ আনন্দের অনুভব করাইয়া থাকেন, তাহারই নাম হ্লাদিনী। এই হ্লাদিনী শক্তি পূর্ব্বকথিত সম্বিৎ শক্তির সার বা উৎকর্ষ—অর্থাৎ চিচ্ছক্তি যখন সুখানুভূতিতে পরিণত হয়, তখনই বুঝিতে হইবে, ঐ চিচ্ছক্তি পরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। কারণ, এ সংসারে সকল আস্বাদনের সার হইতেছে সুখাস্বাদন; সুখের আস্বাদনই সমস্ত জীবের চরম উদ্দেশ্য। এই চরম উদ্দেশ্য যে শক্তির প্রভাবে সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাকেই ভক্তিশাস্ত্রের আচার্য্যগণ হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া থাকেন। ইহাই হইল শক্তিত্রয়ের মধ্যে পরস্পর বিশেষ।

সুখাস্বাদ হইতে জীবন অভিন্ন

শ্রীভগবান্ স্বয়ং আনন্দস্বরূপ, ইহা উপনিষদ্ বলিয়া থাকে। কিন্তু সেই আনন্দের অনুভব যদি না হয়, তাহা হইলে তাহা ব্যর্থই হয়, ইহা প্রত্যেক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই স্বীকার করিতে হইবে! সুখ যদি আস্বাদ্য না হয়, তাহা যদি ভোগ্য না হয়, তাহা হইলে তাহার সুখরূপতাই অসিদ্ধ হইয়া যায়। *এই অপ্রত্যাখ্যেয় জাজ্বল্যমান সত্যই ভক্তি-সিদ্ধান্তের আশ্রয়ভিত্তি।* মানুষমাত্রই, জানিয়াই হউক আর না বুঝিয়াই হউক, জীবনের প্রত্যেক চেষ্টায় এই সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। শুধু মানুষ কেন, সকল জীবই সর্ব্বদা এই সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করিতেছে এবং যত দিন এ সংসারে তাহারা থাকিবে, ততকাল এই সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করিবে, ইহা স্থির।

সুখের প্রতি ভালবাসা, প্রতিক্ষণ সুখের জন্য ব্যক্ত বা অব্যক্ত লালসাই জীবের স্বভাব, এই স্বভাবকে প্রত্যাখ্যান করিয়া মানব এসংসারে থাকিতে পারে না। দাহিকা শক্তিকে ছাড়িয়া দিলে যেমন বহ্নির বহ্নিত্বই বিলুপ্ত হয়, সেইরূপ এই স্বভাব পরিত্যাগ করিলে জীবের জীবত্বই বিলুপ্ত হইয়া যায়, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

সুখলিপ্সার উচ্ছেদ অদ্বৈতবেদান্তের লক্ষ্য

ভারতবর্ষের দার্শনিক আচার্য্যগণ সকলেই একবাক্যে জীবসমূহের এই যে সুখপ্রীতির স্বাভাবিকতা বা সাহজিকতা, তাহা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু এই স্বভাব-অনুসারিণী বৃত্তির চরিতার্থতাই মানব-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বা লক্ষ্য হওয়া একান্ত আবশ্যক, এই বিষয়ে তাঁহারা সকলে একমত হইতে পারেন নাই। সুখভোগলিপ্সা মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, ইহা আচার্য্য শঙ্কর ও তন্মতানুযায়ী দার্শনিক আচার্য্যগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, ইহা সত্য; কিন্তু এই সুখভোগলিপ্সাই মানবের সকল দুঃখ—সকল অনর্থ—সকল বিপদের মূলীভূত কারণ। এই জন্য এই সুখভোগলিপ্সার ঐকান্তিক উচ্ছেদ-সাধন ব্যতিরেকে মানবের শান্তি সম্ভবপর নহে, ইহাই হইল তাঁহাদের মত। সেই উচ্ছেদ কিসে হয়, তাহার নির্দ্দেশ যে দর্শনে আছে, তাহাই বিবেকী পুরুষগণের একান্ত সেব্য, সেই দর্শনই হইল অদ্বৈত বেদান্তদর্শন। ইহাই তাঁহারা আচার্য্য শঙ্করের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন।

দুঃখদ্বেষ বলবত্তর

এই অদ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন, সুখের প্রতি আমাদের যে অনুরাগ, তাহা হইতে দুঃখের প্রতি আমাদের যে বিদ্বেষ, তাহা বলবত্তর। সুখের কারণ বলিয়া যাহা আমাদের নিকটে প্রতীত হয়, তাহা যদি সম্ভাবিত সুখ অপেক্ষা অধিক দুঃখের কারণ বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি, তাহা হইলে আমরা অনায়াসে সেই সুখ-সাধন বস্তুকে উপেক্ষা করিয়া থাকি, ইহা জনসমাজে সর্ব্বদাই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। একান্ত বুভুক্ষু ব্যক্তির নিকটে খাইবার জন্য বিষদিগ্ধ মিষ্টান্ন যদি অর্পিত হয়, তবে বুভুক্ষার অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিয়াও সুখের সাধন সেই মিষ্টান্নকে সে উপেক্ষা করিয়া থাকে, ইহা কে না জানে? সেইরূপ সুখভোগের আশায় প্রবৃত্ত ব্যক্তি যদি বুঝিতে পারে যে, সুখের জন্য আমি যে

কোন কার্য্যই করি না কেন, পরিণামে তাহাতে আমাকে দুঃখভোগ করিতেই হইবে, তখন তাহার আর ঐরূপে সুখার্থ কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি থাকে না। সে তখন এমন কোন সাধনের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, যাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিলে তাহার আর দুঃখভোগের সম্ভাবনা থাকে না।

সুখদুঃখাতীত মুক্তি

এই জ্ঞান যাহার হয় নাই, সেই অবিবেকী ব্যক্তিই এ সংসারে সুখলাভের আশায় নানা প্রকার দৃষ্ট বা অদৃষ্ট সাধনের সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আত্মার পরলোক সম্বন্ধে যাহার বিশ্বাস থাকে না, সেই সুখার্থী মানব টাকা-কড়ি, বিষয়-সম্পত্তি ও জনবল সম্পাদনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকে। আর যে বিশ্বাস করে, এই সংসারে মরিয়া গেলেই আমার সব ফুরাইয়া যায় না, মৃত্যুর পর আমার আবার নূতন দেহ জুটিবে, সেই দেহে আমাকে আমার এই জীবনে অনুষ্ঠিত শুভ বা অশুভ কর্ম্মের ফল সুখ বা দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে, সেই ব্যক্তি শাস্ত্রপ্রামাণ্যের উপর নির্ভর করিয়া, শাস্ত্রে পরলোকে সুখের সাধন বলিয়া যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, সেই সকল কর্ম্মের যথাশক্তি অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়। আর যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, যত কিছু সুখের সাধন আছে, তাহা সকলই দুঃখসাধনের সহিত ঐকান্তিকভাবে মিশ্রিত থাকে, সুতরাং ইহলোকে বা পরলোকে সুখের সাধন বলিয়া যে সকল কর্ম্ম বিহিত আছে, তাহার অনুষ্ঠান করিলেও আমি ইহলোকেই হউক বা পরলোকেই হউক, দুঃখের হস্ত হইতে যে একান্তভাবে নিষ্কৃতি লাভ করিব, তাহার কোন সম্ভাবনাই নাই, তাহার পক্ষে সর্ব্বপ্রকার দুঃখধ্বংসের একমাত্র সাধন ব্রহ্মজ্ঞানকে লাভ করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। তাহার তখন ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ্য বস্তুমাত্রের প্রতি তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। সে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য তাঁহারই শরণাগত হইয়া থাকে এবং তাঁহারই উপদেশানুসারে সংন্যাস অবলম্বন করিয়া, জীবই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, আর সকলই মিথ্যা, এই প্রকার পরমার্থ-তত্ত্বের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ইহাই হইল অদ্বৈতবাদী দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত।

ভক্তসেব্য অদ্বৈতবাদ

এই সিদ্ধান্তে ভক্ত নাই, ভক্তিসুখ নাই, ভগবান্‌ও এ সিদ্ধান্তে পারমার্থিক তত্ত্ব নহেন, জীবের জীবত্ব যেমন অজ্ঞানকল্পিত, সুতরাং মিথ্যা, পরমেশ্বরের

পরমেশ্বরত্বও সেইরূপ অজ্ঞানকল্পিত, সুতরাং তাহাও মিথ্যা, এ সংসারে জীবও নাই, পরমেশ্বরও নাই, আছে কেবল ব্রহ্ম, ছিলও তাহাই এবং থাকিবেও তাহাই, সেই ব্রহ্ম, একমাত্র পরমার্থ সৎ জ্ঞান ও আনন্দ একই। সেই জ্ঞান ও আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ, এই ব্রহ্মই আমি অর্থাৎ এই ব্রহ্মের উপরই আমার আমিত্ব বা তোমার তুমিত্ব কল্পিত ছাড়া আর কিছুই নহে, সুতরাং অনাদিকাল হইতে আমাতে অনুস্যূত যে আত্মস্বরূপের অজ্ঞান বা বিপরীত জ্ঞান, যাহা হইতে সকল প্রকার অনর্থের হেতু এই তুমিত্ব বা আমিত্ব, তোমার ও আমার আত্মভূত এই ব্রহ্মে আরোপিত হইয়া আসিতেছে, সেই অজ্ঞানের বা আত্ম-ভ্রান্তির উচ্ছেদসাধনই আমার একান্ত কর্তব্য। ইহাই অদ্বৈত বেদান্তের প্রধান উপদেশ। এই উপদেশানুসারে সংসারে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই চলিতে পারে এবং তদনুসারে চলিয়া আত্মপরিতৃপ্তির সহিত পরমশান্তিকে লাভ করিতে পারে আরও অল্পসংখ্যক ব্যক্তি, ইহাও সাধারণের নিকট অবিদিত নহে। এইরূপ অদ্বৈত সিদ্ধান্তের উপর একান্ত নির্ভরশীল ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥

অদ্বয়ে স্থিতি দুর্ঘট

হে বিভো! সকল প্রকার শ্রেয়োলাভের একমাত্র সাধন তোমার প্রতি ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বের অনুভব লাভ করিবার জন্য যাহারা ক্লেশ পাইয়া থাকে, তাহাদিগের পক্ষে ঐরূপ অদ্বয় জ্ঞানমার্গ কেবল ক্লেশকরই হইয়া থাকে ও অন্য কোন প্রকার পুরুষার্থ লাভের তাহা কারণও হয় না। তণ্ডুল যাহার ভিতরে নাই—এরূপ তুষসমূহকে লইয়া অবঘাত করিলে যেমন কোন ঈপ্সিত ফল পাওয়া যায় না—অথচ নিরর্থক ক্লেশভোগই হইয়া থাকে, প্রকৃত স্থলেও সেইরূপই হইয়া থাকে।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

হে কমলনয়ন ভগবন্, যাহাদিগের হৃদয় ভক্তিহীন এবং যাহারা অদ্বয়জ্ঞানের সাহায্যে আমরা মুক্ত হইয়াছি বা হইব, এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে, তাহারা শমদমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্র সাধনের ফলে কিয়ৎকালের জন্য আপনাদিগকে জীবন্মুক্ত

বলিয়া বোধ করিতে পারিলেও পারে, কিন্তু সেই অবস্থা হইতে পতিত হইয়া নিতান্ত অধোগতি লাভ করিয়া থাকে। তাহাদের এইরূপ অধঃপাতের হেতু এই যে, তাহারা ভক্তিভরে তোমার পাদ-পদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে না।

(১৩)

বিষয়জ সুখদুঃখ আকস্মিক

শ্রীমদ্‌ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্‌ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা॥

বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি তাহারই লাভের জন্য প্রযত্ন করিবে, এ সংসারে উপরিতন লোকে বা অধস্তন লোকে ভ্রমণকারিগণ যাহা লাভ করে না; (যাহা পাইবার জন্য সাধারণতঃ সকলেই যত্ন করিয়া থাকে) সেই বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন সুখ, দুঃখের ন্যায় অচিন্ত্যপ্রভাব কাল বশতই লব্ধ হইয়া থাকে।

এই শ্লোকে উপরিতন লোকে বা অধস্তন লোকে পরিভ্রমণকারী জীবগণের যাহা দুর্লভ, অর্থাৎ একমাত্র এই পৃথিবীতেই যাহা পাইবার যোগ্য, তাহাকেই পাইবার জন্য মানুষের প্রযত্ন করা উচিত, ইহা স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই বস্তু যে কি, তাহা স্পষ্টভাবে কথিত হয় নাই। সে যে অভিলষিত প্রাপঞ্চিক বিষয়ভোগজনিত সুখ বা তৃপ্তি, তাহা নহে। কারণ, বিষয়েন্দ্রিয়সম্পর্ক হইতে উৎপন্ন সুখ বা তৃপ্তি, অচিন্ত্যশক্তি কালপ্রভাবেই অনাকাঙ্ক্ষিত দুঃখের ন্যায় পুরুষ-প্রযত্ন ব্যতিরেকেও লাভ করিতে পারা যায়, তাহা ত স্পষ্টভাবেই এই শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তবে তাহা কি? এই শ্লোকে তাহা স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট না হইলেও শ্রীমদ্‌ভাগবতে অন্যত্র তাহা অতি স্পষ্টভাবেই কথিত হইয়াছে, যথা—

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মা ভূৎ
কিং ত্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥

ভক্তিসুখ সুদুর্লভ

হে নাথ! দেহিগণের—তোমার পাদপদ্মধ্যান হইতে অথবা (পাদপদ্মধ্যানের কথা দূরে থাকুক) তোমার প্রেমরসে আত্মহারা হইয়া যাহারা একবারে তোমারই মানুষ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের অলৌকিক রসময় কথার স্মরণ হইতে যে অপ্রাকৃত সুখ হইয়া থাকে, সেই অপ্রাকৃত সুখ—জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের চরমসীমায় উপনীত সত্যলোকপতি চতুরানন ব্রহ্মারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। মরণের তীক্ষ্ণধার খড়্গের আঘাতে বিপর্য্যস্ত ব্যোমযান হইতে পতন যাহাদিগের পক্ষে অনিবার্য্য, সেই ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের পক্ষে সেই সুখ যে একেবারে অসম্ভাবনীয়, সে বিষয়ে আর অধিক বক্তব্য কি আছে?

এই শ্লোকে ভগবৎপাদারবিন্দধ্যানপ্রসূত ব্রহ্মাদিদেবগণেরও অতি দুর্লভ যে নির্বৃতি বা সুখের কথা বলা হইয়াছে, তাহাই ভক্তিশাস্ত্রে পারমার্থিকরস-শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রাকৃত ও পারমার্থিক রসে পার্থক্য

প্রাকৃত কাব্যনিচয়ের রচয়িতা কবিগণ বা আলোচক আলঙ্কারিকগণ অথবা আস্বাদয়িতা সহৃদয়গণ যে রসের সহিত পরিচিত, সে রস পারমার্থিক রস নহে, হইতেও পারে না। কারণ, তাহার আলম্বন. তাহার উদ্দীপন, তাহার অনুভাব এবং তাহার সঞ্চারিভাব এ সকলই প্রাকৃত, সুতরাং অশুদ্ধ; সেই সকল আলম্বন, উদ্দীপন ও সঞ্চারিভাব হইতে মানবহৃদয়ে যে রতির অভিব্যক্তি হয়, তাহাও প্রাকৃত রতি, তাহার ঐকান্তিকী শুদ্ধি সম্ভবপর নহে। কারণ, তাহা দেহাত্মভাবরূপ অন্ধতমসাবৃত কামাদি-দোষ-কলুষিত স্বার্থপর চিত্তগহ্বরে প্রসুপ্ত হলাহলোদ্‌গারী কালভুজঙ্গমোপম বাসনাজালের ক্ষণিক পরিণতি ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। এমন প্রাকৃত রতি প্রাকৃত আলম্বন ও উদ্দীপন প্রভৃতির প্রভাবে অভিব্যক্ত হইয়া আস্বাদ্যমান হইয়া রসরূপ ব্রহ্মাস্বাদের সদৃশ হইয়া যায়, লৌকিকরাজ্যের বাহিরে গিয়া দাঁড়ায়, অশুদ্ধচিত্তের স্পন্দনমাত্রের পরিণতি হইয়াও কাব্যসম্পদের প্রভাবে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মবৎ সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ-বুদ্ধস্বভাব হইয়া উঠে, ইহা প্রাকৃত রসিকগণের সিদ্ধান্ত হইতে পারে; কিন্তু সদসদ্বিবেকী ব্যক্তিগণেব নিকটে, ক্ষণভঙ্গুর দুঃখবহুল সাংসারিক সুখের প্রতি একান্ত-বিরক্ত পারমার্থিক-রসানুসন্ধিৎসু প্রকৃত সহৃদয় মনীষিগণের নিকটে এই সিদ্ধান্ত কখনই শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না—ইহাই গৌড়ীয়

বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রাণের কথা। তাঁহাদের এই কথার মধ্যে যে মধুর অথচ গূঢ় তাৎপর্য্য নিহিত আছে, এইক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

রসের আশ্রয় রতি নায়কের নহে

লৌকিক রসের ভিত্তিস্থানীয় যে রতি বা স্থায়িভাব, তাহা কাহার মনোবৃত্তি, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন যে, নাটকে বা কাব্যে যে নায়ক বা নায়িকা বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহাদের মনোবৃত্তি যে রতি, তাহা সহৃদয়গণের রসাস্বাদের ভিত্তি হইতে পারে না। কেন হইতে পারে না, তাহাই বুঝাইবার জন্য উক্ত হইয়াছে যে—

পারিমিত্যাল্লৌকিকত্বাৎ সান্তরায়তয়া তথা।
অনুকার্য্যস্থ রত্যাদেরুদ্বোধো ন রসো ভবেৎ॥

দৃশ্যকাব্যস্থলে যাহার অনুকরণ নট করিয়া থাকে, সেই নায়ক বা নায়িকার যে রতি বা অনুরাগ, সহৃদয়গণের যে তদ্বিষয়ক আস্বাদ বা অনুভূতিবিশেষ, তাহা রস হইতে পারে না। কারণ, সেই নায়ক বা নায়িকার যে রতি, তাহা পরিমিত, লৌকিক এবং সান্তরায়।

সহৃদয়ে উহা সংক্রমিত হওয়া অসম্ভব

আমরা রসাস্বাদের আকাঙ্ক্ষায় যখন কোন দৃশ্য-কাব্যের অভিনয় দেখিবার জন্য রঙ্গশালায় প্রবেশ করিয়া দেখি, কোন অভিনয়ক্রিয়াকুশল নট 'মৃণালিনীর' সুপ্রসিদ্ধ নায়ক হেমচন্দ্রের ভূমিকা পরিগ্রহ করিয়া অভিনয় করিতেছে, তখন হেমচন্দ্রের মৃণালিনীর প্রতি যে অনুরাগ আমাদের মানসনয়নে প্রতিভাত হইয়া থাকে, তাহারই যে উদ্বোধ বা অনুভূতিবিশেষ, তাহাই কি রস বলিয়া অঙ্গীকৃত হয়? বাস্তবপক্ষে তাহা রস হইতে পারে না। কারণ, হেমচন্দ্রের মৃণালিনীর প্রতি যে অনুরাগ বা রতি, তাহা পরিমিত অর্থাৎ সীমাবদ্ধ অর্থাৎ সেই রতিতে হেমচন্দ্রের অহমিকা বা ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে, একের ব্যক্তিত্ব দ্বারা বিশেষিত যে মনোবৃত্তি তাহা কোন কালেই অপরের প্রত্যক্ষাত্মক অনুভবের বিষয় হইতে পারে না, তাহা অপরের অনুমানের বিষয় হইতে পারে বা শাব্দবোধের বিষয় হইতে পারে; কিন্তু কিছুতেই তাহা অপরের স্বগত সুখদুঃখাদির ন্যায় মানস-প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া আস্বাদ্য হইতে পারে না— ইহা কে অস্বীকার করিবে? পরিমিতভাবে অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের সহিত সম্বদ্ধভাবে যাহা প্রতীত হইয়া থাকে, এই প্রকার যে অনুরাগ, তাহা যাহার

মনোগত, সেই তাহার আস্বাদন বা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারে; অপরের নিকট তাহা আস্বাদ্য হইবে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। অভিনয়দর্শনকালে সামাজিকগণ কিন্তু রতি বা অনুরাগের মানস প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে এবং যখন এইরূপ মানস প্রত্যক্ষ হয়, তখনই তাহারা রসাস্বাদন করিয়া থাকে, ইহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং অভিনয়দর্শনকালে হেমচন্দ্রের মৃণালিনীর প্রতি অনুরাগের অনুভূতি যে রসপদার্থ হইতে পারে না, ইহা অবশ্য অঙ্গীকার্য্য।

লৌকিক রতি অলৌকিক রসাস্বাদের কারণ নহে

আর এক কথা এই যে, নায়ক বা নায়িকাগত যে অনুরাগ, তাহা লৌকিক রতি, সেই লৌকিক রতি যে আস্বাদনের বিষয় হয়, তাহা কখনও অলৌকিক আস্বাদন হইতে পারে না। রসাস্বাদ কিন্তু লৌকিক নহে, উহা লোকাতীত আস্বাদ, এই কারণে নায়কাদিগত লৌকিক রতির সামাজিকগণ কর্ত্তৃক যে আস্বাদ, তাহা অলৌকিক রসাস্বাদ হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। তাহার পর আরও দ্রষ্টব্য এই যে, নাটকে বা কাব্যে যাহাদের চরিত্র বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহাদের মনোগত যে অনুরাগ প্রভৃতি, তাহা নাট্যদর্শন বা কাব্যানুশীলনের পরিণতি নহে বা তাহার অনুকূল নহে, প্রত্যুত তাহা কাব্যানুশীলন বা নাট্যদর্শন হইতে যে প্রকার বৃত্তি মনে উদিত হয়, তাহার বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল। সুতরাং অভিনয়দর্শনে বা কাব্যানুশীলনে যে বৃত্তির স্ফুরণ হয়, তাহার সহিত ঐ সকল নায়ক-মনোবৃত্তির সামঞ্জস্য বা সারূপ্য কখনই সম্ভবপর নহে। এই কারণে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, অভিনয়দর্শনকারী বা কাব্যানুশীলনকারী সহৃদয়গণ নায়ক বা নায়িকার হৃদয়গত অনুরাগাদি ভাবনিচয়ের যথাযথভাবে আস্বাদন করিতে পারেন না এবং তাহাদের ঐরূপ আস্বাদনকে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর রস বলিয়া অঙ্গীকার করাও কিছুতেই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং অনুকার্য্য নায়ক বা নায়িকার রতি রসাস্বাদনের বিষয় হইবে, ইহা বলা যায় না।

অভিনেতার রতি রসাস্বাদের কারণ নহে

যে ব্যক্তি রঙ্গমঞ্চে রাম, জানকী প্রভৃতির ভূমিকা পরিগ্রহ করিয়া অভিনয় করিয়া থাকে, তাহার মনোগত অনুরাগ বা রতির আস্বাদনই রস হইয়া থাকে, ইহাও সম্ভবপর নহে। কারণ, নট শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা প্রসূত যে নৈপুণ্য,

তাহা দ্বারা তৎকালে রাম বা জানকী প্রভৃতি অনুকার্য্যগণের সমান বলিয়া সহৃদয়গণের নিকট প্রতীত হইয়া থাকে, এই মাত্র। তাই বলিয়া তাহার হৃদয়ে তৎকালে যে তাহার নিজের বা সামাজিকগণের রসাস্বাদনের অনুকূল কোন রতির আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহা নহে। কাব্যসৌন্দর্য্যপ্রভাবে যদি তাহার হৃদয়ে ঐরূপ রতি আবির্ভূত হয়, তাহা হইলে সে আর তখন নট-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না, সে তখন অন্যান্য সামাজিক সহৃদয়গণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে, এরূপ অবস্থায় সে নট থাকে না, অর্থাৎ রসাস্বাদকারী সভ্য হইয়া পড়ে। সভ্যগণের হৃদয়ে কি প্রকার রতির আবির্ভাব হয়, তাহারই অনুশীলন করা যাইতেছে, সুতরাং ইহা স্থির হইল যে, নটগত রতি যে আস্বাদ্য হইয়া রসরূপে পরিণত হয়, ইহা যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। এই কথাই আলঙ্কারিক বলিয়া থাকেন, যথা—

শিক্ষাভ্যাসাদিমাত্রেণ রাঘবাদেঃ স্বরূপতাম্।
দর্শয়ন্নর্ত্তকো নৈব রসস্যাস্বাদকো ভবেৎ॥

রতি সহৃদয়ের অন্তরস্থ

রসাস্বাদনের প্রধানভাবে বিষয়ীভূত যে রতি, তাহা যদি নায়ক বা নায়িকার মনোবৃত্তি বা অভিনেতার মনোবৃত্তি না হইল, তবে তাহা কাহার মনোবৃত্তি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইয়া আলঙ্কারিকগণ বলিয়া থাকেন যে, যে সকল সামাজিক রসাস্বাদন করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরই মনোবৃত্তি রূপ যে রতি, তাহাই তাঁহাদের দ্বারা যখন আস্বাদিত হয়, তখনই উহা রসরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

আলঙ্কারিক আচার্য্যগণের এই সিদ্ধান্ত বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তের অনুকূল যুক্তিনিবহের অনুশীলন একান্ত আবশ্যক; সুতরাং এক্ষণে তাহারই অবতারণা করিতে হইতেছে।

স্বগত রতির আস্বাদনে নাট্যের কি প্রয়োজন?

আপনার হৃদয়ে অনুরাগ প্রভৃতি ভাবনিচয়ের আস্বাদনই যদি রসাস্বাদন হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য রঙ্গালয়ে অর্থব্যয় করিয়া প্রবেশ করিবার আবশ্যকতা কি? এই প্রশ্ন সকলেরই মনে উদিত হইয়া থাকে। আত্মগত বৃত্তি যখনই উদিত হয়, তখনই আমরা তাহার আস্বাদন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া থাকি, ইহা কে অস্বীকার করিবে? আমার পুত্রের প্রতি স্নে

স্নেহ, পত্নীর প্রতি যে ভালবাসা, শত্রুর প্রতি যে বিদ্বেষ, তাহা সকলই আমার মানসপ্রত্যক্ষ-বেদ্য, ঐ সকল বৃত্তি যখনই উৎপন্ন হয়, তখনই আমরা তাহাদের মানসপ্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, এই ঘটনা আমাদের কি জাগরণ, কি স্বপ্ন, এই দুই অবস্থায় অনুক্ষণই হইয়া থাকে, কেবল সুষুপ্তি অবস্থাতেই ইহা হয় না। কারণ, সে সময়ে আমাদের কোনপ্রকার মনোবৃত্তিই উদিত হয় না, ফলে ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, নিজ নিজ কাম, ক্রোধ, অনুরাগ প্রভৃতি মনোবৃত্তির আস্বাদনই যদি রসাস্বাদন হয়, তাহা হইলে সে রসাস্বাদনের জন্য কাব্যানুশীলন বা অভিনয়-দর্শন প্রভৃতি কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপার কেন সহৃদয় মানবগণ করিয়া থাকে? এই প্রশ্নের সদুত্তর আলঙ্কারিক আচার্য্যগণ যতক্ষণ না বুঝাইতে পারিবেন, ততক্ষণ তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত অর্থাৎ সামাজিকগণের আত্মগত রতি প্রভৃতি ভাবের আস্বাদনই রসাস্বাদন, এইরূপ মত কিছুতেই মানিয়া লইতে পারা যায় না। এই জটিল প্রশ্নের কিরূপ উত্তর আলঙ্কারিকগণ দিয়া থাকেন, এক্ষণে তাহাই দেখা যাক্। তাঁহারা বলেন, আত্মরতির আস্বাদনই যে রসাস্বাদন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই আস্বাদন সর্ব্বদা যে আস্বাদন আমরা করিয়া থাকি, তাহা নহে, কিন্তু তাহা অলৌকিক আস্বাদন। আমরা ব্যবহার-দশাতে বা স্বপ্নে যে আত্মগত রতি প্রভৃতি ভাবের আস্বাদন করিয়া থাকি, সে আস্বাদন লৌকিক আস্বাদন, এই কারণে ঐ লৌকিক আস্বাদনকে রসাস্বাদ বলা যায় না। কিন্তু কাব্য ও নাটকাদির অনুশীলনে বা দর্শনে আমরা আত্মগত রতি প্রভৃতি ভাবনিবহের যে আস্বাদন কয়িয়া থাকি, তাহা যেহেতু লৌকিক আস্বাদনের অন্তর্ভুক্ত নহে, এই কারণে তাহাই রসাস্বাদন বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

রস—অলৌকিক অনুভূতি

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য উপস্থিত হইয়া থাকে, এ অলৌকিক শব্দের অর্থ কি? আমরা রসাস্বাদনের জন্য যখন রঙ্গশালায় প্রবেশ করি, তখন কি আমরা লৌকিকতা পরিহার করিয়া বসি? যে চক্ষুর দ্বারা আমরা রঙ্গশালার বাহিরের দৃশ্যবস্তু বিলোকন করিয়া থাকি, যে কর্ণের দ্বারা আমরা বাহিরের শব্দ শ্রবণ করিয়া থাকি, সেই চক্ষু ও সেই কর্ণ বাহিরে রাখিয়া রঙ্গশালায় প্রবেশ পূর্ব্বক আমরা নূতন চক্ষু বা নূতন কর্ণ লাভ করি না; বাহিরে যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি তত্তদিন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করিয়া থাকি, রঙ্গশালার অভ্যন্তরে সেই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি বিষয় ছাড়া স্বর্গরাজ্যের কোন

অলৌকিক বিষয় আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয় না। আমরা বাহিরেও যে ভাবের মানুষ হইয়া ব্যবহার করিয়া থাকি, রঙ্গশালার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পর সে ভাবের মানুষই ত আমরা থাকি, নিশ্চয়ই স্বর্গীয় মানব হইয়া উঠি না। বাহিরের আমি ও আমার সবই যদি লৌকিক হয়, তবে রঙ্গশালার অন্তর্গত আমি বা আমার যাহা কিছু তাহা অলৌকিক হইয়া যাইবে, ইহাই যদি আলঙ্কারিকগণের বক্তব্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের কথার উপর আমরা কিরূপে শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে পারি? এইরূপ প্রশ্নের আলঙ্কারিকগণ কি উত্তর দিয়া থাকেন, এইবার তাহারই অবতারণা করা যাইতেছে।

(১৪)

সত্ত্বোদ্রেকে আমিত্ব বিস্মৃতি

লৌকিক অনুভাব, বিভাব ও ব্যভিচারী ভাব—অভিনয়দর্শন বা কাব্যানুশীলনের সময় সামাজিকগণের মানসদর্পণে প্রতিফলিত হইয়া রসাস্বাদ করাইয়া থাকে, ইহাই হইল আলঙ্কারিকগণের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিতে হইলে প্রথমতঃ ইহা সকলকেই মানিয়া লইতে হইবে, কবির ভাষায় এমন একটি শক্তি নিহিত আছে, যাহার প্রভাবে সহৃদয়রাজ্যে এমন একটি অবস্থা আসিয়া পড়ে, যাহার যথাযথ বর্ণন বা প্রকাশ ভাষার সাহায্যে হইতে পারে না। প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তির তাহা স্বানুভব-সংবেদ্য, লোকপ্রসিদ্ধ ব্যবহারিক অহং-মমকার তখন একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ব্যক্তিবিশ্রান্ত মনুষ্যত্ব তখন সমষ্টিবিশ্রান্ত বা বিশ্বজনীন মনুষ্যত্বের মধ্যে আত্মহারা হইয়া মিশিয়া যায়, সামাজিকগণের এই প্রকার মানসিক অবস্থাকেই আলঙ্কারিকগণ 'সত্ত্বোদ্রেক' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই সত্ত্বোদ্রেক না হইলে রসাস্বাদ হইবার সম্ভাবনা নাই, এবং এ সংসারে একমাত্র কবিভারতীই এই সত্ত্বোদ্রেককে সামাজিক হৃদয়ে সমুৎপন্ন করিতে পারে। অপরের ক্লেশ দেখিয়া, ভয়ঙ্কর বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়া সাধারণতঃ মানব-হৃদয়ে যে সমবেদনা হইয়া থাকে এবং তাহার সঙ্গে নয়নে অশ্রুপাত হয় বা করুণায় প্রাণ গলিয়া যায়, সে সমবেদনা কিন্তু সত্ত্বোদ্রেকের কার্য্য নহে। কারণ, তাহাতে আত্ম-পর ভাবের বিস্মৃতি হয় না, মানুষ নিজের বিলক্ষণ ব্যক্তিত্বের সঙ্কীর্ণতার হস্ত হইতে তখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে না; কিন্তু কবিভারতীর কোমল স্পর্শে

হৃদয়-রাজ্যের সকল অংশকে আলোড়িত করিয়া এই সত্ত্বোদ্রেকের মধুর অনুভূতি যখন পরিচ্ছিন্ন অহংভাবকে কিয়ৎকালের জন্য বিধ্বস্ত করিয়া সকল দেহে সকল ইন্দ্রিয়ে এক অননুভূতপূর্ব্ব নূতন প্রেরণা বা স্পন্দন জাগাইয়া দেয়, তখন এই মানুষই দিব্য মানুষ হইয়া পড়ে। শোক, দুঃখ, আধি, ব্যাধি, রাগ, দ্বেষ, আমিত্ব, তুমিত্ব প্রভৃতি চিরাভ্যস্ত লৌকিক ভাবনিচয়কে বিস্মৃতির গাঢ় আবরণে যখন ঢাকিয়া ফেলে, তখনই মানব রসাস্বাদে অধিকারী হইয়া থাকে।

নায়কের সত্তা বিস্মরণ

তাই এই সত্ত্বোদ্রেকের পরিচয় প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন—

"পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে॥"

সামাজিকগণের তখন জ্ঞান থাকে না যে, ইহা পরের, অথবা ইহা পরের নহে, সে তখন ইহাও বুঝে না—ইহা আমার, অথবা ইহা আমার নহে। অহন্তা মমতা পরকীয়তা বা মদীয়তা এই প্রকার পরিচ্ছিন্ন বিষয়গ্রাহী বোধ তাহার তখন বিলুপ্ত হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাহার তখন যে বোধের উদয় হয়, তাহার স্বরূপ কি, তাহার পরিচয় দিতে যাইয়া কাব্যপ্রকাশকার বলিতেছেন—

"রাম এবায়ং অয়মেব রাম ইতি, ন রামোঽয়ং ইত্যৌত্তরকালিকে বাধে, রামোঽয়মিতি রামঃ স্যাদ্বা ন বায়মিতি রামসদৃশোঽয়মিতি চ সম্যঙ্‌মিথ্যাসংশয়-সাদৃশ্য-প্রতীতিভ্যো বিলক্ষণয়া চিত্রতুরগাদিন্যায়েন রামোঽয়মিতি প্রতিপত্ত্যা গ্রাহ্যে নটে—"

নটে নায়কবুদ্ধি সাদৃশ্য-পার্থক্যের মিশ্রণ

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অভিনয় দর্শন করিতে করিতে সহৃদয় সভ্যগণের অভিনেতা নটের কায়িক, বাচিক প্রভৃতি অভিনয় হইতে তাহার প্রতি যে প্রকার মনোবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহা এই ব্যক্তিই রাম, রামই এই ব্যক্তি এইরূপ যে যথার্থ প্রত্যয়, তাহা বলিতে পারা যায় না। যাহার পরে বাধনিশ্চয় অর্থাৎ ইহা রজত নহে, এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে, এইরূপ যে শুক্তিকে অবলম্বন করিয়া 'ইহা রজত' এইরূপ ভ্রান্তি নিশ্চয় লোকের হইয়া থাকে, সামাজিকগণের নটকে দেখিয়া, এই রাম, এইরূপ যে জ্ঞান হয়, তাহা কিন্তু ঠিক উক্ত রজতভ্রান্তির ন্যায়ও হয় না। 'এ কি রাম বা অন্য কেহ' এইরূপ জ্ঞানও

হয় না অথবা 'এই ব্যক্তি ঠিক রামের ন্যায়', এরূপ বোধও তাহা নহে—অর্থাৎ সামাজিকগণের তৎকালে নটদর্শনে যে 'এই রাম' এইরূপ জ্ঞান হয়, তাহা যথার্থ জ্ঞান নহে, তাহাতে ভ্রান্তিজ্ঞানের সাধর্ম্ম্যও থাকে না, তাহা সংশয়ও নহে অথচ তাহা সাদৃশ্য-বুদ্ধিও নহে। তবে তাহা কি?—যেমন অসাধারণ শিল্পীর বিরচিত চিত্রতুরগকে হঠাৎ অতর্কিতভাবে দর্শন করিলে, ইহা তুরগ, এইরূপ বিস্ময়-বিমিশ্রিত বুদ্ধি আমাদিগের কোন সময়ে হয়, ইহা সেই জাতীয় এক প্রকার জ্ঞান; এ জ্ঞান যেমন বাধজ্ঞানের পূর্ব্বভাবী হইলেও এক অননুভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ের সহিত জড়িত, সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকিলেও যেমন ইহাতে ক্ষণকালের জন্য সাদৃশ্যের অনুভূতি হয় না, ইহা তুরগ এই বোধ বিদ্যমান থাকিয়াও শিল্পপ্রভাবপ্রসূত সৌন্দর্য্যবলে ইহার যথার্থরূপতার ভাব যেমন আপনা আপনিই ভাসিয়া উঠে, অভিনয়-দর্শনকালে শ্রীরামচন্দ্রের ভূমিকা পরিগ্রহকারী নটের প্রতি যে আমাদের রামবুদ্ধি, তাহাও এই জাতীয় হইয়া থাকে।

নায়কের পরিবেশে অবস্থান

এইরূপ ভাবে যে মনোবৃত্তি, তাহাও পূর্ব্বকথিত সত্ত্বোদ্রেকের পরিণতি। শুধু তাহাই নহে, এই ভাবে রামদর্শন করিতে করিতে সামাজিকের অন্তঃকরণে রামের সহিত সম্বদ্ধ যে সকল জড় বা চেতন বস্তু ইতিহাসে বা কবিতায় বর্ণিত আছে, সেই সকল বস্তুই তখন একে একে সামাজিকের সত্ত্বোদ্রেক-বিগলিত মানসপটে কবিকল্পনার প্রভাবসম্পন্ন শক্তিতুলিকার সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে অঙ্কিত হইতে আরম্ভ করে, তখন সহৃদয় সামাজিক যে স্থানে বিদ্যমান থাকে, সে স্থান অযোধ্যা, চিত্রকুট বা দণ্ডকারণ্য হইয়া উঠে। রামহৃদয়ের সৌজন্য, সৌভ্রাত্র, পিতৃমাতৃভক্তি, দাম্পত্য প্রীতি, সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগশীলতা, সাহস, ধৈর্য্য, ক্ষমা, করুণা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার মানস-নেত্রের সম্মুখে নানা বর্ণে রঞ্জিত চিত্রের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। সে তখন আপনাকে ভুলিয়া যায়, আত্মীয়কে ভুলিয়া যায়, ব্যক্তিত্বের সঙ্কীর্ণ সীমার সকল বন্ধন তাহার ছিন্ন হইয়া যায়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহার নিকটে রাম ও রামসম্বন্ধী ভাবনিচয়ে পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে। স্বহৃদয়গত বৃত্তিনিচয়ের তাৎকালিক আস্বাদও তাহার স্বগত বলিয়া আর মনে হয় না। তাহার নিকটে সে আস্বাদ যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণুতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কোন

বস্তুই তাহা হইতে পৃথক্ নহে, তাহার আস্বাদই বিশ্বমানবের আস্বাদ, তাহাতে দেশগত, ব্যক্তিগত বা কালগত সকল প্রকার পরিচ্ছেদ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এক অখণ্ড চিদানন্দময় সত্তাই যেন আস্বাদের রূপ ধরিয়া, আস্বাদ্য কোটির অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, এই জাতীয় আস্বাদ হইল রসাস্বাদ। ইহা সর্ব্বথা অলৌকিক, অলৌকিক কবিপ্রতিভার ইহা সহৃদয়-জনবেদ্য অলৌকিক সুখময় পরিণতি, ইহাই মানব-জীবনের পরম লক্ষ্য।

রসাস্বাদ অলৌকিক অনুভূতি

তাই আলঙ্কারিকশ্রেষ্ঠ ইহার স্বরূপবর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"চর্ব্ব্যমাণতৈকপ্রাণঃ বিভাবাদিজীবিতাবধিঃ পানকরসন্যায়েন চর্ব্ব্যমাণঃ পুর ইব পরিস্ফুরন্ হৃদয়মিব প্রবিশন্ সর্ব্বাঙ্গীণমিবালিঙ্গন্ অন্যৎ সর্ব্বমিব তিরোদধদ্ ব্রহ্মাস্বাদমিবানুভাবয়ন্ অলৌকিকচমৎকারকারী শৃঙ্গারাদিকো রসঃ।"

শৃঙ্গার প্রভৃতি নববিধ রসের ইহাই হইল স্বরূপ যে, যে পর্য্যন্ত এই অলৌকিক আস্বাদ থাকে, ইহা সেই পর্য্যন্তই থাকে, এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, এই বিলক্ষণ আস্বাদই ইহার একমাত্র প্রাণ। যদিও ইহাতে 'অনুভাব', 'বিভাব', 'সঞ্চারী' 'সাত্ত্বিক' প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতির ভাবসমূহ আস্বাদিত হয়, কিন্তু তাই বলিয়া ঐ সকল বিলক্ষণ ভাব যে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে আস্বাদিত হয়, তাহা নহে; প্রত্যুত সকল বিলক্ষণভাব যেন মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া একই আস্বাদের বিষয় হইয়া থাকে। যেমন মিশরি, মধু, শর্করা, মরিচ, গোলাপজল, লেবুর রস, কর্পূর প্রভৃতি মিলিয়া একসরবৎ হইয়া যায়, তাহার আস্বাদ যেমন সরবতের উপাদান মিশরি প্রভৃতি প্রত্যেক রসের আস্বাদ অথচ ঐ আস্বাদে মিশরি প্রভৃতির পৃথক্‌ভাবে আস্বাদ হয় না, সব মিশিয়া যেমন এক অখণ্ড বিচিত্র আনন্দময় আস্বাদে পরিণত হয়, সেইরূপই ইহাও নানাবিধ ভাবনিচয়ের এক অখণ্ড অনির্ব্বচনীয় আস্বাদই হইয়া থাকে। ইহা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বাহিরে চক্ষুর সম্মুখে খেলা করিতে আরম্ভ করে। শুধু যে বাহিরেই খেলা করে, তাহা নহে, ইহা বাহিরে খেলা করে, আবার সেই সঙ্গে অন্তঃকরণেরও দুর্ভেদ্য অন্দরে জোর করিয়া ঢুকিয়া পড়িয়া নাচিতে আরম্ভ করে, আবার সেই সময়েই যেন ইহা নিজের সুধামাখা শীতল স্পর্শে সামাজিকের প্রত্যেক অঙ্গকে স্নিগ্ধ করিয়া তুলে। বিশ্বের অন্য সকল পদার্থকে ইহা তৎকালে তিরোহিত করিয়া দেয়, সেই যোগিজনবেদ্য অখণ্ড ব্রহ্মানন্দকে

ইহা যেন অনুভূতির বিষয় করিয়া তুলে, জীবনে পূর্ব্বে কখনও যাহা অনুভূত হয় নাই, এমন বচনাতীত অলৌকিক চমৎকার বা বিস্ময়কে ইহা প্রতিক্ষণে উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহাই হইতেছে প্রকৃত রসের সহৃদয়জনভোগ্য অলৌকিক স্বভাব।

তবে পারমার্থিক রস কেন ?

এই রসাস্বাদ বিশুদ্ধ। কারণ, ইহা রাগদ্বেষ বা অহমিকার স্পর্শরূপ অশুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণভাবে বিনির্মুক্ত; সুতরাং মনুষ্যজীবনের ইহাই একমাত্র সেব্য ও নিঃসঙ্কোচে উপভোগ্য। ইহাই হইল আলঙ্কারিক আচার্য্যগণের রস বিষয়ে সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে পারমার্থিক রস বলিয়া আর পৃথক্ রসের অনুসন্ধান করিবার আবশ্যকতা কি আছে? বৈষ্ণব ভক্তিবাদের আচার্য্যগণ এই আনন্দময় রস ব্যতিরেকে আর কোন্ নূতন রসের সন্ধান দিতে পারেন? আলঙ্কারিক রসতত্ত্ব-ব্যাখ্যাতৃগণের এই প্রশ্নের সমাধান করিতে যাইয়া প্রেমভক্তিরূপ পরমার্থ-রসের ব্যাখ্যাতা ভক্তিবাদের আচার্য্যগণ কি বলিয়া থাকেন, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

সাময়িক আমিত্বের প্রসার

সুকাব্যের অনুশীলনে মহাকবি-বিরচিত নাটকাদির সুকৌশলময় অভিনয় দর্শনে যে বিলক্ষণ সুখের আস্বাদ হয়, সে আস্বাদের সময় ক্ষুদ্র অহংতা ও মমতার অচিরকালস্থায়ী তিরোভাবে মানব প্রসারিত অহন্তার আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়, ইহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু এই আনন্দময় আস্বাদনই মানবের পরমার্থ, ইহা বৈষ্ণবাচার্য্যগণ—শুধু বৈষ্ণবাচার্য্যগণই বা কেন, কোন দার্শনিক আচার্য্যও স্বীকার করেন না। তাঁহাদের এই অস্বীকার নিজমতের প্রতি যুক্তিনিরপেক্ষ শ্রদ্ধার উপরই প্রতিষ্ঠিত, তাহা বলিতে পারা যায় না। পরন্তু তাহার মূলে যে সুপ্রতিষ্ঠিত যুক্তি ও শাস্ত্রীয় বহু প্রমাণ বিদ্যমান আছে, তাহা বিবেক-সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই স্বীকার্য্য।

ত্রিবিধ সুখ

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, এই যে কাব্যরসাত্মক আনন্দাস্বাদ, ইহা কোন্ জাতীয় আনন্দের আস্বাদ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় আমরা তিন প্রকার সুখ বা আনন্দের পরিচয় পাইয়া থাকি। যথা—

"সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি॥
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্॥
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্॥"

হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে ত্রিবিধ সুখের স্বরূপ আমার নিকট শ্রবণ কর। অভ্যাসবশতঃ যাহাতে আসক্তি জন্মিয়া থাকে, যাহার আস্বাদন লাভ করিলে সকল প্রকার দুঃখের প্রশমন হয়, প্রথমে যাহা বিষের ন্যায় প্রতীত হয়, পরিণামে যাহা অমৃত-তুল্য হয়, আত্মবুদ্ধিপ্রসাদ হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, সেই সুখই সাত্ত্বিক বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কামনার বিষয় ভোগ্য বস্তুনিচয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সংপ্রযুক্ত হইলে যাহা আবির্ভূত হয়, প্রথমে যাহা অমৃত তুল্য বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু পরিণামে যাহা বিষোপম হইয়া উঠে, সেই সুখই রাজস সুখ। যাহার প্রথমে ও শেষে আত্মাতে মূঢ়তার উদয় হয়, নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, সেই সুখ তামস হইয়া থাকে।

সাহিত্য রসাস্বাদ সাত্ত্বিক নহে

এই ত্রিবিধ সুখের মধ্যে কাব্যানুশীলনজনিত রসাত্মক যে সুখ, তাহা সাত্ত্বিক সুখের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। কারণ, যাহা অগ্রে কোন সহৃদয়ের পক্ষেই বিষের ন্যায় প্রতীত হয় না, সে সুখের আস্বাদন করিবার জন্য দীর্ঘকালীন অভ্যাসের আবশ্যকতা নাই, কিঞ্চিৎ দ্বারদক্ষিণা সংগ্রহ করিতে পারিলেই বা কোন প্রকারে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতে পারিলেই তাহা অনায়াসে লাভ করিতে পারা যায়। তাহার পর আরও দ্রষ্টব্য এই যে, এই উত্তেজনাবহুল কাব্য-রসাস্বাদের সহিত আত্মবুদ্ধির শান্তিময় প্রসাদের সহিত কোন সম্পর্কই পরিদৃষ্ট হয় না, এই সকল সুখ যে সাত্ত্বিক সুখ নহে, তাহা বুঝিবার জন্য বিশেষ পরিশ্রমের আবশ্যকতা নাই।

তামসও নহে কিন্তু রাজস

ইহা নিদ্রালস্যপ্রমাদ হইতে উৎপন্ন নহে, এই কারণে ইহাকে তামস সুখও বলা যায় না। কিন্তু রাজস সুখের সকল প্রকার ধর্ম্মই ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহা যে রাজস সুখ, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। ইহাতে অভীষ্টবিষয়-নিবহের ইন্দ্রিয়ের যোগ অপরিহার্য্য। এই সুখের আস্বাদন করিতে প্রবৃত্ত বহু ব্যক্তিই পরিণামে সংসারকে বিষময় বলিয়া বুঝিয়া থাকে, তাহা বর্ত্তমান ভারতীয় রঙ্গশালা-নিবহের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত অনেক ভদ্রলোকই বুঝিয়া থাকেন। এই সকল কারণে এই রসাস্বাদরূপ আনন্দ যে রাজস সুখ, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়; সুতরাং এই সুখের রাজসত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য এখানে অধিক আর কিছু বলিবার অপেক্ষা আছে বলিয়া মনে হয় না।

ভাগবত লীলা পরমার্থরস

রসাস্বাদরূপ সুখভোগে বৈচিত্র্য আছে, ইহা সত্য; কিন্তু সংসারীর পক্ষে, বিষয়াসক্ত মানবের পক্ষে কোন্ সুখের এই ব্যক্তিগত বৈলক্ষণ্য নাই? বৈষয়িক সুখমাত্রেই উত্তেজনা আছে, চিত্তবিক্ষেপ আছে এবং অবসানে অবসাদও আছে—ইহা কে না বুঝে? রসাস্বাদরূপ আনন্দভোগে কারণবৈচিত্র্য আছে, উত্তেজনার আধিক্য আছে, আকর্ষণের বহুলতা আছে, ইহা কে অস্বীকার করিতেছে? কিন্তু তাই বলিয়া ইহা যে মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য বা পরমপুরুষার্থ হইবে, তাহা বুঝিব কেমনে? ইহাতে নিরবধি প্রসাদ নাই, শাশ্বতী শান্তি নাই, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই; সুতরাং অন্যান্য বৈষয়িক সুখ হইতে যে ইহা বিলক্ষণ নহে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ ত দেখিতে পাওয়া যায় না। এইজন্যই এইরূপ লৌকিক কবিতা-সম্বদ্ধ বা অভিনয়দর্শন-প্রসূত রস যে উপনিষৎপ্রতিপাদ্য রস নহে, ইহা ব্যবহারিক রস হইলেও পারমার্থিক রসলক্ষণাক্রান্ত নহে, ইহাই হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মনের কথা। এ কথা তাঁহাদের ভাবাবেশবিহ্বল মনের নিছক কল্পনা হইতে প্রসূত নহে, তত্ত্বদর্শী মহাভাগবত ভগবান্ বেদব্যাসও ইহাই শ্রীমদ্‌ভাগবতে স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎ পবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিকক্ষয়াঃ॥

তদ্বাগ্ বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোহঙ্কিতানি যৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥

যে বাক্যে রসভাব ও অলঙ্কারসমন্বিত সুন্দর পদনিচয় প্রযুক্ত হয় অথচ যাহা শ্রীভগবান্ হরির লীলাময় ত্রিভুবনপাবন যশের প্রতিপাদক নহে, তাহা অমেধ্যসেবী কাকপ্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণেরই সেবিত হইবার যোগ্য তীর্থ-সদৃশ হইয়া থাকে, ইহাই মহাজনগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কারণ, মানস-সরোবিহারী হংসকুলের ন্যায় বিশুদ্ধ ব্রহ্মসংস্থ সাধু পুরুষগণের ঐরূপ বাক্যরূপ বায়সতীর্থ কখনই প্রীতিকর হয় না।

অপর পক্ষে যে কাব্যে ছন্দঃ নাই, অলঙ্কার নাই বা বিচিত্র পদবিন্যাসও নাই, অথচ যাহার প্রতিপদবিন্যাসে প্রতিশ্লোকে অবিনাশী অসীম ও সর্ব্বাত্মভূত শ্রীভগবানের বিচিত্র জগৎপাবন কীর্ত্তি-সমুদ্ভাসিত নাম-নিবহ বিরাজমান থাকে, সেই বাক্যই সকল প্রাণীর সর্ব্ববিধ পাপ ধ্বংস করিয়া থাকে ; সাধুপুরুষগণ সেই কাব্যের ব্যাখ্যা করেন, তাহাই মুক্তকণ্ঠে উচ্চস্বরে গান করিয়া থাকেন এবং তাহাই আদরের সহিত শুনিয়া থাকেন।

কবিদৃষ্টি ও পণ্ডিত দৃষ্টির ন্যূনতা

ভক্তিরূপ পরমার্থরসের অন্য সকল প্রকার লৌকিক কাব্যসমুদ্ভূত রস হইতে যে পরমোৎকর্ষ আছে, তাহা যে কেবল ভক্তিবাদের আচার্য্যগণেরই সম্মত, তাহা নহে, অলঙ্কারশাস্ত্রের পরমাচার্য্য আনন্দবর্দ্ধনও তাহা স্বকৃত ধ্বন্যালোক গ্রন্থে স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"যা ব্যাপারবতী রসান্ রসয়িতুং কাচিৎ কবীনাং নবা
দৃষ্টির্যা পরিনিষ্ঠিতার্থ-বিষয়োন্মেষা চ বৈপশ্চিতী।
তে দ্বে অপ্যবলম্ব্য বিশ্বমনিশং নির্ব্বর্ণয়ন্তো বয়ং
শ্রান্তা নৈব চ লব্ধমব্ধিশয়ন ত্বদ্ভক্তিতুল্যং সুখম্॥"

শৃঙ্গার প্রভৃতি নয়প্রকার রসের আস্বাদন করাইবার সামর্থ্য যাহাতে আছে, কবিগণের এইরূপ যে নবনবোন্মেষশালিনী দৃষ্টি, অথবা পরমার্থ-ব্রহ্মতত্ত্বের সমুন্মেষসমর্থ যে বৈপশ্চিতী (তত্ত্বদর্শী মহাত্মগণের) দৃষ্টি, সেই উভয়বিধ দৃষ্টির সাহায্যে বহুকাল ধরিয়া আমরা সংসারকে দেখিতেছি। হে সাগরশায়িন্ হরে! এইরূপ দেখিতে দেখিতে আমরা পরিশ্রান্ত হইয়াই পড়িয়াছি, কিন্তু এই দ্বিবিধ দৃষ্টির সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া দীর্ঘজীবনব্যাপী অনুসন্ধান

করিতে করিতে তোমার প্রতি ভক্তির ন্যায় সুখের উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

কবিদৃষ্টি বা পণ্ডিতদৃষ্টি এই দ্বিবিধ দৃষ্টির সাহায্যে যাহাকে পাওয়া যায় না, সেই পরমার্থরসস্বরূপ ভক্তিসুখের আস্বাদনের জন্য কোনপ্রকার প্রাকৃত বিভাব, অনুভাব, উদ্দীপনভাব বা সঞ্চারী ভাব যে পর্য্যাপ্ত নহে, তাহা এই শ্লোকটির দ্বারা আচার্য্য আনন্দবর্দ্ধন অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

(১৫)

স্থায়ী ভাব মৌলিক মনোবৃত্তি

যে সকল মনোবৃত্তির মিলিতভাবে আস্বাদন রসরূপে পরিণত হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে প্রধান বা ভিত্তিস্থানীয় যে মনোবৃত্তি, তাহাকেই আলঙ্কারিকগণ স্থায়ী ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই স্থায়ী ভাবের লক্ষণ অলঙ্কার-শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ।
আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ীতি সম্মতঃ॥"

(সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ)

অনুকূলই হউক বা প্রতিকূলই হউক, কোন আস্বাদ্যমান ভাব যাহাকে তিরোহিত করিতে সমর্থ হয় না, রসাস্বাদরূপ অমৃতবল্লীর অঙ্কুরসমূহের যাহা মূলস্থানীয়, সেই মনোবৃত্তিবিশেষই স্থায়ী ভাব বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে।

রতির স্বরূপ

আদিরসের স্থায়ী ভাব রতি, এই রতি বলিলে কীদৃশ মনোবৃত্তি বুঝা যায়, তাহাও সাহিত্য-দর্পণকার বলিয়াছেন; যথা—

"রতির্মনোঽনুকূলেঽর্থে মনসঃ প্রবণায়িতম্।"

যে বস্তু মনের অনুকূল অর্থাৎ মন যাহাকে তৃপ্তির সাধন বলিয়া বুঝে, সেই বস্তুর প্রতি মনের যে উৎকট আবেগ বা অনুরাগ, তাহাকে রতি বলা যায়। স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের অথবা পুরুষের প্রতি স্ত্রীলোকের এইরূপ যে মনোবৃত্তি, তাহাই আলঙ্কারিকগণের মতে রতি শব্দের মুখ্য অর্থ।

এই রতি বিদ্যমান থাকিলে, যাহার প্রতি এই রতি থাকে, সে নিকটে না

থাকিলে তাহাকে দেখিবার জন্য বা পাইবার জন্য উৎকট অভিলাষ, তাহার জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা, তাহার প্রাপ্তির প্রতি যাহা কিছু অন্তরায়—তাহার প্রতি তীব্র বিদ্বেষ, তাহার জন্য প্রবল চিন্তা, তাহাকে না পাইলে দুর্ব্বিষহ অবসাদ, তাহার জন্য আবেগ, দৈন্য, সন্তত স্মৃতি, তাহাকে পাছে হারাই—এই ভয়, কখনও বা তাহার প্রতি ক্রোধ, এই প্রকার মনোবৃত্তিসমূহ কখনও পৃথক্‌ভাবে কখনও বা মিলিতভাবে আবির্ভূত হইয়া থাকে।

অনুকূল ও প্রতিকূল উদ্দীপক

যে ভাবেই ইহারা উদিত হউক না কেন, কিন্তু উদিত হইয়া সেই অনুরাগ বা রতিকে ইহারা তিরোহিত বা গুণীভূত করিতে সমর্থ হয় না, প্রত্যুত নিজ নিজ আস্বাদন দ্বারা ইহারা সেই রতির উৎকর্ষ বা আস্বাদ-প্রকর্ষ উৎপাদন করিয়া থাকে। এই সকল মনোবৃত্তির মধ্যে কতকগুলি হয় ত রতির অনুকূলভাবে আবির্ভূত হয়, আবার কোন কোন সময়ে কতকগুলি সেই রতির প্রতিকূল বলিয়া মনে হয়। চিন্তা, উৎকণ্ঠা, বিষাদ, আবেগ, দৈন্য প্রভৃতি অনুকূল ভাবের মধ্যে পরিগণিত; অন্য দিকে ক্রোধ, উপেক্ষা, বিদ্বেষ, উগ্রতা প্রভৃতি প্রতিকূল-ভাবের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। অনুকূলই হউক বা প্রতিকূলই হউক, কোন ভাবই কিন্তু এই অনুরাগ বা রতির মূলোচ্ছেদে সমর্থ হয় না; উহার আস্বাদনকে ম্লান বা পরিভূত করিতে সমর্থ হয় না; প্রত্যুত তাহার আস্বাদনকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলে, আরও ঘনীভূত করিয়া দেয়। অনুকূল ভাবনিচয় জাজ্বল্যমান অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত ঘৃতের ন্যায় অথবা সন্ধুক্ষণার্থ ব্যবহৃত দণ্ডের ন্যায় প্রকাশ-বৃদ্ধির প্রতি কারণই হইয়া থাকে, সেইরূপ অনুকূল বা প্রতিকূল মনোবৃত্তিনিচয় অভিব্যক্ত হইয়া স্থায়ী রতিভাবের ঔজ্জ্বল্য ও পরিপুষ্টিরই কারণ হইয়া থাকে।

স্থায়ী ভাব মালার অন্তরে সূত্রের মত

তাই আলঙ্কারিকগণ বলিয়া থাকেন—

"স্রকৃসূত্রবৃত্ত্যা ভাবানামন্যেষামনুগামুকঃ।
ন তিরোধীয়তে স্থায়ী তৈরসৌ পরিপুষ্যতে॥"

(সাহিত্যদর্পণ, রস-পরিচ্ছেদ)

নানাবর্ণের পুষ্পগ্রথিত মালায় সূত্রের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবনিচয়ের সহিত অনুগত যে স্থায়ী ভাব, তাহা ঐ সকল বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ ভাবনিচয়ের দ্বারা

তিরোহিত হয় না, প্রত্যুত পুষ্টই হইয়া থাকে। অর্থাৎ মালাকার যখন নানা পুষ্পের দ্বারা মনের মত মালা গাঁথিতে থাকে, তখন প্রত্যেক পুষ্পকে সন্নিবেশিত করিতে করিতে সূত্রকেই ধরিয়া থাকে, তাহার নেত্র ও অন্তঃকরণ প্রতি পুষ্পগ্রথনে সেই সূত্রেই আকৃষ্ট থাকে, সেইরূপ রসাস্বাদকালে প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন ভাবনিচয়ের অনুভূতি এই স্থায়ী ভাব বা অনুরাগের অনুভূতি দ্বারা অনুস্যূত থাকে। উদাহরণস্বরূপ মহাকবি ভবভূতির একটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত হইতে পারে—

ক্ষণিক বিস্মৃতিতে রতির পরিপুষ্টি

"অস্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভবস্তন্মার্গদত্তেক্ষণঃ
সা হংসৈঃ কৃতকৌতুকা চিরমভূদ্ গোদাবরীরোধসি।
আয়ান্ত্যা পরিদুর্ম্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্য বদ্ধস্তয়া
কাতর্য্যাদরবিন্দকুট্মলনিভো মুগ্ধঃ প্রণামাঞ্জলিঃ॥"

(উত্তরচরিত ৩য় অঙ্ক)

দণ্ডকারণ্যে বিরহব্যাকুল শ্রীরামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া শ্রীজানকীর অরণ্য-বাসসহচরী বনদেবতা বাসন্তী বলিতেছেন—"রামভদ্র! মনে পড়ে কি? এই সেই লতা-গৃহ, একদিন তুমি একাকী তাঁহার পথের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিলে, জানকী গোদাবরীতীরে বিহরণশীল হংসকুলের দিকে আকৃষ্ট-দৃষ্টি হইয়া কৌতুহল বশতঃ তুমি যে তাঁহার পথ চাহিয়া বসিয়া আছ, তাহা ভুলিয়া গিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি চমক ভাঙ্গিয়া যাইবার পর তাড়াতাড়ি লতাগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, ফিরিবার সময়ে তোমার সেই ঔৎসুক্য ও অবসাদভরা কাতর চক্ষুর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল, তখনই তাঁহার নয়নে কাতর ভাবের মলিনিমা প্রতিভাত হইল—আর কখনও এমন গুরুতর অপরাধ আমি করিব না, আমাকে ক্ষমা কর—ইহাই বুঝাইবার জন্য বিকাশোন্মুখ মনোহর অরবিন্দ-কলিকার ন্যায় দুই করে অঞ্জলি বাঁধিয়া তোমাকে প্রণাম করিয়াছিলেন। রামভদ্র! মনে পড়ে ত, কি সুন্দর সে প্রণাম?" বনদেবী বাসন্তীর এই উক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়, হংসকুলবিমণ্ডিত তটভূমির প্রান্তদেশে বহনশীলা, স্নিগ্ধনীলস্বচ্ছসলিলা গোদাবরীর অরুণরঞ্জিত অনুপম নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে শ্রীজানকী প্রিয়তম শ্রীরামচন্দ্রকে ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন। নৈসর্গিক

সৌন্দর্য্যের মধুর অনুভূতির অনিবার্য্য প্রভাবে ক্ষণিক বিস্মৃতিরূপ বিরুদ্ধ ভাবের উদয়ে অনুরাগের তীব্রগতিশীল প্রবাহ যেন একটু স্তব্ধ-স্তিমিত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তিনি যেন সত্যসত্যই তাঁহার প্রাণারাম জীবনসর্ব্বস্ব শ্রীরামভদ্রকে তাঁহার প্রেমময় মানসরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই গুরুতর অপরাধ প্রেমিকের পক্ষে মর্ম্মবিদারী; সুতরাং সর্ব্বথা অসহনীয়; কারণ, ইহা অনুরাগের বিরুদ্ধ ভাব। এই বিরুদ্ধ ভাব কিয়ৎকাল উদিত হইয়া কিন্তু শ্রীজানকীর অনুরাগকে তিরোহিত করিতে পারে নাই। প্রত্যুত পথের দিকে বদ্ধদৃষ্টি আকুল-হৃদয় চিন্তাবসাদগ্রস্ত শ্রীরামভদ্রের ম্লান মুখপঙ্কজের প্রতি চাহিবামাত্র যে অনুশোচনা, নির্ব্বেদ ও আকুলতার তীব্র ঝটিকা যুগপৎ সমুদিত হওয়ায় তাঁহার সেই অনুরাগের প্রবাহে খরবেগ ও তরঙ্গাবলী অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা সেই অনুরাগ-প্রবাহের গভীরতা ও তীব্রবেগতা সহৃদয় সামাজিক মানসনেত্রে আরও মনোহর ভাবে স্ফুটতর হইয়াছিল। সুতরাং বিরুদ্ধসঞ্চারী ভাবনিচয় উদিত হইলেও তাহা অনুরাগরূপ স্থায়ী ভাবকে ম্লান করিতে পারে না, প্রত্যুত তাহাকে পরিপুষ্টতরই করিয়া থাকে। এইরূপ আলঙ্কারিক আচার্য্য-উক্তি সর্ব্বথা সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত, তাহাই মহাকবি ভবভূতি এই অনুপম সমুজ্জ্বল চিত্র দ্বারা পূর্ণভাবে সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আদিরসের উপাদানস্বরূপ এই স্থায়ী ভাব বা রতি, ভক্তহৃদয়ে পরমার্থিক রসের উপাদানভূত রতি নহে; কারণ, এই রতি প্রাকৃত। কিন্তু পারমার্থিক রসের উপাদানভূত যে রতি, তাহা প্রাকৃত নহে, পরন্তু তাহা অপ্রাকৃত, ইহাই হইল ভক্তশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত যে সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদেরই উক্তি দ্বারা এক্ষণে তাহার স্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে।

পারমার্থিক রতি স্থায়ী ভাব

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু নামক স্বীয় গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী পারমার্থিক রসের উপাদান-স্বরূপ স্থায়ী ভাব অর্থাৎ রতির স্বরূপনির্দ্দেশ এইরূপ করিয়াছেন, যথা—

> "শুদ্ধ-সত্ত্ব-বিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
> রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥"

শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিস্বরূপ যে শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ, তাহাই ভাব বা রতি। ইহা প্রেমরূপ যে সূর্য্য, তাহার নবোদিত কিরণস্থানীয়। ভগবান্‌কে পাইবার

জন্য, তন্ময় হইবার জন্য, তাঁহার সহিত সৌহার্দ্দ্য করিবার জন্য যে অভিলাষ, সেই অভিলাষ উৎপাদন করিয়া ইহা প্রাকৃত বস্তুতে অহন্তা ও মমতা-বুদ্ধিরূপ কাঠিন্য দূর করিয়া চিত্তকে কোমল করিয়া থাকে। এই শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তিবিশেষই প্রেমভক্তিরূপ পারমার্থিক রসের স্থায়ী ভাব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

এই শ্লোকটির মধ্যে 'শুদ্ধ-সত্ত্ববিশেষ' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে এই পারমার্থিক রসের স্থায়ী ভাবের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শ্রীভগবানের স্বরূপভূত ত্রিবিধ স্বরূপ-শক্তি বিদ্যমান আছে, যথা—সন্ধিনী, সংবিৎ হ্লাদিনী।

শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তির পরিণতি

উপনিষদ্ বলিয়া দিতেছে,—"অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম—" সর্ব্বপ্রকার ভেদবর্জ্জিত অবিনাশী সৎ, চিৎ ও আনন্দই ব্রহ্ম। এই অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই পরমাত্মা ও ভগবান্ বলিয়া অধিকারভেদানুসারে অভিহিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ইহাও শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।"

যে অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ববিদ্গণ তত্ত্ব বা পারমার্থিক সদ্বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহাই প্রকাশ-ভেদানুসারে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ বলিয়া অভিহিত হয়।

এই শ্রৌত সিদ্ধান্তানুসারে—শ্রীভগবান্ই সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, তিনিই একমাত্র পরমার্থ সৎ, তিনিই একমাত্র চিৎ এবং তিনিই একমাত্র আনন্দ স্বয়ং সৎস্বরূপে নিত্য বিদ্যমান থাকিয়া অন্য সকল সখণ্ড বস্তুকে তিনি যে শক্তি দ্বারা সত্তাযুক্ত করিয়া থাকেন, তাঁহার সেই স্বরূপ শক্তির নাম সন্ধিনী শক্তি স্বয়ং চিদাত্মক হইয়া যে শক্তির দ্বারা তিনি জীবনিবহকে চৈতন্যসম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাঁহার সেই স্বরূপশক্তিকে সম্বিৎ বলা যায় এবং স্বয়ং আনন্দস্বরূপ থাকিয়া যে শক্তির দ্বারা আত্মস্বরূপ আনন্দকে স্বয়ং অনুভব করিয়া থাকেন এবং নিখি জীবকে সেই আনন্দের অনুভব করাইয়া থাকেন, তাঁহার সেই স্বরূপশক্তিবে হ্লাদিনী শক্তি বলা যায়। এই হ্লাদিনী শক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি অর্থ

অন্তরঙ্গশক্তি, মায়াশক্তির ন্যায় ইহা বহিরঙ্গশক্তি নহে। এই শক্তির অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তির যে বৃত্তিবিশেষ অর্থাৎ পরিণতিবিশেষ, বৈষ্ণবদর্শনে তাহারই নাম শুদ্ধ-সত্ত্ববিশেষ। এই শুদ্ধসত্ত্ববিশেষেরই নাম ভাব বা রতি। এই রতিই হ্লাদিনী শক্তির সারভূত বৃত্তি।

আমার করিবার ইচ্ছা

ইহার স্বরূপ-প্রতিপাদন বিশদভাবে করিতে যাইয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যাহা বলিয়া থাকেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ,—

এ সংসারে প্রত্যেক মানবের স্বভাব এই যে, অভিলষিত প্রাপঞ্চিক বস্তু লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে এক প্রকার অতৃপ্তিময় আকাঙ্ক্ষার অনুভূতি, এ সংসারে যাহা আমার রুচি অনুসারে আমার নিকটে সুন্দর বা উপভোগ্য বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে, তাহাকে নিজের আয়ত্ত করিয়া 'তাহা আমারই,' এইরূপ অনুভব করিয়া, তাহাকে নিজের মনের মত উপভোগ করিবার জন্য আমার প্রবৃত্তি যেমন স্বাভাবিক, তাহাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত বুঝিয়া তাহা উপভোগ করিয়া সুখের অনুভব করাও আমার—শুধু আমার কেন, জীবমাত্রেরই তেমনই স্বাভাবিক। শুধু তাহাই নহে, এইরূপ অভীষ্ট ভোগ্য বস্তু লাভের পর তদ্বিষয়ক আনন্দের অনুভূতির সহিত সেই বস্তুর অপ্রাপ্তিকালে তাহাকে পাইবার জন্য অন্তঃকরণের ঐকান্তিক ঔৎসুক্যময় যে স্পৃহা, তাহার উপশমও আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

ঔৎসুক্য

সেই উপশমের সঙ্গে সঙ্গে ভোগাভিলাষের তীব্রতা-হানি-মূলক সুখানুভূতির তারতম্যও আমাদের প্রত্যেকের অনুভব-সংবেদ্য, ইহাও বুঝিয়া থাকি। আরও দ্রষ্টব্য এই যে, বহু যত্ন ও বহু পরিশ্রমে লব্ধ ভোগ্যবস্তুর লাভজনিত তৃপ্তির পরক্ষণ হইতেই অপ্রাপ্তিকালে ভোগ্যবস্তুগত যে সৌন্দর্য্য বা চারুতা আমাদের নিকটে অনুপম বা লোকাতীত বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল, সেই সৌন্দর্য্যের—সেই চারুতার মাত্রা যেন আমাদের নিকট কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া মনে মনে অনুভূত হইতে আরম্ভ করে, সঙ্গে সঙ্গে আরও কোন নূতন সৌন্দর্য্যের নূতন মধুরিমার আস্বাদনার্থ অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা হৃদয়াকাশের এক প্রান্তে নিদাঘান্তে বায়ুকোণে সমুদিত ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডের ন্যায় আবির্ভূত হইয়া ক্রমে বাড়িতে আরম্ভ করে।

অতৃপ্তি

প্রাপঞ্চিক ভোগ্যবস্তুনিচয়ের প্রাপ্তিবশতঃ প্রীতির নিত্যসহচর এই অতৃপ্তিময় আকাঙ্ক্ষা—এই অজানা অচেনা কোন এক নূতন সৌন্দর্য্যের নূতন মাধুর্য্যের আস্বাদনের জন্য অব্যক্তকল্প অভিলাষ—ইহাই হইল হ্লাদিনী শক্তির সার বৃত্তি। ইহাই হইল প্রতি জীবের স্বয়ংপ্রকাশমান ভগবৎ-প্রাপ্তির অব্যক্ত অভিলাষ। নিত্য, সীমাতীত, প্রতিক্ষণে নূতন ভগবৎসৌন্দর্য্য দর্শনের জন্য তাহাতে মিশিয়া গলিয়া যাইবার জন্য স্বানুভবসম্বেদ্য, প্রাণশক্তির অফুরন্ত স্পন্দন, ইহারই নাম রতি। ইহাই প্রেমকল্পবৃক্ষের অমর বীজ, ইহারই নাম মানবের অথবা প্রত্যেক জীবের সহজ বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

ভগবৎ প্রীতি ও রতির সাদৃশ্য ও ভেদ

সাধনভক্তির সাহায্যে চিত্ত বিশুদ্ধ ও বিগলিত হইলে ইহার যে প্রাথমিক অভিব্যক্তি তাৎকালিক মনোবৃত্তিতে পরিস্ফুরিত হইয়া উঠে, তাহারই স্বরূপ বুঝাইতে যাইয়া আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী প্রীতি-সন্দর্ভ গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"তদেবং ভগবৎপ্রীতেরেব পরমপুরুষার্থতা স্থাপিতা, অথ তস্যাঃ স্বরূপলক্ষণং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদেন অতিদেশদ্বারা দর্শিতম্।

'যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু'॥

যা যল্লক্ষণা, সা তল্লক্ষণা, নতু যা সৈব বক্ষ্যমাণলক্ষণৈক্যাৎ। তথাপি পূর্ব্বস্যা মায়াশক্তিবৃত্তিময়ত্বেন উত্তরস্যাঃ স্বরূপশক্তিবৃত্তিময়ত্বেন ভেদাৎ।"

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা শ্রীভগবৎ-প্রীতিই যে মানবের পক্ষে পরমপুরুষার্থ—ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। এই ভগবৎ-প্রীতির স্বরূপ কি, তাহারই নির্ণয় করা যাইতেছে,—

বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়, শ্রীপ্রহ্লাদ অতিদেশ দ্বারা অর্থাৎ সাধর্ম্ম্যপ্রদর্শন দ্বারা ভগবৎ-প্রীতির স্বরূপ এইরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন, যথা—'বিবেকহীন সাংসারিক জীবনিচয়ের প্রাপঞ্চিক শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুসমূহে অনপায়িনী যে প্রীতি বিদ্যমান থাকে, হে ভগবন্, তোমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিতে করিতে আমারও যেন তোমার প্রতি অভিব্যক্ত সেই প্রীতি অর্থাৎ সেইরূপ প্রীতি হৃদয় হইতে ক্ষণকালের জন্যও অপসৃত না হয়।' এই শ্লোকে 'যা' এই শব্দটির অর্থ যাদৃশ-লক্ষণাক্রান্ত এবং 'সা' এই

শব্দটির অর্থ তাদৃশ-লক্ষণাক্রান্ত—এইরূপই বুঝিতে হইবে। লৌকিক প্রীতি ও ভগবৎ-প্রীতির লক্ষণগত সাদৃশ্য আছে বলিয়া লৌকিক প্রীতি ও ভগবৎ-প্রীতি যে একই বস্তু, তাহা নহে। এই উভয় প্রকার প্রীতির লক্ষণ কিরূপে একই প্রকারের হইয়া থাকে, তাহা পরে বুঝান যাইবে। লৌকিক প্রীতি যে হেতু মায়াশক্তির বৃত্তিময় হয় এবং ভগবৎপ্রীতি যে হেতু স্বরূপশক্তির অর্থাৎ হ্লাদিনীর বৃত্তিময় হয়, এই কারণে লৌকিক প্রীতি ও ভগবৎপ্রীতি একই প্রকারের লক্ষণাক্রান্ত হইলেও পরস্পর ভিন্ন হইয়া থাকে, উভয়ই যে এক বস্তু, তাহা নহে।

কৃষ্ণরতি নিত্যসিদ্ধ

আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীর এইরূপ উক্তি দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, লৌকিক রসাস্বাদের বিষয় যে বিষয়প্রীতি, তাহা লৌকিক রসাস্বাদে স্থায়ী ভাব হইলেও পারমার্থিক রসের স্থায়ী ভাব হইতে পারে না। পারমার্থিক রসের স্থায়ী ভাবস্বরূপ যে প্রীতি, তাহা লৌকিক প্রীতি নহে, কিন্তু অপ্রাকৃত ভাগবতী প্রীতি; তাহা শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিবিশেষ, তাহা বৈষয়িক প্রীতির ন্যায় কিয়ৎকালস্থায়িনী নহে, পরন্তু তাহা নিত্যসিদ্ধ, তাহাই জীবের—জীবমাত্রের সাহজিক বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাই ভক্তকবিশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভূ নয়।
শ্রবণাদিশুদ্ধচিত্তে লভয়ে উদয়॥"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন :—

"নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা।"

পারমার্থিক রসের স্থায়ী ভাব যে কৃষ্ণরতি, তাহা নিত্যসিদ্ধ; সুতরাং তাহা সাধ্য বা উৎপাদ্য হইতে পারে না। বিশুদ্ধ যে তাহার প্রকটতা বা অভিব্যক্তি, তাহা সাধ্য হয় বলিয়া ঐ ভাবের সাধ্যতা বা উৎপাদ্যতা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়া থাকে।

(১৬)

কৃষ্ণরতির অনুভাব সমূহ

শ্রীকৃষ্ণরতি অঙ্কুরিত হইলে ভক্ত-হৃদয়ে যে সকল বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহারা অনুভাব শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণরতি পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে। এই স্থলে যে কয়টি অনুভাবের উদাহরণ ও লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, তাহা ঐ পাঁচ প্রকার শ্রীকৃষ্ণরতির সাধারণ অনুভাব। রতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন যে সকল অনুভাব হইয়া থাকে, তাহা পরে বর্ণিত হইবে। প্রথম সাধারণ অনুভাব হইতেছে 'ক্ষান্তি'। এই ক্ষান্তির কি লক্ষণ, তাহা দেখান যাইতেছে।

ক্ষান্তি

"ক্ষোভহেতাবপি প্রাপ্তে ক্ষান্তিরক্ষুভিতাত্মতা।"

যে সকল কারণ উপস্থিত হইলে প্রাপঞ্চিক মানবের অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া উঠে, সেই সকল কারণ সম্পূর্ণভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও হৃদয় যদি ব্যাকুল না হয়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, হৃদয়ে ক্ষান্তি আসিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে মহারাজ পরীক্ষিতের চরিতে এই ক্ষান্তির উদয় বড়ই সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে; যথা—

"তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ॥"

এক সপ্তাহের মধ্যে ব্রহ্মশাপে মরণ অনিবার্য্য জানিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ ভাগীরথী-তীরে প্রায়োপবেশন করিয়াছেন, ভারতের প্রধান প্রধান মহর্ষিবৃন্দ, অগণিত বিদ্বদ্‌ব্রাহ্মণ, অসংখ্য সাধু-সন্ন্যাসী আসন্নমৃত্যুর সময়ে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ ও সান্ত্বনা করিবার জন্য সেখানে সমবেত হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে যথাবিহিত প্রণাম, অভিবাদন ও সৎকার করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ গম্ভীরভাবে আত্মনিবেদন পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করিতেছেন,—'হে ভূদেবগণ! এই সংসার যাত্রার শেষসময়ে আমি পতিতপাবনী ভগবতী ভাগীরথী ও আপনাদিগের শরণাগত হইয়াছি, ইহা আপনারা অবগত হউন। আমার অন্তঃকরণ পরমেশ্বরেই বিন্যস্ত হইয়াছে, এখন মুনিপ্রেরিত বিষধর তক্ষক বা কোন প্রকার কুহক আমাকে দংশন করুক, (তাহাতে আমি অণুমাত্রও ব্যাকুল নহি) আপনারা সকলে শ্রীভগবানের গুণগান করিতে থাকুন।'

অব্যর্থকালতা

দ্বিতীয় অনুভাবের নাম 'অব্যর্থকালতা'। ইহার অর্থ বৃথাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া জীবনকালকে ব্যর্থ না করা। হরিভক্তিসুধোদয় গ্রন্থে ইহার স্বরূপ দেখান হইয়াছে; যথা—

"বাগ্‌ভিঃ স্তবন্তো মনসা স্মরন্ত স্তন্বা নমন্তোঽপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্রমায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি ॥"

যাঁহাদের অন্তঃকরণে ভগবদ্রতিরূপা ভক্তির উদয় হয়, তাঁহারা কি করিয়া সময় অতিবাহিত করেন, তাহাই এই শ্লোক দেখান হইয়াছে।

তাঁহাদের মুখ হইতে শ্রীভগবানেরই স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হয়, তাঁহাদের মন সর্ব্বদা শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া থাকে, তাঁহাদের দেহ শ্রীভগবানের উদ্দেশে প্রণত হয়, প্রেমাশ্রধারায় তাঁহাদের নয়নযুগল সর্ব্বদা অভিষিক্ত থাকে। এই সকল ব্যাপার অবিরত করিয়াও তাঁহারা আর কেন, পর্য্যাপ্ত হইয়াছে, এই ভাবিয়া পরিতৃপ্ত হন না, সম্পূর্ণ জীবনকাল তাঁহারা শ্রীহরির প্রীতিকামনায় উৎসর্গ করিয়া থাকেন।

বিরক্তি

তৃতীয় অনুভাব 'বিরক্তি'। তাহার লক্ষণ, যথা—

"বিরক্তিরিন্দ্রিয়ার্থানাং স্যাদরোচকতা স্বয়ম্।"

সকলপ্রকার ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যবিষয় সমূহ যখন তাহার চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে না, তখনই বিরক্তি উদিত হয়। রাজর্ষি ভরত ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শ্রীমদ্‌ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমশ্লোকলালসঃ ॥"

মহারাজ ভরত যৌবনকালেই চিত্তহারী, সুতরাং বিষয়ী ব্যক্তিমাত্রেরই দুস্ত্যজ্য—রাজ্য, সুহৃৎ, পুত্র ও পত্নীকে অঙ্গলগ্ন মলের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,—কারণ, শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছিল।

অমানিতা

চতুর্থ অনুভাব 'মানশূন্যতা'। মানশূন্যতার লক্ষণ যথা—

"উৎকৃষ্টত্বেঽপ্যমানিত্বং কথিতা মানশূন্যতা।"

সর্ব্বপ্রকারে নিজের উৎকর্ষ বিদ্যমান থাকিলেও যদি অভিমান না থাকে,

তাহাকে মানশূন্যতা বলা যায়। পদ্মপুরাণে মহারাজ ভগীরথের চরিত্র-বর্ণনা-প্রসঙ্গে এই মানশূন্যতার উজ্জ্বল উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

"হরৌ রতিং বহন্নেষ নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে ॥"

মহারাজচক্রবর্ত্তী ভগীরথ রাজ্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি তৃণের ন্যায় উপেক্ষা করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই অবস্থায় সর্ব্বত্র কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কি জড়, কি চেতন সকল বস্তুতেই তিনি একমাত্র শ্রীহরিকে দেখিতে পাইতেন। অভিমানশূন্য ভগীরথ শত্রু নরপতির নগরে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষা করিতে করিতে সম্মুখে চণ্ডালকে দেখিতে পাইলে তাহাকেও শ্রীহরি বুদ্ধিতে বন্দনা করিতেন।

আশাবন্ধ

পঞ্চম অনুভাব 'আশাবন্ধ'। ইহার লক্ষণ যথা—

"আশাবন্ধো ভগবতঃ প্রাপ্তিসম্ভাবনা দৃঢ়া।"

শ্রীভগবান্‌কে একদিন আমি পাইবই, এইরূপ যে দৃঢ় সম্ভাবনা, তাহাই আশাবন্ধ বলিয়া অভিহিত হয়। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মহাপ্রভুর কৃত একটি শ্লোকে এই আশাবন্ধের স্বরূপ বড়ই সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, যথা—

"ন প্রেমা শ্রবণাদি-ভক্তিরপি বা যোগোঽথ বা বৈষ্ণবো
জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা সতী
হে গোপীজনবল্লভ ব্যথয়তে হাহা মদাশৈব মাম্ ॥"

হে গোপীজনবল্লভ! আমার প্রেম নাই, শ্রবণ-মননাদিও আমার ঘটিয়া উঠিল না, সাধনভক্তিরও কোন খবর আমি রাখি না, বিষ্ণুপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ যোগও আমি কখনও করি নাই, আমার জ্ঞানও নাই, তোমাকে পাইবার উপযোগী কোন শুভকর্ম্মও আমার হয় নাই, যাহার কেহ নাই বা কিছুই নাই, তুমি কিন্তু তাহারই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, এই বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন তোমাকে এক দিন পাইবই, এই আশা কিন্তু আমার হৃদয়ক্ষেত্রে অচ্ছেদ্যমূল হইয়া বাড়িয়া যাইতেছে আর সেই আশাই আমাকে হায়! ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে।

সমুৎকণ্ঠা

ষষ্ঠ অনুভাব 'সমুৎকণ্ঠা'। ইহার লক্ষণ যথা—

"সমুৎকণ্ঠা নিজাভীষ্টলাভায় গুরুলুব্ধতা।"

নিজ প্রিয়তম শ্রীভগবান্‌কে পাইবার জন্য যে উৎকট লোভ, তাহাকেই সমুৎকণ্ঠা বলা যায়। কর্ণামৃতগ্রন্থে ইহার উদাহরণ দেখা যায়, যথা—

"আনম্রামসিতভ্রুবোরুপচিতামক্ষীণপক্ষ্মাঙ্কুরে
ষ্বালোলামনুরাগিণোর্নয়নয়োরার্দ্রাং মৃদৌ জল্পিতে।
আতাম্রামধরামৃতে মদকলামম্লানবংশীস্বনে-
ষ্বাশাস্তে মম লোচনং ব্রজশিশোর্মূর্ত্তিং জগন্মোহিনীম্॥"

কোন সুন্দর মুখের ঘনকৃষ্ণ আনত ভ্রূযুগল দেখিলে মনে হয়, ঐখানে বুঝি তাঁহার মূর্ত্তি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। আবার সেই সুন্দর নয়নের ঘনীভূত পক্ষ্মরাজির দিকে দৃষ্টি পড়িলে বোধ হয়, তাঁহার মূর্ত্তি যেন স্থূল হইয়া তথায় দুলিতেছে; পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত তরুণ ও তরুণীর অনুরাগ-রঞ্জিত লোচন-যুগল দেখিয়া বোধ হয়, তাঁহারই প্রেমময় মূর্ত্তি যেন ক্রীড়া-চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; কাহারও প্রেমস্নিগ্ধ কোমল কথা কাণে আসিলে বোধ হয়, যেন তাঁহারই মূর্ত্তি প্রেমরসে আর্দ্র হইয়া পড়িতেছে; সুন্দর অধর-যুগল দেখিলে মনে হয়, তাঁহারই সেই মূর্ত্তি অনুরাগ-রঞ্জিত হইয়া সেখানে অভিব্যক্ত হইতেছে; আর বংশীস্বর কর্ণে প্রবেশ করিলে মনে হয়, তাঁহারই সেই প্রেমময় মূর্ত্তি যেন সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের মদে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমার এ নয়ন সকল সুন্দর বস্তুতেই ব্রজকুমার শ্রীকৃষ্ণের জগন্মোহিনী মূর্ত্তিকে দেখিবার আশায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিতেছে।

নামে রুচি

সপ্তম অনুভাব 'নামগানে সদারুচি'। যথা—

"রোদন-বিন্দু-মকরন্দস্যন্দিদৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ।
তব মধুর-স্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলীং বালা॥"

হে গোবিন্দ! মধুরস্বরকণ্ঠী সেই বালা আজ তোমার নামাবলীই গাহিতেছে। গানের সময় তাহার নয়নরূপ ইন্দীবরযুগল হইতে অশ্রুবিন্দু-সমূহ মকরন্দ-বিন্দু-নিবহের ন্যায় অবিরত গলিয়া পড়িতেছে।

গুণবর্ণনে রতি

অষ্টম অনুভাব 'তদ্‌গুণবর্ণনে আসক্তি'। যথা—

"মাধুর্য্যাদপি মধুরং মন্মথতা তস্য কিমপি কৈশোরম্।
চাপল্যাদপি চপলং, চেতো বত হরতি হন্ত কিং কুর্ম্মঃ॥

(কর্ণামৃত)

মাধুর্য্য হইতেও মধুর, অথচ চপলতা হইতেও চপল—সেই শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর, যাহা দেখিলে মনে হয়, ইহাই ত মন্মথ-স্বভাব, সেই কৈশোর আমার মন হরণ করিতেছে হায়! আমরা কি করিব?

ধাম প্রীতি

নবম অনুভাব 'তদ্বসতিস্থলে প্রীতি'। ইহার উদাহরণ পদ্যাবলী নামক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, যথা—

"অত্রাসীৎ কিল নন্দসদ্ম শকটস্যাত্রাভবদ্‌ভঞ্জনম্
বন্ধচ্ছেদকরোঽপি দামভিরভূদ্ বদ্ধোঽত্র দামোদরঃ।
ইত্থং মাথুরবৃদ্ধবক্ত্র বিগলৎ-পীযূষধারাং পিব-
ন্নানন্দাশ্রুধরঃ কদা মধুপুরীং ধন্যশ্চরিষ্যাম্যহম্॥"

এইখানে গোপরাজ নন্দের বাটী ছিল, এইখানে শকটভঞ্জন হইয়াছিল, এইখানে সকলের সকল বন্ধচ্ছেদকারী শ্রীভগবান্ রজ্জুবদ্ধ হইয়া দামোদর নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন, মথুরাবাসী বৃদ্ধের বদন হইতে বিগলিত পীযূষধারার ন্যায় এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে ধন্য হইয়া কবে আমি মধুপুরীতে পর্য্যটন করিতে পারিব?

ভোগী ও মুমুক্ষুর রত্যাভাস

এই নয় প্রকার অনুভাব যে রতিতে প্রকাশ পায়, তাহার স্বভাব হইতেছে আর্দ্রতা, সেই আর্দ্রতা অর্থাৎ মনের সর্ব্বপ্রকার কঠোরতার বিলয়ের সঙ্গে গলিয়া যাওয়া। এই আর্দ্রতা মুক্তিকামী সাধকের হৃদয়ে উদিত হইতে পারে না, সকল প্রকার ভোগ-তৃষা যাঁহাদের হৃদয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণও এই আর্দ্রতা-লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা-পরায়ণ হইয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ এই আর্দ্রতা ভজন-পরায়ণ ব্যক্তিগণকেও শীঘ্র দিতে চাহেন না; যাহারা ভোগকামী বা যাহারা মোক্ষকামী, সুতরাং শুদ্ধ ভক্ত নহে, তাহাদের হৃদয়ে এই প্রকার আর্দ্রতাময়ী ভাগবতী রতি কখনও উদিত হইতে পারে না;

কিন্তু শ্রবণ-কীর্ত্তন-সময়ে কদাচিৎ কোন কোন ব্যক্তির এইরূপ আর্দ্রতাময়ী ভাগবতী রতির আবির্ভাব হইয়াছে, এইরূপ মনে হয়। তাহা দেখিয়া প্রাকৃত জনসমূহ চমৎকৃত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহা বিলক্ষণরূপেই বুঝিয়া থাকেন। বিষয়াসক্ত ও মুমুক্ষু এই দ্বিবিধ ভজনকারী ব্যক্তিগণের এই প্রকার ভাব কিন্তু রতিপদবাচ্য হয় না, অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহাকে রত্যাভাস বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

প্রতিবিম্ব রত্যাভাস

এই রত্যাভাস দুই প্রকার, যথা—প্রতিবিম্ব ও ছায়া। প্রতিবিম্ব রত্যাভাস কাহাকে বলে, তাহা শ্রীরূপগোস্বামী দেখাইয়াছেন, যথা—

"আশ্রমাভীষ্টনির্ব্বাহী রতিলক্ষণলক্ষিতঃ।
ভোগাপবর্গ-সৌখ্যাংশব্যঞ্জকঃ প্রতিবিম্বকঃ॥
দৈবাৎ সদ্‌ভক্তসঙ্গেন কীর্ত্তনাদ্যনুসারিণাম্।
প্রায়ঃ প্রসন্নমনসাং ভোগমোক্ষাদিরাগিণাম্॥
কেষাঞ্চিদ্ হৃদি ভাবেন্দোঃ প্রতিবিম্ব উদঞ্চতি।
তদ্‌ভক্তহৃন্নভঃস্থস্য তৎসংসর্গপ্রভাবতঃ॥"

এই কয়টি শ্লোকের তাৎপর্য্য এই—যাহারা বৈষয়িক ভোগে অত্যন্ত আসক্ত নহে এবং একান্ততঃ বিষয়-বিরক্তও নহে, উৎকট রাগ, দ্বেষ ও ক্রোধ প্রভৃতি রাজস বৃত্তি-নিচয় তীব্রভাবে উদিত হইয়া যাহাদের হৃদয়কে কলুষিত করে না, যাহাদের চিত্ত প্রায়ই প্রসন্ন থাকে, তাহাদের সৌভাগ্যবশতঃ যদি প্রকৃত সাধু ভক্তগণের সঙ্গলাভ হয় এবং তাহারই প্রভাবে হরিকথা-শ্রবণে ও হরিকীর্ত্তন প্রভৃতিতে যাহাদের আসক্তির উদয় হয়, তাহাদেরই হৃদয়ে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ভগবদ্বিষয়ক অনুরাগরূপ চন্দ্রের প্রতিবিম্বরূপ রত্যাভাস সময়ে সময়ে উদিত হইয়া থাকে। সাধুভক্ত মহাপুরুষগণের সঙ্গের এমনই প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাঁহারা শ্রদ্ধাসহ তাঁহাদের সহিত কীর্ত্তনাদিতে যোগদান করেন, তাঁহাদের শুদ্ধ হৃদয়াকাশেও সাধুপুরুষগণের নির্ম্মল হৃদয়াকাশে উদিত শ্রীভগবদ্রতিরূপ পূর্ণচন্দ্রের প্রতিবিম্ব সময়ে সময়ে সমুদিত হইয়া থাকে।

ছায়া রত্যাভাস

দ্বিতীয় প্রকার রত্যাভাসকে ছায়া বলা যায়। তাহার লক্ষণ এই প্রকার, যথা—

"ক্ষুদ্র-কৌতুহলময়ী চঞ্চলা দুঃখহারিণী।
রতেশ্ছায়া ভবেৎ কিঞ্চিৎ তৎসাদৃশ্যাবলম্বিনী॥
হরিপ্রিয়-ক্রিয়াকাল-দেশ-পাত্রাদিসঙ্গমাৎ।
অপ্যানুষঙ্গিকাদেষা কচিদজ্ঞেষপীক্ষ্যতে॥"

এই শ্লোক দুইটির তাৎপর্য্যার্থ এই—কদাচিৎ শ্রীহরির প্রিয় কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানে পুণ্য একাদশী, সংক্রান্তি প্রভৃতি কালবিশেষে, শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা প্রভৃতি মহাতীর্থক্ষেত্রে অথবা অকিঞ্চন ভক্তপুরুষগণের সঙ্গলাভে অজ্ঞ ব্যক্তিগণের হৃদয়াকাশে অল্পকালের জন্য হঠাৎ পূর্ব্বোক্ত আর্দ্রতাময়ী ভাগবতী রতির ছায়া উদিত হইলে হৃদয়ে স্বল্প বিস্ময়রসের আবির্ভাব হয়। যদিও ইহা দীর্ঘকাল-স্থায়িনী হয় না, কিন্তু যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ কোন দুঃখেরই অনুভব হয় না, নয়নে অশ্রুবিন্দু আপনা হইতেই ক্ষরিত হইতে থাকে, শরীরও সময়ে সময়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, এই রূপ আরও অনেক প্রকার সাত্ত্বিক ভাবেরও উদয় হইয়া থাকে।

ভক্ত-প্রসাদে ছায়া রতি প্রকৃত হয়

এই ভাবচ্ছায়া বা রতিচ্ছায়া বিশেষ সৌভাগ্যবশতঃ কাহারো কাহারো ভাগ্যে উদিত হয়, সকলেরই হয় না, তাই শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"কিন্তু ভাগ্যং বিনা নাসৌ ভাবচ্ছায়াপ্যুদঞ্চতি।
যদভ্যুদয়তঃ ক্ষেমং তত্র স্যাদুত্তরোত্তরম্॥"

কিন্তু, ভাগ্য ব্যতিরেকে এই ভাবচ্ছায়া উদিত হয় না, ইহার উদয় যাহার ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে, সে ক্রমেই মঙ্গলময় ভক্তির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়া থাকে। কারণ এই যে—

"হরিপ্রিয়জনস্যৈব প্রসাদভরলাভতঃ।
ভাবাভাসোঽপি সহসা ভাবত্বমুপগচ্ছতি॥"

যাহার এই প্রকার আকস্মিক ভাবাভাস উদিত হয়, সে যদি শ্রীভগবানের কৃপায় ভগবদ্ভক্তের প্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার সেই ভাবাভাসই যথার্থ ভাব অর্থাৎ ভাগবতী রতিতেই পরিণত হইয়া যায়।

ভক্তাপরাধে ভাবাভাস ক্ষয়

এইরূপ ভাবাভাস যাহার সৌভাগ্যবশতঃ উদিত হয়, তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য এই যে, সে যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন ভগবৎপ্রেমিক মহাত্মার প্রতি অসদ্ব্যবহার না করিয়া ফেলে। কারণ,—

"তস্মিন্নেবাপরাধেন ভাবাভাসোঽপ্যনুত্তমঃ।
ক্রমেণ ক্ষয়মাপ্নোতি খস্থপূর্ণশশী যথা ॥"

ভগবান্‌কে যে যথার্থ ভালবাসে, তাহার প্রতি ঔদ্ধত্য প্রভৃতি অসদ্‌ব্যবহার করিলে ঘনীভূত ভাবাভাসও আকাশে সমুদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়ে

ভাবেরও ক্ষয়

শুধু তাহাই নহে, ভাবাভাস যথার্থ ভাবরূপে পরিণত হইলেও যদি কেহ ভগবদ্‌-ভক্তের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করে, তাহা হইলে—

"ভাবোঽপ্যভাবমায়াতি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠাপরাধতঃ।
আভাসতাং চ শনকৈর্ন্যনজাতীয়তামপি ॥"

ভাব যথার্থভাবে উদিত হইলেও ঐ প্রকার শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় ব্যক্তির প্রতি জ্ঞান পূর্ব্বক অপরাধ বশতঃ উহা একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়, ভাবাভাসতাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সে ভাবাভাসতাও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। এ স্থলে আরও বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে,—

"গাঢ়াসঙ্গাৎ সদা যাতি মুমুক্ষৌ সুপ্রতিষ্ঠিতে।
আভাসতামসৌ কিম্বা ভজনীয়েশভাবতাম্ ॥"

অদ্বৈতিসঙ্গে উপাসকভাব নাশ

যে ব্যক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত মুমুক্ষু অর্থাৎ ভগবদ্‌ভক্তিহীন হইয়া কেবল অদ্বৈত ব্রহ্মানুধ্যাননিরত, তাহার প্রতি যদি গাঢ় আসক্তি থাকে, তাহা হইলে, যথার্থ ভাব উদিত হইলেও তাহাও ভাবাভাসরূপে পরিণত হইয়া পড়ে, অথবা মুমুক্ষুর প্রতি অত্যাসক্তির ফলে সেই যথার্থ ভাবসম্পন্ন ব্যক্তি আপনাকেই ভজনীয় শ্রীভগবান্ ভাবিতে আরম্ভ করে। এইরূপ ভাবনাকেই ভক্তিশাস্ত্রের আচার্য্যগণ অহংগ্রহোপাসনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই অহংগ্রহোপাসনা ভক্তিমার্গের একান্ত বিরোধিনী, সুতরাং ভক্তের পক্ষে ইহা একান্ত পরিহার্য্য। শাস্ত্রানুশীলন বা সৎসঙ্গপ্রসাদে সাধনের অনুষ্ঠান বা জ্ঞান যাহার হয় নাই, তাহারও কোন কোন স্থলে অকস্মাৎ এইরূপ ভাগবতী রতির উদয় হইয়া থাকে, এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এইপ্রকার আকস্মিক ভাবোদয় শ্রীভগবানের অনুগ্রহেই হইয়া থাকে।

ভাবাবেগ বিধিনিষেধের অতীত

ভাবোদয় হইবার পরও যদি ভক্তগণের আচরণে কোনপ্রকার লোকবিরুদ্ধ আচার পরিদৃষ্ট হয়, তথাপি তাহাতে কোনরূপ অসূয়া কাহারও কর্ত্তব্য নহে, কারণ, তাদৃশ ব্যক্তি কৃতার্থ হইয়াছে। এ সংসারের কোন প্রকার কার্য্য তাহার পক্ষে বিহিত বা প্রতিষিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

নারসিংহ পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা ভৃশমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ।
ন হি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিৎ তিমিরপরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ॥"

ভগবান্ শ্রীহরিতে যে ব্যক্তি অনন্যচেতা হয়, তাহার কার্য্য অত্যন্ত কলুষিত ও মলিন বলিয়া প্রতীত হইলেও বাস্তবপক্ষে সে পরম শোভনই হইয়া থাকে। চন্দ্র সর্ব্বদা কলঙ্কযুক্ত হইলেও অন্ধকার তাহাকে কখনই আবৃত করিতে সমর্থ হয় না।

ভক্তের আর্ত্তি আনন্দময়

এই প্রকার ভাগবতী রতি নিরতিশয় আনন্দস্বরূপা অথচ এই রতির উদয় হইবার পরও শ্রীভগবানের বিরহানুভূতি ও মিলনোৎকণ্ঠা ভক্ত-হৃদয়ে উত্তরোত্তর প্রবল হইতে থাকে, এবং তজ্জনিত সন্তাপও অসহ্য বলিয়া বোধ হয়। ইহা ভক্তমাত্রেরই স্বানুভবসম্বেদ্য। এই বিরহানুভূতি ও মিলনেচ্ছা প্রাকৃত ব্যক্তির নিকটে দুঃখরূপে প্রতীত হইলেও বাস্তবপক্ষে ইহাও আনন্দময় এবং অপূর্ব্ব চমৎকারময়। তাই শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

"রতিরনিশনিসর্গোষ্ণপ্রবলতরানন্দপূররূপৈব।
উষ্মাণমপি বহন্তী সুধাংশুকোটেরপি স্বাদ্বী॥"

এই ভাগবতী রতি স্বভাবতঃ আনন্দরূপিণী, ইহাতে প্রবলতর সন্তাপরূপতাও আছে, সুতরাং ইহা উষ্ণতাকে বহন করে অথচ কোটি চন্দ্র হইতেও হৃদয়গ্রাহিণী হইয়া থাকে। ইহার তাপস্বভাবতা ও স্নিগ্ধশীতলরূপতার প্রকৃত স্বরূপ মধুররস-নির্ণয়প্রসঙ্গে যথাস্থানে বিবেচিত হইবে।

ভক্তি পারমার্থিক রস

স্বভাবতঃ আনন্দরূপিণী এই ভাগবতী রতি রাগদ্বেষরহিত নির্ম্মল চিত্তবৃত্তিতে প্রতিফলিত হয় এবং সেই চিত্তবৃত্তিতে প্রতপ্ত লৌহপিণ্ডে প্রবিষ্ট অগ্নির ন্যায় ইহা অভিন্নভাবে প্রতীত হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই স্বয়ংপ্রকাশ রতিতাদাত্ম্যাপন্ন-ভক্তজনমনোবৃত্তিই ভক্তি শব্দের মুখ্য অর্থ। এই ভক্তিই রস বা পারমার্থিক রস বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে অভিহিত হয়, ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

এই রতিই হইল পরমার্থ-রসের স্থায়ী ভাব। লৌকিক রতিরূপ স্থায়ী ভাব—যেমন আলম্বন, উদ্দীপন ও অনুভাবের বৈচিত্র্য, বশতঃ বিচিত্রভাবে অভিব্যক্ত হইয়া সঞ্চারী ভাবনিচয়ের বিচিত্র সমাবেশে বিভিন্ন প্রকারে আস্বাদিত হয় এবং নানাবিধ রসরূপে পরিণত হয়, পরমার্থ-রসও সেইরূপ আলম্বন, উদ্দীপন, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবনিচয়ের বৈচিত্র্য বশতঃ নানাপ্রকারে আস্বাদিত হয় এবং নানাপ্রকার রস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ভক্তিশাস্ত্রের আচার্য্যগণ প্রধানভাবে এই পারমার্থিক রসকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন।

তাহার পঞ্চ রূপ

যথা—শান্ত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই ভাবে পঞ্চধা বিভক্ত পারমার্থিক রসের স্বরূপ এইক্ষণে যথাক্রমে আলোচিত হইতেছে।

শান্তভক্তি

শান্ত ভক্তিই ইহাদের মধ্যে প্রথম।

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শান্তভক্তিরসের এই ভাবে নিরূপণ করিয়াছেন, যথা—

"বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ শমিনাং স্বাদ্যতাং গতঃ।
স্থায়ী শান্তিরতির্ধীরৈঃ শান্তভক্তিরসঃ স্মৃতঃ॥"

ইহার বিভাব প্রভৃতি কি প্রকার, তাহা অগ্রে বলা যাইতেছে। শমনিরত ধীর ব্যক্তিগণ ঐ সকল বিভাবাদি দ্বারা শান্তি নামে প্রসিদ্ধ ভাগবতী রতিকে যখন আস্বাদন করেন, তখন সেই শান্তিরতিরূপ স্থায়ী ভাবই শান্তভক্তি-রস বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

সংসারে যাঁহাদের তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে, তাঁহারাই শমী বা শান্তিনিরত। মায়িক—পরিণামবিরস ও অচিরস্থায়ী শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধাদি ভোগ্য বস্তুনিচয় শমিগণের হৃদয়রঞ্জন করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহারা দুঃখময় সংসার হইতে ঐকান্তিকভাবে নিষ্কৃতি পাইবার আকাঙ্ক্ষায় প্রথমতঃ নির্গুণ নিরাকার সচ্চিদানন্দরূপ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকারলাভের জন্য যোগমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধিরূপ অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান করিতে করিতে দীর্ঘকাল অতীত হইবার পর তাঁহাদের বুদ্ধি স্বচ্ছ ও স্থির হয়, সেই স্বচ্ছ ও স্থির অন্তঃকরণে সচ্চিদানন্দরূপ পরব্রহ্মবিষয়িণী যে অখণ্ড বৃত্তি সমুদিত হয়, তাহাই বেদান্তশাস্ত্রে নির্ব্বিকল্পক সমাধি বলিয়া অভিহিত হয়। এই নির্ব্বিকল্পক সমাধিযুক্ত সাধক-গণই শমী বা শমনিষ্ঠ শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকেন। এই প্রকার নির্ব্বিকল্পক সমাধি যাঁহাদের প্রায় সর্ব্বদাই হইয়া থাকে, তাঁহাদিগকেই বৈদান্তিক আচার্য্যগণ 'জীবন্মুক্ত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জীবন্মুক্তের স্বরূপ কি, তাহার নিরূপণ করিতে যাইয়া বেদান্তসার-প্রণেতা সদানন্দ যতি বলিয়াছেন—

জীবন্মুক্ত

"জীবন্মুক্তো নাম স্বস্বরূপাখণ্ডব্রহ্মজ্ঞানেন তদজ্ঞানবাধনদ্বারা স্বস্বরূপাখণ্ডব্রহ্মণি সাক্ষাৎকৃতেহজ্ঞানতৎকার্য্যসঞ্চিতকর্ম্মসংশয়বিপর্য্যাসাদীনামপি বাধিতত্বাদখিলবন্ধ-বিরহিতো ব্রহ্মনিষ্ঠঃ।"

যাহা নিজের বাস্তবরূপ, সেই নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের জ্ঞান হওয়ায়, যাহার অজ্ঞান বাধিত হইয়াছে অর্থাৎ আত্মস্বরূপ নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইয়াছে বলিয়া যাহার অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াছে, অজ্ঞানের কার্য্য পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম (অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট) সকল প্রকার সংশয় ও বিপরীত জ্ঞানও যাহার বাধিত হইয়াছে, সুতরাং সংসারের সকল প্রকার বন্ধন হইতেও যাহার নিষ্কৃতিলাভ ঘটিয়াছে, সেই নির্ব্বিকল্পক ব্রহ্মসমাধিসম্পন্ন ব্যক্তিই জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

হৃদয়গ্রন্থি-ভেদ ও সংশয়-চ্ছেদ

এই প্রকার জীবন্মুক্তের স্বরূপ উপনিষদেও এইরূপে অভিহিত হইয়াছে, যথা—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥"

সেই পরাবর ব্রহ্মের দর্শন হইলে দর্শনকারীর হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সকল সংশয়ও ছিন্ন হয় এবং সকল সঞ্চিত কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

ব্যুত্থানদশার স্বরূপ

জীবন্মুক্ত ব্যক্তির সমাধিসময়ে যে প্রকার মানসিক অবস্থা হয়, তাহার বর্ণন করিয়া, যে সময় ব্যুত্থানদশা বা সমাধিভঙ্গ হইয়া থাকে, সে সময় তাহার মনোবৃত্তি কি প্রকার হয়, তাহাও বেদান্তসারে লিখিত হইয়াছে, যথা—

"অয়ং তু ব্যুত্থানসময়ে মাংসশোণিতমূত্রপুরীষাদিভাজনেন শরীরেণ আন্ধ্যমান্দ্যাপটুত্বাদিভাজনেন ইন্দ্রিয়গ্রামেণ অশনা-পিপাসা-শোক-মোহাদি-ভাজনেন অন্তঃকরণেন চ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-বাসনয়া ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি ভুজ্যমানানি জ্ঞানাবিরুদ্ধানি পশ্যন্নপি বাধিত্বাৎ পরমার্থতো ন পশ্যতি। যথেন্দ্রজালমিতি জ্ঞানবান্ তদিন্দ্রজালং পশ্যন্নপি পরমার্থমিদমিতি ন পশ্যতি। 'সচক্ষুরচক্ষুরিব সকর্ণঃ অকর্ণ ইব' ইতি শ্রুতেঃ।"

উক্তঞ্চ—

"সুষুপ্তবজ্জাগ্রতি যো ন পশ্যতি দ্বয়ং চ পশ্যন্নপি চাদ্বয়ত্বতঃ।
তথা চ কুর্ব্বন্নপি নিষ্ক্রিয়শ্চ যঃ স আত্মবিন্নান্য ইতীহ নিশ্চয়ঃ ॥

প্রপঞ্চদর্শনে জ্ঞান

এই জীবন্মুক্ত ব্যক্তির যখন সমাধিভঙ্গ হয়, তখন তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব চিরাভ্যস্ত সংস্কার বশতঃ দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ স্ব স্ব কার্য্যে সংসারী জীবের ন্যায়ই ব্যাপৃত হইয়া থাকে; মাংস, শোণিত, মল ও মূত্রাদিভাজন শরীর, অন্ধতা, দুর্ব্বলতা বা অপটুত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মযুক্ত ইন্দ্রিয়-সমূহ ও অশনা পিপাসা শোক মোহ প্রভৃতির আশ্রয় অন্তঃকরণও তাহার পূর্ব্ববৎ সংস্কার বশতঃ নানা প্রকার কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়; তত্ত্বজ্ঞানের সহিত যে সকল প্রারব্ধ কর্ম্মফলভোগের আত্যন্তিক বিরোধ নাই, এইরূপ ফলভোগ বা সুখদুঃখসাক্ষাৎকার তাহার সেই সময়ে হইলেও, এ সকলই তাহার নিকট বাধিত অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে; সুতরাং ঐ সকল ব্যবহার ও সুখদুঃখাদির দ্রষ্টা হইয়াও সে উহাদিগকে সংসারী জীবের ন্যায় পরমার্থতঃ দেখে না; যেমন 'ইহা ইন্দ্রজাল বা মিথ্যা' এইরূপ জ্ঞান যাহার আছে, সে সেই ইন্দ্রজালদর্শনকালেও ইহা পরমার্থ

বা সত্য, এইরূপ বোধ করে না অথচ তাহা দেখিয়াও থাকে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তির সংসারদৃষ্টিও সেইরূপই হইয়া থাকে। এই কারণে ব্যুত্থানদশাতে প্রাকৃতজনের ন্যায় সে সকল কার্য্যই করিয়া থাকে, অথচ কোন কার্যই সে করে না। তাহার প্রপঞ্চদর্শন হয় বটে, কিন্তু সেই প্রপঞ্চদর্শনে তাহার ভেদদর্শন হয় না; কিন্তু অদ্বয় ব্রহ্মদর্শনই হইয়া থাকে। ব্যুত্থানকালে যাহার এইরূপ অবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাকেই আত্মবিদ্ বা জীবন্মুক্ত বলা যায়। ইহাই হইল অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নির্ণয়।

ব্রহ্মনিষ্ঠের চরম ভাবনা

এইপ্রকার জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কিন্তু শান্তভক্ত নহে, ইহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানী বলা যাইতে পারে। এইপ্রকার জীবন্মুক্তাবস্থা লাভ হইবার পর শ্রীভগবানের অনুগ্রহে কাহার কাহারও ভাগ্যে জ্ঞাননির্ম্মলীকৃত অন্তঃকরণবৃত্তিতে ভাগবতী রতির স্ফুরণ হইয়া থাকে, তাঁহাদিগকেও ভক্তিশাস্ত্রের আচার্য্যগণ শান্ত ভক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়িণী মনোবৃত্তি যখন পূর্ণভাবে স্থিরতা লাভ করে, তখন সর্ব্বোপাধিবিরহিত সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়, এইরূপ সাক্ষাৎকারই হইল অদ্বয়ব্রহ্মবাদীর চরম লক্ষ্য। ইহার অপেক্ষা অধিক আরও কিছু ধ্যেয় বা জ্ঞেয় আছে বা থাকিতে পারে, ইহা অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করেন না। ইহাই হইল জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ, ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত।

ইহারও অগ্রে ভগবৎ ধ্যান, জ্ঞানও আস্বাদ

সাধকবিশেষের পক্ষে ইহাই চরম সিদ্ধান্ত হইতে পারে, কিন্তু ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রে দেখা যায় যে, এইরূপ নির্গুণ ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারের পরও ইহা অপেক্ষা অধিক আরও কিছু ধ্যেয়, জ্ঞেয় বা আস্বাদ্য বস্তু বিদ্যমান আছে। সেই ধ্যেয়, জ্ঞেয় ও আস্বাদ্য বস্তুই হইতেছেন শ্রীভগবান্। তাই ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥"

হে বিভো, শ্রেয়োলাভের একমাত্র উপায়স্বরূপ তোমার প্রতি ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা কেবল অদ্বয় ব্রহ্মবোধের জন্য ক্লেশ অঙ্গীকার করিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে তণ্ডুলবিরহিত তুষ-সমূহের অবঘাতের প্রযত্নের ন্যায় সেই

অদ্বয়জ্ঞানলাভের প্রয়াস কেবল ক্লেশেরই কারণ হয়, অর্থাৎ মানবজন্মের চরম চরিতার্থতা তাহাদের ঘটিয়া উঠে না।

গীতার উক্তি

ভগবদ্‌গীতাতেও ইহাই বিস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

ইহার অর্থ—যখন চিত্তশুদ্ধিবশতঃ আত্মা প্রসাদ লাভ করে, তত্ত্বসাক্ষাৎকারের ফলে অজ্ঞ জীব ব্রহ্মস্বরূপকে আবার ফিরিয়া পায়, তখন তাহার শোক নিবৃত্ত হয়, কোন প্রকার ভোগ্য বিষয়ের প্রতি আকাঙ্ক্ষাও থাকে না এবং সকল প্রাণীর প্রতি সমতা লাভ করে, এইরূপে জীবন্মুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই আমার (অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বাসুদেবের) প্রতি পরা বা প্রেমলক্ষণা ভক্তিকে লাভ করিয়া থাকে, সেই ভক্তির প্রভাবেই আমার যাহা বাস্তব স্বরূপ ও মহিমা, তাহা সে অবগত হইয়া থাকে. তাহার পর সে নির্গুণ নিরাকার মদীয় প্রভারূপ অদ্বয় ব্রহ্মেরও আশ্রয়স্থানীয় যে রসঘন আনন্দস্বরূপ আমার চৈতন্যজ্যোতির্ম্ময় বিগ্রহ, তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া যায়।

ভগবদ্ বিগ্রহ অদ্বয় ব্রহ্মের আশ্রয়

সর্ব্বথা চিদ্রূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট নিখিল সৌন্দর্য্যের সার, সকল মাধুর্য্যের সার, প্রতিক্ষণ নূতন ও সর্ব্বাশ্চর্য্যময় সেই ভক্তিমাত্রলভ্য শ্রীভগবদ্বিগ্রহই যে ভূমা নির্গুণ নিরাকার অদ্বয় ব্রহ্মের আশ্রয়, তাহাও গীতাতে শ্রীভগবান্ স্পষ্টভাবেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—

"ব্রহ্মণোহহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥"

আমি অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বাসুদেবই অনাদি ও অনন্ত সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আধার, অপরিবর্ত্তনস্বভাব সনাতন ধর্ম্ম ও আত্যন্তিক সুখেরও আমিই আশ্রয়।

প্রেমভক্তি অদ্বয় জ্ঞানের দ্রাবক

নির্ব্বিকল্প সমাধির প্রভাবে সিদ্ধিপ্রাপ্ত জ্ঞানীর নিকট যখন সমস্ত সংসারই একমাত্র ব্রহ্মরূপে প্রতীত হইতে থাকে, শত্রু, মিত্র ও উদাসীন সকল জীবই যখন আত্মরূপেই প্রতিভাত হইয়া উঠে, তখনই তাহার শ্রীভগবানের প্রতি প্রেম-লক্ষণা ভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই সিদ্ধান্তই উপরে উদ্ধৃত কয়টি শ্লোকের দ্বারা গীতা প্রতিপাদন করিতেছে। প্রেমলক্ষণা ভক্তির উদয় যখনই প্রথমে অদ্বয় ব্রহ্মনিষ্ঠের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়, তখন হইতেই তাহার অদ্বৈতব্রহ্মপ্রবণতা শিথিল হইতে আরম্ভ করে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে ইহা আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, যথা—

"তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥"

অক্ষরোপাসকগণ নির্গুণ, নিরাকার ও অখণ্ড ব্রহ্মবিষয়ক সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া আত্মভূত ব্রহ্মানন্দসাক্ষাৎকারে যখন তন্ময় হইয়াছিলেন, এমন সময় হঠাৎ অনন্ত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের একান্ত আধার সচ্চিদানন্দঘনরসরূপ শ্রীভগবানের পাদপদ্মে ভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রেমভরে অর্পিত মঞ্জরী-মিশ্রিত তুলসীদলনিবহের মধুর মকরন্দ-সুরভিত দিব্য গন্ধময় বায়ু নাসাবিবর দিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, তাঁহাদের অন্তঃকরণ ও সমস্ত শরীরকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

সর্ব্বাতিশায়ী প্রভাব

এই শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ শ্রীরূপগোস্বামিপাদ অতি সুন্দরভাবে বর্ণন করিয়াছেন, যথা—

"ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-
র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেষ তাবৎ।
যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাং
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণীপান্থতাং নৈব যাতি॥"

নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যপ্রভৃতি সিদ্ধিনিচয় সেই পর্য্যন্তই বিজয় লাভ করিয়া থাকে, পরমার্থসদ্ভাবাপাদক নির্ব্বিকল্প সমাধিও সেই পর্য্যন্ত অবস্থান করিতে পারে, সকল প্রকার বৈষয়িক সুখের অবধিস্বরূপ গুরু ব্রহ্মানন্দও সেই কাল পর্য্যন্ত হৃদয়ে চমৎকার উৎপাদন করিতে প্রভু হইয়া থাকে, যে পর্য্যন্ত শ্রীমধুসূদনকে

বশীভূত করিয়া রাখিবার সিদ্ধৌষধিস্বরূপ প্রেমভক্তির গন্ধ অন্তঃকরণপথে পথিকরূপে সমুদিত না হয়।

ইহার একমাত্র উপায় তাঁহার কৃপা

ব্রহ্মসমাধিনিমগ্ন জীবন্মুক্তগণের এই ভাবের সঙ্কল্প-বিচ্যুতি ও চিত্তবিক্ষোভের হেতু হইয়া থাকে—করুণাময় শ্রীহরির নিরুপাধিক করুণা! এই করুণাকটাক্ষপাতেরই পরিণামস্বরূপ হইয়া থাকে—শ্রীভগবানের মধুর সুন্দর ও সর্ব্বাশ্চর্য্যময় শ্রীবিগ্রহ-দর্শন। সকল জীবন্মুক্তের ভাগ্যে এইরূপ দর্শন ঘটে না, তবে কাহার ভাগ্যে ঘটে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত উপনিষদ্ বলিতেছেন—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্॥"

সমস্ত অধ্যাত্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যানপটুতা দ্বারা সকলের আত্মভূত এই পরম পুরুষকে পাওয়া যায় না, ধারণাশালিনী তীক্ষ্ণবুদ্ধির দ্বারাও ইহার দর্শন পাওয়া যায় না, সমগ্র জীবন ভরিয়া সমস্ত শ্রুতির অনুশীলন করিলেও ইঁহার স্বরূপোপলব্ধি হয় না, তিনি কিন্তু যাহাকে আপনার জন বলিয়া বাছিয়া লন, সেই তাঁহার নিজ জন হইয়া থাকে এবং সেই নিজ জনের নিকটেই তিনি শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

ইহার আস্বাদে পরমহংস মনও ব্রহ্মপদ হইতে অপসৃত হয়

জীবন্মুক্তিলাভের পর প্রেমভক্তির আবির্ভাবের হেতুস্বরূপ এই ভগবদ্রূপদর্শন প্রসঙ্গে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

"শ্যামাকৃতিঃ স্ফুরতি চারুচতুর্ভুজোঽয়ং
আনন্দরাশিরখিলাত্মতরঙ্গসিন্ধুঃ।
যস্মিন্ গতে নয়নয়োঃ পথি নির্জ্জিহীতে
প্রত্যক্‌পদাৎ পরমহংসমুনের্মনোঽপি॥"

মনোহর চারিটি বাহুতে সুশোভিত শ্যামসুন্দর আকৃতি দীপ্তি পাইতেছে, দেখিলে বোধ হয়—সমস্ত সংসারের সকল আনন্দ যেন রাশীভূত একত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে, এ যেন সেই মহাসিন্ধু—যে সিন্ধুর অপার ও অনবধি বক্ষে জগতের সমস্ত জীবাত্মা তরঙ্গমালার ন্যায় উঠিতেছে, খেলিতেছে। এই সর্ব্বাশ্চর্য্যময় মনোহর মূর্ত্তি একবার নয়নপথের পথিক হইলে জীবন্মুক্ত পরমহংসপদভাক্

মুনির মনও নির্গুণ নিরাকার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মপদ হইতে অতি দূরে সরিয়া পড়ে। এই চিদানন্দঘন ভগবদ্‌বিগ্রহ দর্শনের সময় হইতেই জীবন্মুক্তগণ ভক্তিসুখাস্বাদের অধিকারী হইয়া থাকেন, এইরূপ অবস্থার উদয় হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণ শান্ত ভক্তশ্রেণীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহাদের তাৎকালিক মনোবৃত্তির পরিচয় তাঁহাদের মুখেই শুনা যাক্—

"সমস্তগুণবর্জ্জিতে করণতঃ প্রতীচীনতাং
গতে কিমপি বস্তুনি স্বয়মদীপি তাবৎ সুখম্।
ন যাবদিয়মদ্ভুতা নবতমালনীলদ্যুতে-
র্মুকুন্দসুখচিদ্‌ঘনা তব বভূব সাক্ষাৎকৃতিঃ॥"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

শান্তভক্তির বিশেষত্ব

হে মুকুন্দ! সে এক দিন ছিল—যে দিন নিখিলগুণবর্জ্জিত সুতরাং সকল প্রকার প্রমাণের অবিষয় কোন এক তত্ত্ব স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া সুখরূপে আমার নিকট প্রকটিত হইয়াছিল, কিন্তু সে দিন এই অত্যাশ্চর্য্যকর নবতমালনীলদ্যুতি জগন্মোহিনী অথচ ঘনীভূত চিদানন্দরূপিণী তোমার মূর্ত্তি প্রত্যক্ষের গোচর হয় নাই, আজ কিন্তু ইহার প্রকাশে সেই অদ্বয় তত্ত্বের স্ফূর্ত্তিময় সুখও আর স্পৃহণীয় হইতেছে না এবং তাহাও যেন এই ঘনীভূত চিদানন্দময় শ্রীমূর্ত্তিপ্রকাশের মধ্যে কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারের পর এই সমস্ত গুণগণমণ্ডিত নিত্য নূতন সর্ব্বাশ্চর্য্যময় শ্রীবিগ্রহ বিশুদ্ধ চিত্তবৃত্তিতে পরিস্ফুরিত হইবামাত্র জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে যে উল্লাসময়ী ভাগবতী রতির উদয় হইয়া থাকে, সেই রতিকেই শান্ত ভক্তি বলা যায়। ইহাতে আকাঙ্ক্ষা আছে, সে আকাঙ্ক্ষা কেবল নির্নিমেষনেত্রে দেখিবারই আকাঙ্ক্ষা, যতই দর্শন হয়, ততই সে আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যায়। তাহার ফলে সেই আকাঙ্ক্ষাময় শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ আরও যেন ঘনীভূত হইতে থাকে, তৃপ্তিরও সীমা থাকে না। এই অনুপম সৌন্দর্য্যানুভূতিতে মমতার স্ফূর্ত্তি নাই, উন্মাদনা নাই, সম্বন্ধস্থাপনের জন্য কোন অভিলাষও নাই। এই কারণে এই ভক্তি রাগময়ী হইয়াও সম্বন্ধানুগা হয় না। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসরূপা প্রেমভক্তি হইতে ইহাই হইল ইহার বিলক্ষণতা।

মুক্তি ও ভক্তি

(১)

মুক্তি সকল দর্শনের লক্ষ্য

সকল ভারতীয় দর্শনেরই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য—মুক্তি। এই মুক্তি আবার দুই ভাগে বিভক্ত—মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য মুক্তিকে নির্ব্বাণ বা কৈবল্য বলা যায়। নির্ব্বাণ বা কৈবল্য শব্দের মোটামুটি অর্থ, আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি। অর্থাৎ জীবের যে অবস্থায় সকল প্রকার দুঃখ নিবৃত্ত হয় অথচ ভবিষ্যতে আর কখনও তাহার কোন প্রকার দুঃখ হইবার সম্ভাবনাও থাকে না, সেই অবস্থাই জীবের কৈবল্য বা নির্ব্বাণ। চার্ব্বাক, বৌদ্ধ প্রভৃতি নাস্তিক দার্শনিকগণ হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্বৈতবাদী পর্য্যন্ত সকল দার্শনিকগণ নির্ব্বাণ বা কৈবল্যের এইরূপ বিবৃতি অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। ইহাই হইল উক্ত শব্দ দুইটির সর্ব্বসম্মত ব্যাখ্যা, কিন্তু এই প্রকার মুক্তি হইলে জীবের অহংভাব থাকে কি না, তাহার সুখানুভব হয় কি না, শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত তাহার এখনকার ন্যায় সম্বন্ধ থাকে কি না ইত্যাদি বিষয় লইয়া আস্তিক ও নাস্তিক দার্শনিকগণের মধ্যে অনেক প্রকার মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। সংক্ষেপে তাহারও আলোচনা করা যাইতেছে।

লোকায়ত বা চার্ব্বাক মত

চার্ব্বাক ও বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মতে মোক্ষাবস্থায় জীবের অস্তিত্বই থাকে না; সুতরাং দুঃখভোগ করিবার সম্ভাবনারও নিবৃত্তি হয়। তাহার মধ্যে বিশেষ হইতেছে এই যে, চার্ব্বাকমতে এই দেহের বিধ্বংস হইলেই মুক্তি হয়। কারণ, এই ভৌতিক দেহ হইতে পৃথক্ আত্মা নাই; সুতরাং দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গেই সকল ভবযন্ত্রণা মিটিয়া যায়। তাঁহারা বলেন—

> "আত্মাস্তি দেহব্যতিরিক্তমূর্ত্তির্ভোক্তা স লোকান্তরিতঃ ফলানাম্।
> আশেয়মাকাশতরোঃ প্রসূনাৎ প্রথীয়সঃ স্বাদুফলাভিসন্ধৌ॥"
>
> (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ—চার্ব্বাকদর্শন)

অর্থাৎ দেহ হইতে যাহার স্বরূপ পৃথক্, এইরূপ এক আত্মা এই দেহে আছে, আর সেই আত্মা লোকান্তরে যাইয়া এই লোকে কৃতকর্ম্মের ফলভোগ

করিবে, এই প্রকার যে আশা, তাহা আকাশতরুর পুষ্প হইতে স্বাদু ফল হইবে এবং সেই ফল আস্বাদন করা যাইবে, এই প্রকার আশা আকাশ কুসুমের ন্যায় অর্থাৎ এই প্রকার কল্পনা একান্ত ভিত্তিহীন। ইহারা তাই বলিয়া থাকেন—

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদ্ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য-পুনরাগমনং কুতঃ॥"

(সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ—চার্ব্বাকদর্শন)

অর্থাৎ যতদিন বাঁচিয়া থাক, সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর—প্রয়োজন বোধ করিলে ঋণ করিয়াও ঘৃত ক্রয়পূর্ব্বক খাইবে। এই দেহ একবার পুড়িয়া ছাই হইলে আর কি কখন ফিরিয়া আসিবে?—কখনই নহে। যে কোন প্রকারে পার ভোগের সাধন সংগ্রহ করিয়া স্ফূর্ত্তিতে কাল কাটাও; ধর্ম্মাধর্ম্ম ভাবিয়া এ সংসারের সুখে বঞ্চিত হইও না। ইহাই চার্ব্বাক দার্শনিকগণের মত। চার্ব্বাকদর্শনের আর একটি নাম লোকায়তিক দর্শন। লোকসমূহে যাহা আয়ত অর্থাৎ অত্যন্ত বিস্তৃত ভাবে প্রচলিত, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া এই দর্শন রচিত হইয়াছে বলিয়া এই দর্শনের নাম লোকায়তিক। পৃথিবীর শতকরা নিরানব্বই জন মানব এই মতানুসারে যে চলিয়া থাকে, তাহা বলাই বাহুল্য। এই মত কতদূর প্রমাণসঙ্গত এবং কি প্রকার প্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা এই মত খণ্ডিত হয়, তাহা এই প্রবন্ধে অলোচ্য নহে।

বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদ

বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মতে এই দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সকল বস্তুই ক্ষণিক। ইহারা যে ক্ষণে উৎপন্ন হয়, তাহার পরবর্ত্তী ক্ষণেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়; সুতরাং ইহাদের বিনাশের জন্য পৃথক্ কোন সাধনানুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই। এই বিনশ্বর দেহাদির উপর স্থিরতা-জ্ঞানই আমাদের সকল দুঃখের নিদান এবং সেই স্থিরতা-জ্ঞানরূপ ভ্রান্তি হইতেই ইহাদের উপর আমাদের আত্মত্ব-ভ্রান্তি হয়। আত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ কোন স্থির বস্তু এ জগতে নাই; ধ্যান-সমাধি-প্রভাবে এই স্থিরাত্মত্বজ্ঞান যখন একেবারে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইবে, সকল অস্থির বস্তুকেই ক্ষণিক ও মায়িক বলিয়া দৃঢ়ভাবে বুঝিতে পারিব, তখনই আমাদের সকল প্রকার দুঃখ নিবৃত্ত হইবে। আত্মা বলিয়া একটা

মায়িক বস্তু কল্পনার বা ভ্রান্তির সাহায্যে সৃষ্ট করিয়া আমরা এই ভবযন্ত্রণার সৃষ্টি করিয়াছি। ভ্রান্তিমূলক অনর্থের নিবারণ করিতে হইলে এই ভ্রান্তিরই উচ্ছেদ করা প্রয়োজন; তত্ত্বজ্ঞানই ভ্রান্তির উচ্ছেদক হইয়া থাকে। সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে অষ্টাঙ্গ-যোগের সাধনা করিতে হয়। যোগসাধনায় চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে তত্ত্বজ্ঞান বা সকল বস্তুতে ক্ষণিকতা জ্ঞান আপনা আপনি উদিত হইয়া থাকে। ইহার জন্য যজ্ঞ, তপস্যা বা তীর্থপর্য্যটনাদির কোন আবশ্যকতা নাই। ইহাই হইল মোটামুটি বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মত। এই প্রসঙ্গে এই মতের যুক্তিযুক্ততা বা অযৌক্তিকতা বিচার্য্য নহে। এক্ষণে দেখা যাউক, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক নামে প্রসিদ্ধ আস্তিক দার্শনিকগণের মতানুসারে নির্ব্বাণ বা কৈবল্যের সময় আমাদের আত্মার কিরূপ অবস্থা হইয়া থাকে।

ন্যায়-বৈশেষিক মত

নৈয়ায়িকগণ বলেন—আত্মা অজর ও অমর, ইহা আকাশের ন্যায় নিরবয়ব ও বিভু। সকল পরিচ্ছিন্ন বস্তুর সহিত যাহা মিলিত হইয়া সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে, তাহাকেই বিভু বলা যায়, আত্মা এই কারণে নিষ্ক্রিয়। যে বস্তুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয় তাহা সর্ব্বব্যাপক হইতে পারে না। কারণ, ক্রিয়া হইলেই সেই ক্রিয়াশ্রয় বস্তু বিচলিত বা পূর্ব্বস্থানভ্রষ্ট হয়। যাহা সর্ব্বদা একভাবে সকল স্থান ব্যাপিয়া থাকে, তাহা হইতে ক্রিয়া কিরূপে হইতে পারে? সেই বিভু বা ব্যাপক আত্মার গুণ হইতেছে জ্ঞান। জ্ঞান ও চেতনা একই বস্তু। এই চেতনা আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া তাহা চেতন। চেতন আত্মার আরও কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে, যথা—ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য ও সংস্কার বা বাসনা। এই সকল গুণ আত্মাতে সর্ব্বদাই যে থাকে, তাহা নহে—বিশেষ বিশেষ কারণের সহিত সম্বন্ধ ঘটিলে এই গুণগুলি যথাসম্ভব আত্মাতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন আকাশের গুণ শব্দ অথচ শব্দ সকল সময়ে আকাশে থাকে না, দুই হাতে তালি দিলে আকাশে শব্দ উৎপন্ন হয়; তেমনই জ্ঞান প্রভৃতি বিশেষ গুণ সকল সময়ে আত্মাতে যে হইবে, তাহা নহে; আমরা যখন ঘুমাইয়া পড়ি, তখন আমাদের জ্ঞান বা ইচ্ছা প্রভৃতি কোন গুণ থাকে না; কিন্তু জাগরণ বা স্বপ্নকালে মনের সহিত সংযোগ-বিশেষরূপ কারণ ঘটিলে আত্মাতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই সংযোগবিশেষ নিদ্রার সময় হয় না বলিয়া সে সময় আমাদের জ্ঞানও হইতে পারে না।

দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে অনাদিকাল চলিয়া আসিতেছে যে অহন্তা-জ্ঞান বা মমতাজ্ঞান, তাহাই আমাদের সকল প্রকার দুঃখের কারণ।. সুতরাং এই অহংজ্ঞান ও তন্মূলক মমতা-জ্ঞানের উচ্ছেদ করিতে পারিলেই আমাদের দুঃখ-নিবৃত্তি বা নির্ব্বাণ হইতে পারে। আত্মা দেহ নহে, আত্মা ইন্দ্রিয়াদিরূপ জড়বস্তু নহে, এই প্রকার তত্ত্বজ্ঞানই সেই দেহাদিতে অহন্তা-জ্ঞান ও তন্মূলক মমতা-জ্ঞানের নিবর্ত্তক হয়। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি, শাস্ত্র ও গুরুর সাহায্যে তাহা শ্রবণ করিয়া মনন ও ধ্যান করিতে করিতে কালে সেই তত্ত্বজ্ঞান উদিত হয়। তত্ত্বজ্ঞান হইলে মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ আমিই দেহ বা আমার দেহ প্রভৃতি এইরূপ ভ্রান্তি আর হয় না। মিথ্যাজ্ঞান এইভাবে নিবৃত্ত হইলে দোষ অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান-মূলক রাগ ও দ্বেষ নিবৃত্ত হয়। দোষ নিবৃত্ত হইলে তন্মূলক প্রবৃত্তি অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য নিবৃত্ত হয়। সেই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইলে আর জন্ম হইবার সম্ভাবনা থাকে না। জন্ম না হইলে আর দুঃখ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এইভাবে তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে ক্রমে সকল দুঃখের নিবৃত্তি বা আত্যন্তিক অনুৎপত্তিই আত্মার মোক্ষ বা নির্ব্বাণ। তাই ন্যায়দর্শনে মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন "দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যা-জ্ঞানানাং উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।" সুতরাং ন্যায়মতানুসারে ইহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে যে, মোক্ষদশায় শব্দহীন আকাশের ন্যায় আত্মা একেবারে অজ্ঞান হইয়া থাকে, সে অবস্থায় তাহাতে সুখ বা দুঃখ হয় না। এই মোক্ষাবস্থায় সংজ্ঞাহীন প্রস্তরাদির ন্যায় আত্মাও চেতনাহীন হইয়া থাকে, তাহার অনাদিকালের সঙ্গী অহংভাব একেবারে বিলুপ্ত হয়। এক কথায় অহন্তা বা জীবভাবের আত্যন্তিক অস্ফুরণই আত্মার নির্ব্বাণ বা কৈবল্য। ইহাই হইল ন্যায় ও বৈশেষিক মতে মোক্ষের স্বরূপ।

সাংখ্য-যোগ-মত

সাংখ্য ও যোগমতে মোক্ষদশায় আত্মা কিভাবে অবস্থান করে, এইবার তাহাই দেখা যাউক। সাংখ্য ও যোগদর্শনে আত্মা কেবল জ্ঞানস্বরূপ। সেই আত্মা আকাশের ন্যায় ব্যাপক অথচ বহু; প্রত্যেক দেহের সহিত এক একটি আত্মার সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ আছে বলিয়া দেহের মধ্যে অবস্থিত বুদ্ধিতত্ত্ব নামক প্রাকৃত বস্তুতে উৎপন্ন সুখ ও দুঃখাদির সহিত আত্মার একপ্রকার ঔপাধিক সম্বন্ধ হয় এবং সেইজন্যই আত্মা সুখদুঃখাদিরহিত হইলেও সুখী ও দুঃখী, এইপ্রকার বোধের বিষয়ীভূত হয়। এইপ্রকারে সুখ ও দুঃখের ভোগ আত্মাতে হয়

বলিয়া তাহা সংসারী হইয়া পড়ে, নিঃসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ আত্মার সহিত প্রকৃতির কার্য্য জড়বস্তুর এইরূপ সম্বন্ধই আমাদের যাবতীয় অনর্থের হেতু। এই সম্বন্ধের কারণ হইতেছে জড় ও চেতনের অবিবেক। সেই অবিবেক পরস্পরের প্রকৃত স্বরূপজ্ঞান বা বিবেকখ্যাতি দ্বারা বিনাশিত হইলেই আত্মা মুক্ত হইয়া থাকে। এই মুক্ত দশায় আত্মা কেবল জ্ঞান বা প্রকাশরূপেই অবস্থিতি করে। তখন অহংজ্ঞান থাকে না এবং আমি সুখী বা দুঃখী, এইপ্রকার কোন জ্ঞানই থাকে না,—এই মুক্তির সময় আত্মার স্বপ্রকাশময় অস্তিত্ব ব্যতিরেকে অন্য কোন ধর্ম্ম থাকে না। ইহাই হইল সাংখ্য ও যোগমতে নির্ব্বাণের স্বরূপ।

শঙ্কর-মতে মোক্ষ স্বরূপ

শাঙ্করমতানুযায়ী অদ্বৈতবাদিগণের মতে মোক্ষের স্বরূপ কি, এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক। এই মতে আত্মা জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, আত্মাই একমাত্র সদ্বস্তু—আত্মা ব্যতিরেকে আর যাহা কিছু সৎ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা বাস্তবিক সৎ নহে। শুক্তির সত্তা যেমন তাহাতে আরোপিত অর্থাৎ কল্পিত রজতে প্রতীত হয়, সেই স্থলে দৃশ্যমান রজত বাস্তব সৎ নহে, শুক্তিই সৎ বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ বাস্তবিক সৎ না হইলেও ইহার অধিষ্ঠান যে ব্রহ্ম বা আত্মা, তাহার সত্তাই ইহার উপর আরোপিত হইয়া থাকে। আবার দেখ, শুক্তিতে অজ্ঞানবশতঃ রজতের সাক্ষাৎকার স্থলে যেমন শুক্তির স্বরূপ প্রত্যক্ষ হইলে ঐ আরোপিত বা কল্পিত রজত নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের নিরুপাধিকভাবে সাক্ষাৎকার হইলে তাহার উপর আরোপিত এই সমস্ত প্রপঞ্চই নিবৃত্ত হয়। এইপ্রকার প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি হইলেই আত্মা মুক্তিলাভ করে। প্রকৃতপক্ষে আত্মা কোন সময়েই বদ্ধ হয় না, তাহা সর্ব্বদাই মুক্ত; কেবল অনাদি অজ্ঞান বা অবিদ্যাবশতঃ তাহার উপর এই প্রাপঞ্চিক দুঃখ-শোকাদি আরোপিত হইয়াছে মাত্র। এই আরোপিত সাংসারিক ভাব সুতরাং তাহার বাস্তব নহে, উহা আধ্যাসিক বা কল্পিত। এই কল্পিত সংসারই তাহার বন্ধন; এই বন্ধন হইতে উদ্ধারলাভের একমাত্র উপায় তাহার প্রকৃত স্বরূপের সাক্ষাৎ অনুভূতি। সেই অনুভূতির উপায় শ্রবণ, মনন ও ধ্যান। দীর্ঘকাল বিরক্তির সহিত এই আত্মস্বরূপের শ্রবণ, মনন ও ধ্যান করিতে করিতে জীব স্বীয় ব্রহ্মরূপতা বা অখণ্ড চিদানন্দস্বরূপতা সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হয় এবং সেই সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সকল প্রকার

কল্পিত অনর্থের নিবৃত্তি হয়। ইহাই হইল সংক্ষেপতঃ অদ্বৈতবাদী বেদান্তি-গণের মতে মোক্ষ বা নির্ব্বাণের স্বরূপ। মীমাংসকগণের মতেও নির্ব্বাণ আত্মার আনন্দরূপতার নিরবধি স্ফুরণ হইতে থাকা। অবশ্য সকল মীমাংসকই আত্মাকে মুক্ত দশায় আনন্দের অনুভবিতা বলিয়া স্বীকার করেন না; কিন্তু মুক্ত অবস্থায় আত্মা যে দুঃখ অনুভব করে না, ইহা সকল মীমাংসকেরই স্বীকার্য্য। বিস্তারভয়ে সেই সকল মতভেদ এ স্থলে প্রদর্শিত হইল না।

এক্ষণে প্রকৃতের অনুসরণ করা যাউক। এইরূপে দেখা গেল যে, মুখ্যমুক্তি বা নির্ব্বাণ-লাভ হইলে জীবের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নিবৃত্ত হয় এবং আর কোন সময় তাহার দুঃখভোগের সম্ভাবনা থাকে না। এই বিষয়ে কি আস্তিক কি নাস্তিক সকল দার্শনিকেরই ঐকমত্য আছে।

গৌণ মুক্তির পঞ্চভেদ

এইবার একটু গৌণ মুক্তির আলোচনা করা যাইতেছে। গৌণ মুক্তি চারি ভাগে প্রবিভক্ত হইয়া থাকে, যথা—সালোক্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য ও সারূপ্য। জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন নহে; জীব কখনও ঈশ্বর হইতে পারে না, এই প্রকার যাঁহারা অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতানুসারেই এইভাবে গৌণ মুক্তি চারিভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। ঈশ্বর যে লোকে সর্ব্বদা প্রকাশ পাইয়া থাকেন, সেই বৈকুণ্ঠাদি লোকে বাস করার নাম সালোক্য মুক্তি। বলা বাহুল্য, এই সালোক্যরূপ মুক্তিদশাতেও জীবের কোন প্রকার জরা, মরণ, ব্যাধি ও শোকাদিজনিত সাংসারিক দুঃখভোগ করিতে হয় না। ঈশ্বরের সমান ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি লাভই সার্ষ্টি মুক্তি। তাঁহার সহিত সর্ব্বদা একত্র বাস করাই সাযুজ্য মুক্তি এবং তাঁহার ন্যায় আকারবান্ হইয়া ঐশী শক্তিলাভ করার নাম সারূপ্য মুক্তি। বলা বাহুল্য, পরমেশ্বরকে যে সকল দার্শনিক সাকার ও নিয়ত লোকবিশেষে অবস্থিত বলিয়া অঙ্গীকার করেন, তাঁহাদের মতানুসারে এইপ্রকারে মুক্তির চারিটি বিভাগ বর্ণিত হইল। কিন্তু অদ্বৈতবাদী বেদান্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ জীবন্মুক্তিরূপ গৌণ মুক্তিও অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। এই জীবন্মুক্তি এই সাধনার দেহ থাকিতে থাকিতেই হইতে পারে। বৌদ্ধ দার্শনিকগণও এই জীবন্মুক্তি অঙ্গীকার করিয়া থাকেন।

জীবন্মুক্ত বা গুণাতীত

ইহা তত্ত্বজ্ঞানের পরিপাকদশাতেই হইয়া থাকে। এই জীবন্মুক্তির স্বরূপ শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রে নানা প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। উপনিষদ্ বলিতেছে—

"যদা সর্ব্বেপ্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদি স্থিতাঃ॥
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥"

এই আত্মতত্ত্বজ্ঞ যোগীর হৃদয়ে সকল প্রকার কামনা যে সময় একেবারে নিবৃত্ত হয়, তখন সে মানুষ হইলেও অমৃত হয় এবং এই দেহেই সেই আনন্দ-চিন্ময় ব্রহ্মস্বরূপের আস্বাদন করিয়া থাকে।

ঈশ্বর-কৃষ্ণকৃত সাংখ্যকারিকায় উক্ত হইয়াছে—"এবং তত্ত্বাভ্যাসাৎ নাস্মিন্ মে নাহমিত্যপরিশেষম্ অবিপর্য্যয়াদ্‌বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্।" এই প্রকারে তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাস বা ধ্যান করিতে করিতে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রসাদে এক অখণ্ডাকার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া সেই দেহে অহন্তা বা মমতার প্রকাশ হয় না; আত্মার যে অহমাকার, তাহাও তখন প্রকাশ পায় না।

গীতাতে জীবন্মুক্তকে গুণাতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—এই গুণাতীতের লক্ষণ তাহাতে অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

"প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্ম কাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানয়ো স্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গুণাতীত বা জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সুখ, দুঃখ ও মোহময় সকল গুণকার্য্য উপেক্ষা করিয়া প্রশান্তভাবে অবস্থিতি করেন। কোন গুণচেষ্টাই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তিনি ভাবিয়া থাকেন, গুণ সকল গুণসমূহে ন্যূনাধিকভাবে মিশ্রিত হইয়া ঐ সকল কার্য্য করিতেছে, তাহাতে আমার বিচলিত হইবার কারণ কিছুই নাই। সুখ ও দুঃখ তাঁহার সমক্ষে তুল্য বলিয়া প্রতীত হয়, বহুমূল্য প্রস্তর বা লোষ্ট্র কিংবা সুবর্ণ সকলই

তাঁহার তুল্যমূল্য বা হেয় বলিয়া প্রতীত হয়। তাঁহার কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় থাকে না, তাঁহার মিত্র ও শত্রু সম হয়, ইহা আমার হউক বা ইহা আমার হইবে, এই প্রকার ইচ্ছায় তিনি কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়েন না। নিজ নিন্দা, স্তুতি, মান ও অপমানে তিনি সমভাব; তিনি সর্ব্বদা ধীর ও নিরুদ্বিগ্ন থাকেন। এই প্রকার জীবন্মুক্তি মানবসাধনার যে পরমসিদ্ধি, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ ও জৈন দার্শনিকগণও এই প্রকার জীবন্মুক্তিকে আর্হতাবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সুখ ও দুঃখের পরস্পর প্রতিকূল তরঙ্গে উদ্বেলিত সংসারসমুদ্রে নিমগ্ন মানবের পক্ষে এই প্রকার মানসিক শান্তিময় অবস্থা যে একান্ত স্পৃহনীয়, তাহা কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারেন না।

৫ তত্ত্বজ্ঞান ভক্তি-লভ্য

ইহাই হইল সংক্ষেপতঃ মুখ্য ও গৌণ মুক্তির পরিচয়। ভারতের বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাস এই দ্বিবিধ মুক্তিকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; যাবতীয় দর্শনই এই মুক্তির উপাদেয়তা সপ্রমাণ করিবার জন্য সর্ব্বসময়ে সমুদ্যত। এই মুক্তির সাধন কি, তাহা লইয়া দার্শনিকগণের মধ্যে বহু বিচিত্র মতভেদ সৃষ্ট হইয়াছে। সকলেই একবাক্যে বলিয়া থাকেন, তত্ত্বজ্ঞানই ইহার মুখ্য বা সাক্ষাৎ সাধন, অথচ ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিকগণের মতানুসারে সেই তত্ত্বজ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞানও ভিন্ন ভিন্ন আকারের হয়। এইরূপ অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি মোক্ষকাম হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে কোন্ দার্শনিকের কোন্ তত্ত্বজ্ঞানটি যে উপাদেয়, তাহার নির্ণয় করা অতি কঠিন সমস্যা। নৈয়ায়িকের ভেদবাদ কিংবা বেদান্তীর অভেদবাদ প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান দান করিতে সমর্থ, এই সন্দেহের মীমাংসা এখনও হয় নাই; কখনও যে হইবে, তাহার আশাও নিতান্ত অল্প। এই সকল ভাবিয়া ভক্তিবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, জ্ঞান মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ নহে, ভক্তিই তাহার সাক্ষাৎ ও একমাত্র কারণ। এই ভক্তির স্বরূপ কি, ঐ সকল নানা প্রকারের তত্ত্বজ্ঞানের সহিত সেই ভক্তির সম্বন্ধ কি এবং সেই ভক্তিমার্গে যাইবার অধিকারীই বা কে হইতে পারে, তাহারই বিস্তৃত আলোচনা করিবার জন্য এই প্রবন্ধ। ক্রমে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেছি।

বাঙ্গালার নিজস্ব

আমার বোধ হয়, শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা নানা প্রকারে প্রীতিকর হইতে পারে। কারণ, ভক্তির প্রতি ভারতের অন্য প্রান্তোদ্ভব জাতি অপেক্ষা বাঙ্গালীর দাবী যে কোন অংশেই কম নহে, তাহা যেমন ধ্রুবসত্য, সেইরূপ সমন্বয়ের দিক্ দিয়া দেখিলে তাহার ভক্তিতত্ত্বের আলোচনার দাবী যে অত্যন্ত অধিক, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়। যে দেশে প্রেম-ভক্তির পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবৎপ্রেমের বন্যায় বাঙ্গালা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও উড়িষ্যাকে প্লাবিত করিয়া ধন্য করিয়াছেন, দর্শন, কর্ম্মকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ডের সুসমঞ্জস সমন্বয়ের একমাত্র উপায় অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদরূপ ভাবপ্রবণ মহাদর্শন যে বাঙ্গালার মহাতীর্থরূপ নবদ্বীপে প্রথম প্রচারিত হইয়াছে, সেই বাঙ্গালাদেশে জন্মলাভ করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালী যদি বাঙ্গালার গৌরব, বাঙ্গালীর গৌরব, শান্তিময় বিশ্বমানবদর্শনের মহাভিত্তিরূপ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ বা প্রেমভক্তিবাদের পরমাশ্চর্য্যময় অথচ পরমানন্দপ্রদ অনুশীলনে উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে তাহা যে বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বতোমুখী বঙ্গভাষার উন্নতির পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর হইবে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এই বিশেষ দাবীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই ভক্তিতত্ত্বের আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছি। পরের প্রবন্ধে ভক্তির ক্রমিক ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া ভক্তিবাদের ক্রমিক বিবর্ত্ত প্রদর্শিত হইবে।

(২)

সুপ্রাচীন ভক্তিবাদ

পূর্ব্ব প্রবন্ধে মুক্তির কথা বলিয়াছি, এইবার ভক্তির কথা বলিব।

ভক্তির আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে তাহার ঐতিহাসিক আলোচনা আবশ্যক; তাহার পর ভক্তির স্বরূপ ও তাহার প্রয়োজন প্রভৃতির আলোচনা করা যাইবে।

মুক্তি ও তাহার উপায় কি? তাহাই প্রধানভাবে বুঝাইবার জন্য প্রবৃত্ত আস্তিক দর্শন-শাস্ত্রসমূহ হইতে ভক্তিশাস্ত্র কোন্ সময় হইতে পৃথক্ হইয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতৃ-জনগণের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার ঠিক নির্ণয় করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। কারণ, এখনও এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নাই বলিলেও চলে। কিন্তু তাই বলিয়া এ বিষয়ে

আলোচনা স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, এইরূপ আলোচনা দ্বারা বিশেষ লাভ এই হইবে যে, ভক্তিশাস্ত্র যে ভারতীয় সভ্যতার একটি প্রধান উপাদান এবং ভারতে খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি বৈদেশিক ভক্তিবাদ প্রচারের বহু শতাব্দী পূর্ব্বেও ঐ সকল ভক্তিশাস্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যাইবে।

শ্রুতি-মূল

বর্ণাশ্রমী হিন্দুর সকল প্রকার শিক্ষা-দীক্ষা-পদ্ধতির মূল শ্রুতি। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিরূপ ত্রিবিধ সাধনের বিস্তৃত বিবরণ পুরাণ, ধর্ম্মসংহিতা ও মহাভারতাদি ইতিহাসের দ্বারা জানিবার পূর্ব্বে ঐ সকল পুরাণাদি বর্ণিত সাধনতন্ত্রের অল্প বা বিস্তৃতভাবে নির্দ্দেশ শ্রুতিতে আছে কিনা, তাহা জানিবার জন্য বিশ্বাসী হিন্দুমাত্রেরই ঔৎসুক্যের উদয় হয় এবং সেই ঔৎসুক্যবশতঃ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া হিন্দু যদি দেখে, ঐ সকল সাধনতত্ত্বের প্রামাণিকতা শ্রুতির উপর নির্ভর করিতেছে না, তখন সে সহস্র লৌকিক প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইলেও সেই সকল সাধনতত্ত্বকে অবিশ্বাস বশতঃ উপেক্ষা করিতে অণুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করে না। তাই ভক্তিশাস্ত্রের ঐতিহাসিক আলোচনা করিবার পূর্ব্বে প্রমাণশিরোমণি শ্রুতির মধ্যে এই ভক্তিশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ভক্তিরূপ সাধনবিষয়ে কিরূপ উল্লেখ আছে, তাহা অগ্রে বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। আমার মনে হয়, ভক্তিরূপ সাধনমার্গ শ্রুতিই আমাদিগকে অতিস্পষ্টভাবে সর্ব্বাগ্রে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন—ঋক্‌সংহিতার মধ্যে অনেকগুলি এরূপ মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদিগের স্বারসিক অর্থের উপর নিভর করিলে ইহা বেশ বুঝা যায় যে, ঐ সকল মন্ত্র স্পষ্টভাবে ভক্তি, ভক্তির ফল ও ভক্তির অদ্বিতীয় অবলম্বন, সেই সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ ভগবত্তত্ত্বকেই নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে।

মন্ত্রভাগবতে ঋক্‌মন্ত্র

ঋক্‌সংহিতার ভক্তিমাত্রপরত্ব প্রতিপাদনের জন্য মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠ 'মন্ত্রভাগবত' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সেই গ্রন্থে ঋক্‌সংহিতার মন্ত্র বলিয়া যে কয়টি মন্ত্র এই বিষয়ে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত মন্ত্র কয়টি প্রকৃতোপযোগী হইবে বলিয়া অগ্রেই উল্লেখ করা যাইতেছে—

"যস্মিন্ বিশ্বানি কাব্যা চক্রে নাভিরিব শ্রিতা। ত্রিতং জূতী সপর্য্যত।"

"ব্রজে গাবো ন সংযুজে যুদ্ধে অশ্বা অযুক্ষত নভন্তামন্যকে সমে।"

এই মন্ত্র দুইটির ব্যাখ্যা নীলকণ্ঠ যেরূপ ভাবে করিয়াছেন, তদনুসারে তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ হয়—যথা, শকটের চক্রে তাহার নাভিপ্রদেশ যেমন একদেশস্থিত হইয়া আপনা অপেক্ষা বৃহৎ চক্রকে স্পর্শ করিয়া থাকে, সেইরূপ সকল কাব্যই যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি জগৎকারণ গুণের বিস্তারকারী অর্থাৎ প্রেরয়িতা সেই পরমেশ্বরকে তোমরা বুঝিয়া সপর্য্যা বা উপাসনা কর। সেই পরমেশ্বর তাঁহার পিতা অর্থাৎ পিতৃভাবে রাগানুগা ভক্তির সাধনায় প্রবৃত্ত ভক্তের প্রীতির জন্য ব্রজে যেমন গোচারণ করিয়া থাকেন, সেইরূপই আবার রণক্ষেত্রে (সখ্যভাবের উপাসক ভক্ত অর্জ্জুনাদির প্রীতির জন্য) অশ্বসমূহের পরিচালনাও করিয়া থাকেন। এইরূপ গোচারণ ও অশ্বপরিচালনাদিরূপ নরলীলা তিনি কেন করিয়া থাকেন, তাহার উত্তর শ্রুতিই দিতেছেন—"নভন্তাং অন্যকে সমে"—'উপাসকগণের সকল প্রকার কুৎসিত শত্রুসমূহের বিনাশ হউক' এইরূপ ইচ্ছা করিয়াই সেই ভগবান্ এই সকল নরলীলা প্রকটিত করিয়া থাকেন।

মানব-কল্যাণে সগুণ প্রকাশ

তাই ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—

"নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ।"

সেই অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ অথচ গুণাত্মা ভগবানের নররূপে প্রকাশ মনুষ্যগণের পরম মঙ্গলের হেতু হইয়া থাকে।

যাহাই হউক, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, পরম করুণাময় জগদীশ্বর সগুণ ও সাকার হইয়া অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন এবং সেই পরমপুরুষের সগুণ ও সাকার স্বরূপই অর্চ্চনা বা পূজার বিষয় হইয়া ভক্তির অবলম্বন হইয়া থাকে। সুতরাং ভক্তিসিদ্ধান্তের প্রধানতম আলম্বন শ্রীভগবানের সাকারতত্ত্ব শ্রুতিমধ্যে নাই বলিয়া যাঁহারা নিরাকার পরমেশতত্ত্বকে একমাত্র উপাস্য বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের মত যে শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহা এইপ্রকার শ্রুতিদ্বারা নিঃসন্দিগ্ধভাবে ব্যবস্থাপিত হইল।

সর্ব্বথা শ্রুতিমূলক এই ভক্তিবাদ ভক্তগণের প্রকৃতি ও অধিকারানুসারে সেই

সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ রসমূর্ত্তি পরব্রহ্মের নানাপ্রকার অভিব্যক্তি বা অবতারকে অবলম্বন করে বলিয়া নানা সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্ররূপে পরিণত হইয়াছে।

শ্রুতির কর্ম্মবহুল ব্রাহ্মণভাগ ও মন্বাদি ঋষিপ্রকাশিত ধর্ম্ম শাস্ত্র অধিকারানুসারে যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপদেশ করে, তাহাদের অনুষ্ঠানে স্বভাবশতঃ রাগদ্বেষাদি পরিচালিত চঞ্চলচিত্তকে শুদ্ধ করিতে পারিলে মানব ঐ সকল ভক্তিশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য উপাসনার যাথার্থ্য ও উপকারিতা বুঝিতে সমর্থ হইয়া থাকে ; বিশুদ্ধচিত্ত না হইলে কোন মানবই পরব্রহ্মের রসরূপতা-প্রকাশক ভক্তিশাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনার অধিকারী হয় না। সুতরাং অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির নিকটে ঐ সকল ভক্তিশাস্ত্র পরস্পর বিরুদ্ধ ও অসঙ্গতার্থ বলিয়া প্রতীত হয় ; আর বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির নিকট ঐ সকল শাস্ত্র একই প্রয়োজনের সাধক বলিয়া অধিকারীর সংস্কার ও সাধন সামগ্রীর অপেক্ষায় বিভিন্ন প্রকাব হইলেও ফলতঃ একই হইয়া যায়।

পঞ্চোপাসনা

তাই মহিম্নঃ স্তুতিতে কথিত হইয়াছে—

> "ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
> প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
> রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল-নানা-পথজুষাং
> নৃণামেকোগম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

তাৎপর্য্য এই যে—বেদ, সাংখ্য, যোগ, শৈবাগম, নারদ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি বৈষ্ণবমত—এই সকল পথ পরস্পর ভিন্ন হইলেও এবং তত্তন্মতের প্রতি আগ্রহপর ব্যক্তিগণ এইটিই পরম সাধন, ইহাই হিতকর, অপরটি নহে, এই প্রকারে কোলাহল করিতে থাকিলেও জন্মজন্মান্তরে অর্জ্জিত বাসনার প্রভাবে রুচিসমূহের বৈচিত্র্যবশতঃ কেহ কুটিল, কেহ বা সরল পথ অবলম্বন করিয়া থাকে ; কিন্তু যেই যেপথ দিয়া যাউক না কেন, সমুদ্রের উদ্দেশে বিভিন্ন পথে ধাবমান নদীসমূহের গন্তব্য যেমন এক সমুদ্রই হয়, সেইরূপ ঐ সকল সাধনার পথে বিচরণশীল সাধকগণের তুমিই মহেশ্বর, একমাত্র গন্তব্য বা বিশ্রাম স্থান হইয়া থাক। আস্তিক হিন্দুগণের পরম আদরের ধন এই উপাসনাতত্ত্ব--প্রতিপাদক ভক্তিশাস্ত্র ভক্তসম্প্রদায়ের পঞ্চবিধত্ববশতঃ পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়াছে। গাণপত্য, সৌর, শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব—এই পাঁচ প্রকার উপাসক

সম্প্রদায় ঐ সকল ভক্তিশাস্ত্রকে যথাক্রমে গণপতিতন্ত্র বা গাণপত্যাগম, সৌরতন্ত্র বা সৌরাগম, শাক্ত তন্ত্র বা আগম, শৈবাগম এবং পঞ্চরাত্র এইরূপ বিভিন্ন নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

এই পাঁচ প্রকারের উপাসনা শাস্ত্রের মধ্যে প্রথম দুইটি—গণপতিতন্ত্র ও সৌরাগম এক্ষণে বিরলপ্রচার হইয়া পড়িয়াছে, এই দুইটি উপাসনা মার্গের প্রতিপাদক গ্রন্থ পূর্ব্বকালে রাশি রাশি থাকিলেও এক্ষণে তাহার অতি অল্প-সংখ্যক গ্রন্থই আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। শেষোক্ত তিনটি মতের গ্রন্থ সমূহের সংখ্যা খুব বেশী, এখনও ঐ সকল মতের বহু প্রামাণিক গ্রন্থ অনাবিষ্কৃত থাকিলেও যাহা আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া ঐ সকল মতের প্রবর্ত্তন ও প্রসার বিষয়ে আবশ্যক ঐতিহাসিক গবেষণা এখন আর অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। শৈবাগম ও শাক্ততন্ত্র লইয়া ঐতিহাসিক আলোচনা প্রাসঙ্গিক হইলেও, এই প্রবন্ধের অতি বিস্তার ভয়ে তাহা না করিয়া কেবল শেষোক্ত বৈষ্ণব সিদ্ধান্তপর পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রবিষয়ে ঐতিহাসিক আলোচনাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ বা প্রেমভক্তিবাদের সহিত পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের সম্বন্ধ বড়ই ঘনিষ্ঠ; সুতরাং তাহাই এই প্রবন্ধের প্রধানতঃ আলোচ্য বিষয়। এক্ষণে তাহাই আলোচিত হইতেছে।

অপৌরুষেয় সংহিতা বা তন্ত্রকাণ্ড

সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগ্রন্থই দুইভাগে বিভক্ত হয়, যথা—অপৌরুষেয় ও পৌরুষেয়। এই সাধারণ নিয়মানুসারে পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগ্রন্থগুলিও উক্ত দুইভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থসমূহ—সাক্ষাৎ উপাস্যদেবতা বা উপাস্যদেবতার উপাসক কোন দেবতা-বিশেষ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে কিংবা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর ভাবে আবিষ্ট ভক্ত মুনি বা ঋষির হৃদয়ে প্রথমে ভগবদিচ্ছা-শক্তির প্রভাবে আবির্ভূত হইয়া পরে সম্প্রদায়হিতার্থে তাঁহাদের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থগুলি এই প্রকার নহে; কারণ, ইহারা পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থগুলির তাৎপর্য্য বর্ণনা করিবার জন্যই রচিত হইয়াছে। স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ে ধর্ম্ম সংহিতা ও কল্পসূত্রগুলির সহিত পরবর্ত্তী স্মৃতিনিবন্ধগুলির যেরূপ উপজীব্যোপজীবক-ভাব সম্বন্ধ, প্রকৃতেও উক্ত দুই শ্রেণীর গ্রন্থগুলিরও সেইরূপ সম্বন্ধই দেখিতে পাওয়া যায়।

এই প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থগুলি 'সংহিতা' নামে প্রসিদ্ধ। এই সংহিতাগুলি পদ্যে রচিত—ঐ সকল পদ্যও শতকরা নিরানব্বই অংশ অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত।

সংহিতা সমূহ পটল বা অধ্যায় নামক ভাগ সমূহে নিবদ্ধ। ঐসকল সংহিতা আবার তন্ত্র এই নামেও আখ্যাত হইয়া থাকে। অনেকস্থলে আবার এই সকল সংহিতা তন্ত্রকাণ্ড এই নামেও আখ্যাত হইয়া থাকে। অহির্ব্বুধ্ন্য সংহিতার দ্বাদশ অধ্যায় পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত সংহিতা প্রচারকালে পাঞ্চরাত্রিক সম্প্রদায়ে ভাগবতসংহিতা. কর্ম্মসংহিতা ও বিদ্যাসংহিতা প্রভৃতি বহু সংহিতা এবং পাশুপত সম্প্রদায়ে পতিতন্ত্র, পশুতন্ত্র ও পাশতন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থ অতিপ্রাচীনকাল হইতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল।

সুবৃহৎ পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপজীব্য স্বরূপ পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র যে কত বৃহৎ, তাহা ঠিক করিয়া বিচার করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। কারণ, এই সম্প্রদায়ের প্রমাণস্বরূপ মূল সংহিতাগ্রন্থগুলি এখনও সম্পূর্ণভাবে সাধারণের হস্তগত হইবার সুযোগ উপস্থিত হয় নাই।

কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে নারদপঞ্চরাত্র নামে একখানি সংহিতা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইলেও তাহা যে বাস্তবিক উক্তনামে প্রসিদ্ধ প্রমাণগ্রন্থ নহে, প্রত্যুত উহা একখানি কল্পিত সুতরাং ভাগবত-সম্প্রদায়ের অগ্রাহ্য, তাহা স্যর রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর মহোদয় (Encyclopo-edia of Indo-Aryan Research III, 6, p, 40-41-এ) অতিসুন্দরভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। আস্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসিদ্ধি এই যে, এই পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ে ১০৮ খানি সংহিতা প্রচলিত ছিল।

কপিঞ্জল সংহিতায় ১০৬ খানি ঐরূপ সংহিতার নাম দেখিতে পাওয়া যায়, পদ্মতন্ত্রে কিন্তু ১১২ খানি সংহিতার উল্লেখ আছে। বিষ্ণুতন্ত্রে ১৪১ খানি সংহিতার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এদিকে হয়শীর্ষ-সংহিতায় কেবল ৩৪ খানি সংহিতারই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নিপুরাণের ৩৯ অধ্যায়ে কিন্তু ২৫ খানি পঞ্চরাত্র সংহিতার নির্দ্দেশ আছে। ইহা ছাড়া এসিয়াটিক সোসাইটি কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, পূর্ব্বোক্ত নারদপঞ্চরাত্র নামক গ্রন্থে সাতখানি অধিক সংহিতার নাম দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—ব্রহ্ম সংহিতা,

শেষসংহিতা, কৌমারসংহিতা, বাশিষ্ঠসংহিতা, কপিলসংহিতা, গৌতমীয়সংহিতাও নারদীয়সংহিতা।

সংহিতা গ্রন্থ

কপিঞ্জল সংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা, পদ্মসংহিতা, হয়শীর্ষসংহিতা ও অগ্নিপুরাণে যে কয়খানি পাঞ্চরাত্রসংহিতার নাম দেখিতে পাওয়া যায়—পাঠকগণের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। অগস্ত্য-সংহিতা ২। আঙ্গিরস- ৩। অচ্যুত- ৪। অধোক্ষজ- ৫। অনন্ত- ৬। অনিরুদ্ধ- ৭। অদ্বয়- ৮। অষ্টাক্ষরবিধান- ৯। অহির্বুধ্ন্য- ১০। আগ্নেয়- ১১। আত্রেয়- ১২। আনন্দ- ১৩। অরূপ- ১৪। ঈশান- ১৫। ঈশ্বর- ১৬। উত্তরগার্গ্য- ১৭। উদঙ্ক- ১৮। উপেন্দ্র- ১৯। উমামহেশ্বর- ২০। উপগায়ন- ২১। উশনস- ২২। কাণ্ব- ২৩। কাপিঞ্জল- ২৪। কলিরাঘব- ২৫। কাত্যায়ন- ২৬। কাপিল- ২৭। কাম- ২৮। কার্ষ্ণেয়- ২৯। কেশব- ৩০। কালিকী- ৩১। কাশ্যপ- ৩২। কর্ম্ম- ৩৩। কৌষেয়- ৩৪। কৌমার- ৩৫। ক্রতু- ৩৬। ক্রৌঞ্চ- ৩৭। খগেশ্বর- ৩৮। গণেশ- ৩৯। গরুড- ৪০। গরুড়ধ্বজ- ৪১। গর্গ- ৪২। গালব- ৪৩। গোবিন্দ- ৪৪। গৌতমীয়- ৪৫। জনার্দ্দন- ৪৬। জমদগ্নি- ৪৭। জয়াখ্য- ৪৮। জয়োত্তর- ৪৯। জাবাল- ৫০। জৈমিনীয়- ৫১। জ্ঞানার্ণব- ৫২। তত্ত্বসাগর- ৫৩। তন্ত্রসাগর- ৫৪। তার্ক্ষ্য- ৫৫। তেজোদ্রবিণ- ৫৬। ত্রিবিক্রম- ৫৭। ত্রৈলোক্যমোহন- ৫৮। ত্রৈলোক্যবিজয়- ৫৯। দক্ষ- ৬০। দত্তাত্রেয়- ৬১। দধীচ- ৬২। দামোদর- ৬৩। দুর্গা- ৬৪। দৌর্ব্বাসস- ৬৫। দেবল- ৬৬। দয়ানদীয়- ৬৭। ধ্রুব- ৬৮। নলকুবর- ৬৯। নারদীয়- ৭০। নারসিংহ- ৭১। নারায়ণীয়- ৭২। নৈঋর্ত- ৭৩। পক্ষি- ৭৪। পঞ্চপ্রশ্ন- ৭৫। পদ্মনাভ- ৭৬। পদ্মোদ্ভব- ৭৭। পর- ৭৮। পরম- ৭৯। পরাশর- ৮০। পাণিনীয়- ৮১। পাদ্ম- ৮২। পরমেশ্বর- ৮৩। পারিষদ্- ৮৪। পারাবত- ৮৫। পাবক- ৮৬। পিপ্পল- ৮৭। পুণ্ডরীকাক্ষ- ৮৮। পুরাণ- ৮৯। পুরুষোত্তম- ৯০। পুলস্ত্য- ৯১। পৌলব- ৯২। পুষ্টি- ৯৩। পৈঙ্গল- ৯৪। পৌলহ- ৯৫। পৌষ্কর- ৯৬। প্রত্যুম্ন- ৯৭। প্রশ্ন- ৯৮। প্রহ্লাদ- ৯৯। প্রাচেতস- ১০০। বলভদ্র- ১০১। বার্হস্পত্য- ১০২। বৃহদ্ভার্গব- ১০৩। বৌধায়ন- ১০৪। ব্রহ্ম- ১০৫। ব্রহ্মনারদ- ১০৬। ভাগবত- ১০৭। ভারদ্বাজ-

১০৮। ভার্গব- ১০৯। মধুসূদন- ১১০। মহীপুরুষ- ১১১। মহাপ্রজ্ঞা- ১১২। মহালক্ষ্মী- ১১৩। মহাসনৎকুমার- ১১৪। মহীপ্রশ্ন- ১১৫। মহেন্দ্র- ১১৬। মাৎস্য- ১১৭। মাধব- ১১৮। মানব- ১১৯। মরীচি- ১২০। মায়া- ১২১। মায়াবিভব- ১২২। মার্কণ্ডেয়- ১২৩। মাহেন্দ্র- ১২৪। মল- ১২৫। মেদিনীপতি- ১২৬। মৈত্রেয়- ১২৭। মৌদ্গল্য- ১২৮। যজ্ঞমূর্ত্তি- ১২৯। যম- ১৩০। যাজ্ঞবল্ক্য- ১৩১। যোগ- ১৩২। যোগহৃদয়- ১৩৩। রাঘবীয়- ১৩৪। লক্ষ্মী- ১৩৫। লক্ষ্মীনারায়ণ- ১৩৬। লক্ষ্মীপতি- ১৩৭। লাঙ্গল- ১৩৮। বরাহ- ১৩৯। বসু- ১৪০। বহ্নি- ১৪১। বাগীশ- ১৪২। বামদেব- ১৪৩। বামন- ১৪৪। বায়ু- ১৪৫। বারুণ- ১৪৬। বাল্মীকি- ১৪৭। বশিষ্ঠ- ১৪৮। বাসুদেব- ১৪৯। বাহ্লিক- ১৫০। বিরিঞ্চি- ১৫১। বিশ্ব- ১৫২। বিশ্বামিত্র- ১৫৩। বিষ্ণু- ১৫৪। বিষ্ণুতত্ত্ব- ১৫৫। বিষ্ণুতিলক- ১৫৬। বিষ্ণুযোগ- ১৫৭। বিষ্ণুরহস্য- ১৫৮। বিষ্ণুবৈভব- ১৫৯। বিষ্ণুসদ্ভাব- ১৬০। বিষ্ণুসম্ভব- ১৬১। বিষ্ণুসার- ১৬২। বিষ্ণু সিদ্ধান্ত- ১৬৩। বিষ্বক্সেন- ১৬৪। বিহগেন্দ্র- ১৬৫। বৈকুণ্ঠ- ১৬৬। বৈখানস- ১৬৭। বৈভব- ১৬৮। ব্যাস- ১৬৯। বৈহায়স- ১৭০। শক্র- ১৭১। শর্ব্ব- ১৭২। শাকটায়ন- ১৭৩। শাকলেয়- ১৭৪। শাণ্ডিল্য- ১৭৫। শাতাতপ- ১৭৬। শান্তি- ১৭৭। শিব- ১৭৮। শুকরুদ্র- ১৭৯। শুক্র- ১৮০। শেষ- ১৮১। শৌনক- ১৮২। শ্রী- ১৮৩। শ্রীকর- ১৮৪। শ্রীনিবাস- ১৮৫। শ্রীপ্রশ্ন- ১৮৬। শ্রীবল্লভ- ১৮৭। শ্বেতকেতু- ১৮৮। সংবর্ত- ১৮৯। সঙ্কর্ষণ- ১৯০। সত্য- ১৯১। সদ্বিষ্ণু- ১৯২। সনক- ১৯৩। সনৎকুমার- ১৯৪। সনন্দ- ১৯৫। সর্ব্বমঙ্গল- ১৯৬। সাত্ত্বত- ১৯৭। সমন্বয়- ১৯৮। সারস্বত- ১৯৯। সোম- ২০০। সৌমীয়- ২০১। সৌর- ২০২। স্কান্দ- ২০৩। স্বায়ম্ভুব- ২০৪। হয়শীর্ষ-২০৫। হরি- ২০৬। হারীত- ২০৭। হিরণ্যগর্ভ- ২০৮। হৃষীকেশ- ২০৯। কাশ্যপোত্তর- ২১০। পরমতত্ত্বনির্ণয়প্রকাশ- ২১১। পদ্মসংহিতাতন্ত্র- ২১২। বৃহদ্ব্রহ্ম-সংহিতা।

এইসকল সংহিতা গ্রন্থের অধিকাংশই দক্ষিণ ভারতের সুপ্রসিদ্ধ তাঞ্জোর লাইব্রেরী, মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট হস্তলিখিত পুস্তকালয় ও আডিয়ার থিয়োসফিক্যাল লাইব্রেরীতে সংগৃহীত রহিয়াছে।

মুদ্রিত সংহিতার প্রতিপাদ্য

এই ২১২ খানি সংহিতার মধ্যে কেবল এগারখানিই সম্প্রতি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। যথা—

১। ঈশ্বর সংহিতা, ২। কপিঞ্জল সংহিতা, ৩। পরাশর সংহিতা, ৪। পদ্মতন্ত্র, ৫। বৃহদ্‌ব্রহ্ম সংহিতা, ৬। বৃহদ্‌ব্রহ্ম সংহিতা, (দেবনাগরী), ৭। ভারদ্বাজ সংহিতা, ৮। লক্ষ্মীতন্ত্র, ৯। শ্রীপ্রশ্ন সংহিতা ১০। বিষ্ণুতিলক সংহিতা, ১১। সাত্বত সংহিতা (দেবনাগরী)। অপর নয়খানি তেলেগু লিপিতে মুদ্রিত।

এই সকল পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র কোন্ সময় হইতে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন; কিন্তু এই জাতীয় গ্রন্থ বা মত যে মহাভারত রচনাকালেও প্রচলিত ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। কারণ, মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের মধ্যে একটি নারদীয় নামে আখ্যাত অধ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এই জাতীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত সে সময়ও ভারতে একান্ত অবিদিত ছিল না। মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বের ৬৬ অধ্যায়ের শেষ ভাগে—"প্রযুক্তসাত্বতবিধি" এই শব্দটিও এই বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ প্রদান করিয়া থাকে।

এই কারণে ইহা নিশ্চিত ভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, মহাভারত রচনার পূর্ব্বেও ভারতে এই পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু সেই সময় কোন্ কোন্ গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার সুযোগ এখনও উপস্থিত হয় নাই। এই সকল পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রধানতঃ প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি দশ ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। যথা—

১। দর্শন বা তত্ত্বনির্ণয়। ২। মন্ত্রবিচার। ৩। যন্ত্রবিচার। ৪। মায়াযোগ (ব্যবহারিক)। ৫। যোগ (আধ্যাত্মিক)। ৬। মন্দির নির্ম্মাণ। ৭। প্রতিষ্ঠাবিধি (মন্দির ও দেবপ্রতিমা)। ৮। সংস্কার (নিত্যনৈমিত্তিকাদিকর্ম্ম)। ৯। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। ১০। উৎসব।

কিছুদিন পূর্ব্বে মাদ্রাজ আডিয়ার লাইব্রেরী হইতে অহির্বুধ্ন্য সংহিতা নামে একখানি পাঞ্চরাত্র সংহিতাও মুদ্রিত হইয়াছে—পূর্ব্বোল্লিখিত ১১খানি সংহিতা ও অহির্বুধ্ন্য সংহিতানুসারে এই পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের অবলম্বিত দর্শন-শাস্ত্রের পরিচয় আগামী বারে দিবার চেষ্টা করিব।

অহির্বুধ্ন্য সংহিতা

এই অতি বিস্তৃত বৈষ্ণব পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রেও কিন্তু মুক্তিকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ভক্তি ও জ্ঞান সেই মুক্তির সাধন বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং এই বিষয়ে ন্যায়, বৈশেষিক ও বেদান্ত প্রভৃতি আস্তিক দর্শন শাস্ত্রের সহিত মতভেদ পরিলক্ষিত হয় না। তবে পরমাত্মার স্বরূপ ও দার্শনিক মতে বিশেষ বৈষম্যই দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং এক্ষণে তাহারই আলোচনা সংক্ষেপে করা যাইতেছে।

এই পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের প্রচলিত প্রামাণিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে অহির্বুধ্ন্য সংহিতাখানি বড়ই প্রামাণিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে এই গ্রন্থখানি যে কাশ্মীরে প্রামাণিক বলিয়া পরিগৃহীত ছিল, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণও পাওয়া যায়। এই সংহিতাখানি—অহির্বুধ্ন্য অর্থাৎ শ্রীমহেশ্বর নারদকে উপদেশ করেন—নারদের মুখে শুনিয়া দুর্ব্বাসা ঋষি পরে ভারদ্বাজ নামক ঋষিকে ইহার উপদেশ করিয়াছেন। অহির্বুধ্ন্য শ্রুতিপ্রসিদ্ধ একাদশ রুদ্রের অন্যতম।

শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়—

"অহির্বৈ বুধ্নিয়োঽকাময়ত ইমাং প্রতিষ্ঠাং বিন্দেয়" ইতি। এই মন্ত্রে বুধ্নিয় ও অহি এই শব্দ দুইটি রুদ্রদেবতাকে নির্দ্দেশ করিতেছে। বুধ্নিয় ও বুধ্ন্য একই অর্থের বোধক; এই কারণে অহির্বুধ্ন্য এই শব্দটিও যে ভগবান্ রুদ্রেরই পরিচায়ক, তাহা শ্রুতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। ব্রহ্মলোকে সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মা এই পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র শ্রীরুদ্রকে উপদেশ করেন এবং নারদ তাহা পরে শ্রবণ করিয়া ঋষিগণের মধ্যে প্রচারিত করেন, এ কথা বিশদভাবে মহাভারতেও কথিত হইয়াছে।

মহাভারতে পাঞ্চরাত্র

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে পাঞ্চরাত্র প্রকরণে নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি শ্লোক দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে—

"ময়াশিষ্টঃ পুরা ব্রহ্মা মাং যজ্ঞমযজৎ পুরা।
ততস্তস্মৈ বরান্ প্রীতো দদাবহমনুত্তমান্॥
মৎপুত্রত্বং চ কল্পাদৌ লোকাধ্যক্ষত্বমেব চ।
এব মাতা পিতা চৈব যুষ্মাকঞ্চ পিতামহঃ॥

ময়ানুশিষ্টো ভবিতা সর্ব্বভূতবরপ্রদঃ।
অস্যৈব চাত্মজো রুদ্রো ললাটাৎ যঃ সমুত্থিতঃ॥
ব্রহ্মানুশিষ্টো ভবিতা সোঽপি সর্ব্ববরপ্রদঃ।"

(শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম ৩৪৮ অধ্যায়)

"ইদং মহোপনিষদং চতুর্ব্বেদসমন্বিতম্।
সাংখ্যযোগকৃতান্তেন পাঞ্চরাত্রানুশব্দিতম্॥
নারায়ণমুখোদ্গীতং নারদোঽশ্রাবয়ৎ পুনঃ।
ব্রহ্মণঃ সদনে তাত যথা দৃষ্টং তথাশ্রুতম্॥"

(শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম ৩৪৮ অধ্যায়)

এই শ্লোক কয়টির যথাক্রমে তাৎপর্য্যার্থঃ—নারায়ণ কহিতেছেন,—"আমি পূর্ব্বকল্পে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম, ব্রহ্মা যজ্ঞরূপধারী আমাকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, আমি তাহাতে প্রীত হইয়া ব্রহ্মাকে বহু উৎকৃষ্ট বর দিয়াছিলাম, সেই বর সমূহের মধ্যে একটি বর এই যে, কল্পের আদিতে ব্রহ্মা আমার পুত্ররূপে আবির্ভূত হইবেন এবং তিনি লোকসমূহের অধ্যক্ষ হইবেন। সেই ব্রহ্মাই তোমাদের মাতা ও পিতা এবং তিনিই তোমাদের পিতামহ। আমারই উপদেশানুসারে ব্রহ্মা সকল লোককে বরদান করিয়া থাকেন। এই ব্রহ্মার ললাট হইতে আবির্ভূত, সুতরাং ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া বিখ্যাত রুদ্র ব্রহ্মার নিকট হইতে পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তের উপদেশ পাইবেন এবং তিনিও সকল প্রাণীকে বরদান করিতে সমর্থ হইবেন। চারিটি বেদের সহিত সম্মিলিত এই পাঞ্চরাত্ররূপ মহোপনিষদ্; সাংখ্য ও যোগের সিদ্ধান্তও ইহার অনুকূল। এই পাঞ্চরাত্র প্রথমে শ্রীনারায়ণের মুখ হইতে উদ্গীত হয়, পরে ব্রহ্মলোকে যেমন দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন, তদনুসারে নারদ অন্যান্য ঋষিগণকে শুনাইয়াছিলেন।"

বৈষ্ণবী শক্তির উন্মেষ

উল্লিখিত মহাভারতের বচন কয়টির দ্বারা বুঝা যায় যে, পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রও বেদের ন্যায় অপৌরুষেয়। কারণ, সাক্ষাৎ নারায়ণই ইহার আদি বক্তা, ইহা ব্রহ্মলোকে প্রচারিত হইয়াছিল—সে স্থান হইতে শুনিয়া দেবর্ষি নারদ ইহা মনুষ্যলোকে ঋষিগণের মধ্যে প্রচারিত করেন—সেই ঋষিগণের অন্যতম দুর্ব্বাসা ঋষি ভরদ্বাজ ঋষিকে ইহা শুনাইয়াছিলেন, সুতরাং এই অহির্বুধ্ন্য সংহিতা পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশিষ্ট প্রমাণগ্রন্থরূপে সমাদৃত হইবার যোগ্য। এইবার দেখা

যাউক, অহির্বুধ্ন্য সংহিতায় ভক্তিশাস্ত্রের উপজীব্য যে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান, তদ্বিষয়ে কি কথিত হইয়াছে।

প্রলয়কালের শেষভাগে অথবা ব্রহ্মরাত্রির শেষ যামার্দ্ধে ভগবান্ বিষ্ণুর ইচ্ছাবশতঃ বৈষ্ণবীশক্তি জাগরিত হইয়া থাকেন। এই জাগরণ বা উন্মেষ কি ভাবে হইয়া থাকে, তাহার পরিচয় অহির্বুধ্ন্য সংহিতায় এই ভাবে পাওয়া যায়—

"প্রসুপ্তাখিলকার্য্যং যৎ সর্ব্বতঃ সমতাং গতম্।
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বাবাসমনাহতম্ ॥২
পূর্ণ স্তিমিত ষাড়্‌গুণ্যমসমীরাম্বরোপমম্।
তস্য স্তৈমিত্যরূপা যা শক্তিঃ শূন্যস্বরূপিণী ॥৩
স্বাতন্ত্র্যাদেব কস্মাচ্চিৎ ক্বচিৎ সোন্মেষমৃচ্ছতি।
আত্মভূতা হি যা শক্তিঃ পরস্য ব্রহ্মণোহরেঃ ॥
দৈবী বিদ্যুদিব ব্যোম্নি ক্বচিদুদ্যোততেতু সা।

(অহির্বুধ্ন্য সংহিতা ৫ম অধ্যায়)

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে,—"সমস্ত কার্য্যই যাঁহাতে প্রলয়কালে 'প্রসুপ্ত', বিলীন হইয়াছিল, যিনি সর্ব্বতোভাবে সমতাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যিনি সকলের আবাস ও 'অনাহত' নির্বিকার—যাঁহার পূর্ণ ছয়টি গুণ তৎকালে স্তিমিতভাবে বিদ্যমান ছিল—নির্বাত আকাশের সহিত যাঁহার সেই সময় তুলনা হইতে পারে, সেই নারায়ণই পরব্রহ্ম, সেই পরব্রহ্মের স্তৈমিত্যরূপ যে শক্তি, তাহার স্বরূপ-শূন্যতা (কার্য্য সমূহের অপ্রকটাবস্থাই শক্তির শূন্যতারূপ) কোন সময়ে কোন অনির্ব্বচনীয় স্বাতন্ত্র্যের প্রভাবেই সেই ব্রহ্মশক্তির উন্মেষ হইয়া থাকে, সেই শক্তি কিন্তু পরব্রহ্ম হরিরই আত্মভূত। মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশে যেমন দৈবী বিদ্যুতের বিকাশ হইয়া থাকে এবং সেই বিদ্যোতমানা শক্তিও আকাশের যেমন আত্মভুত হইয়া থাকে—সেইরূপই পরমাত্মা হরিতে তাঁহারই স্বাতন্ত্র্যবশতঃ শক্তির বিদ্যোতন বা উন্মেষ হইয়া থাকে।"

বিষ্ণুশক্তি বা লক্ষ্মীর স্বরূপ

এই "স্তিমিত ষাড়্‌গুণ্যরূপা" পরব্রহ্মের আত্মভূতশক্তিই বৈষ্ণবী শক্তি বা লক্ষ্মী। পরব্রহ্ম হরির সহিত এই বৈষ্ণবী শক্তি বা লক্ষ্মীর সম্বন্ধ কিরূপ, তাহাও অহির্বুধ্ন্য সংহিতায় এইভাবে কথিত হইয়াছে—

নারদ উবাচ

"ষাড়্গুণ্যং তৎ কথং ব্রহ্মস্বশক্তিপরিবৃংহিতম্।
তস্য শক্তিশ্চ কা নাম কথং বৃংহিতমুচ্যতে ॥"

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—'ষাড়্গুণ্য' (জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীর্য্য ও তেজ এই ছয়টি গুণের সমষ্টি অথচ নিত্য আধার) স্বরূপ যে পরব্রহ্ম, তিনি আবার কিরূপে শক্তি দ্বারা 'পরিবৃংহিত' উপচিত বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন? আর তাঁহার সেই শক্তিরই বা কি স্বরূপ, যে শক্তি দ্বারা 'বৃংহিত', উপচিত বলিয়া তিনি ব্রহ্ম শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন?

অহির্বুধ্ন্য উবাচ

"শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যা অপৃথক্ স্থিতাঃ।
স্বরূপে নৈব দৃশ্যন্তে দৃশ্যন্তে কার্য্যতস্তু তাঃ ॥
সূক্ষ্মাবস্থা তু সা তেষাং সর্ব্বভাবানুগামিনী।
ইদন্তয়া বিধাতুং সা ন নিষেদ্ধুং চ শক্যতে ॥"

"সকল ভাববস্তুরই শক্তিনিচয় অচিন্ত্য হইয়া থাকে। যখন বস্তু স্বরূপেই বিদ্যমান থাকে, তখন তাহার শক্তিনিচয় লক্ষিত হয় না! কিন্তু বস্তু যখন কার্য্যে পরিণত হয়, তখনই তাহার শক্তিনিচয় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, সেই কার্য্য-সমূহের কারণগত যে সূক্ষ্মাবস্থা এবং যাহা সকল ভাবপদার্থেই বিদ্যমান থাকে, তাহারই নাম শক্তি। সেই শক্তিকে তাহার আশ্রয় হইতে পৃথক্ করিয়া প্রতিপাদন করিতে কেহই পারে না, সেইরূপ তাহাকে নাই বলিয়া অপলাপ করিবার সামর্থ্যও কাহারও নাই।"

এই কয়টি শ্লোক দ্বারা জগৎকারণ ও তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির পরিচয় অতি বিশদভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। জগৎপ্রসবিনী বিষ্ণু-শক্তিরও জগৎকারণ বিষ্ণুর এই অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রেমভক্তিবাদের মূল ভিত্তিস্বরূপ—ইহা অনায়াসেই বোধগম্য হয়। আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতি ভক্তাচার্য্যগণও এই ভেদাভেদবাদেরই অবলম্বন বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি দার্শনিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তবে ঐ সকল পূর্ণ দ্বৈতবাদিগণের সহিত অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের কোন কোন বিষয়ে ঐকমত্য বা অনৈকমত্য কি কি কারণে হইয়া পড়িয়াছে, তাহার আলোচনা যথা সময়ে করা যাইবে। আপাততঃ পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে দার্শনিক সিদ্ধান্তেরই আলোচনা করা যাইতেছে।

শক্তি-শক্তিমান্ তত্ত্ব

প্রকৃত প্রসঙ্গে এই শক্তিও শক্তিমানের পরস্পর সম্বন্ধ কি? তাহা বিচার দ্বারা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। নৈয়ায়িকও বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিকগণ ত শক্তির সত্তা একেবারেই উড়াইয়া দেন। তাঁহারা বলেন, বহ্নি হইতে দাহ হয়, সুতরাং বহ্নি দাহরূপ কার্য্যের কারণ—ইহা নির্ব্বিবাদে সকলেরই স্বীকার্য্য; কিন্তু এই কার্য্য ও কারণ হইতে পৃথক্ শক্তি বলিয়া যে কারণে একটি অতিরিক্ত ধর্ম্ম আছে, তাহা ত কোন প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় না। শক্তিই যদি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে আবার শক্তির সহিত শক্তিমানের সম্বন্ধ কি? তাহাতে ভেদ বা অভেদ এই প্রকার বিচারের অবসর কোথায়? ইহা কি কাকের কয়টা দাঁত আছে, তাহা গণনার জন্য প্রয়াসের ন্যায় নিষ্ফল প্রয়াস নহে?

আরম্ভবাদী নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিকগণের এই প্রকার সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শক্তিবাদী পূর্ব্বমীমাংসকগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, শক্তির খণ্ডন করা এইভাবে হইতে পারে না। কারণ ও কার্য্যের সম্বন্ধ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেই আমরা কারণে শক্তি নামক একটি ধর্ম্মের অস্তিত্ব প্রমাণ-বলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া পড়ি। যদি বল, সেই প্রমাণ কি—তাহার উত্তরে শক্তিবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, শক্তি স্বীকার না করিলে কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তিই সম্ভবপর হয় না। নৈয়ায়িকের মতে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ, অসৎ কার্য্যের সহিত কারণের সম্বন্ধ কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে? কার্য্যের সহিত কারণের কোন সম্বন্ধ নাই, অথচ কারণ হইতে কার্য্য হইবে, ইহা কখনও হইতে পারে না। তাহা হইলে যে কোন বস্তু হইতে যে কোন কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে। মাটীর সহিত ঘটের সম্বন্ধ না থাকিলেও যদি মাটী হইতে ঘট হয়, তবে মাটীর সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও তাহা হইতে ঘটের ন্যায় পৃথিবীর সকল কার্য্যই উৎপন্ন হয় না কেন? এইজন্য কারণের সহিত কার্য্যের সম্বন্ধ একটা আছেই, ইহা মানিতেই হইবে। তাহাই যদি মানিলে, তবে কিরূপে বলিবে যে, উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে কার্য্য একেবারে গগনকুসুমের ন্যায় অসৎ? গগনকুসুমের সহিত যেমন কোন সদ্‌বস্তুর সম্বন্ধ অসম্ভব, সেইরূপ অসৎ কার্য্যের সহিত সৎকারণেরও সম্বন্ধ অসম্ভব। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যকে যাঁহারা অসৎ বলিয়া থাকেন, সেই আরম্ভবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকগণ কোন প্রকারেই কার্য্য ও কারণের মধ্যে

অপেক্ষিত সম্বন্ধ কি, তাহা স্থির করিতে পারেন না। এই কারণে বলিতে হইবে, কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ ছিল না—কিন্তু তাহা সূক্ষ্মভাবে কারণেই লীন ছিল, সুতরাং কার্য্যের উৎপত্তি বা অভিব্যক্তির পূর্ব্বে সূক্ষ্মভাবে যে নিজকারণে অবস্থিতি, তাহাই কারণে শক্তি নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কার্য্যের সহিত কারণের ইহাই সম্বন্ধ, অর্থাৎ যে কার্য্য যে কারণে অব্যক্তভাবে বিদ্যমান থাকে, সেই কারণ হইতে সেই কার্য্যই উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি লাভ করিয়া থাকে।

পাঞ্চরাত্রে লক্ষ্মী ও কুণ্ডলিনী এই শক্তি

এই অখণ্ডনীয় দার্শনিক সিদ্ধান্তটিকে সংক্ষেপে ও সরলভাবে বুঝাইবার জন্যই অহির্বুধ্ন্য সংহিতায় ভগবান্ মহেশ্বর নারদকে বলিতেছেন—

"সূক্ষ্মাবস্থা হি সা তেষাং সর্ব্বভাবানুগামিনী।"

ইহার অনুবাদ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে।

এই শক্তি, পরিচ্ছিন্ন কারণে ব্যষ্টিভাবে নিবিষ্ট থাকিলেও অনন্ত বিশ্বপ্রপঞ্চের অনাদি ও অনন্ত কারণরূপ সচ্চিদানন্দময় ষাড়্গুণ্য-বিগ্রহ মূল-কারণ নারায়ণে সৃষ্টির পূর্ব্বে অনাদিকাল হইতে অবস্থিত সমষ্টিশক্তিই বিশ্বপ্রপঞ্চের অব্যক্তাবস্থা, ইহারই নাম পরা বিষ্ণুশক্তি। সাত্বতসংহিতা, ঈশ্বরসংহিতা, কপিঞ্জলসংহিতা, পরাশরসংহিতা, পদ্মতন্ত্র, বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতা, ভারদ্বাজসংহিতা, লক্ষ্মীতন্ত্র, বিষ্ণুতিলকসংহিতা ও শ্রীপ্রশ্নসংহিতা প্রভৃতি পাঞ্চরাত্র গ্রন্থে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের একমাত্র আদিকারণ নারায়ণে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত প্রপঞ্চরূপ সেই পরাবিষ্ণুশক্তি বা লক্ষ্মীর স্বরূপ এইভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। কি কারণে সেই পরাবিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী এই নামে অভিহিত হয়, তাহারও কারণ অহির্বুধ্ন্য সংহিতায় এইরূপে উক্ত হইয়াছে, যথা—

"জগত্তয়া লক্ষ্যমাণা সা লক্ষ্মীরিতি গীয়তে"

সেই পরাবিষ্ণুশক্তি—সৃষ্টিকালে জগদ্রূপে অভিব্যক্ত হয় বলিয়া তাহার নাম লক্ষ্মী।

আবার প্রপঞ্চের সকল আকার সঙ্কুচিত হইয়া তাহাতে অবস্থিত বলিয়া তাহাকে কুণ্ডলিনীও বলা যায়, যথা—

জগদাকারসংকোচাৎ স্মৃতা কুণ্ডলিনী বুধৈঃ।" অহির্বুধ্ন্যসংহিতা। ৩।১২

ভিন্ন ভিন্ন পাঞ্চরাত্র সংহিতা গ্রন্থে এই পরাবিষ্ণুশক্তির বহু নামের নির্দ্দেশ আছে,

পাঠকের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য কয়েকটি নাম প্রদর্শিত হইতেছে,—আনন্দা, স্বতন্ত্রা, নিত্যা, পূর্ণা, শ্রী, পদ্মা, কমলা, বিষ্ণুশক্তি, বিষ্ণুপত্নী, বিষ্ণুমায়া, বৈষ্ণবী, অনাহতা, পরমানন্দসংবোধা, গৌরী, মহী, জগৎপ্রাণা, মন্ত্রমাতা, প্রকৃতি, মাতা, শিবা, তরুণী, তারা, সত্যা, শান্তা, মোহিনী, ইড়া, রতি, রন্তী, বিশ্রুতি, সরস্বতী ও মহাভাসা প্রভৃতি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের হ্লাদিনী শক্তির স্বরূপ-বিচারকালে বিষ্ণুশক্তির এই নামগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন হইবে বলিয়া এই কয়টির এই স্থানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা গেল।

বিষ্ণুশক্তির উন্মেষভেদ সুদর্শন

এইবার সেই পরাবিষ্ণুশক্তির উন্মেষ (যাহা জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে হয় বলা হইয়াছে) কয়প্রকার, তাহাই দেখা যাউক।

"লক্ষ্মীময়ঃ সমুন্মেষঃ স দ্বিধা পরিকীর্ত্তিতঃ।
ক্রিয়াভূতিবিভেদেন" (অহির্বুধ্ন্যসংহিতা)

নারায়ণের সেই লক্ষ্মীময় সমুন্মেষ ক্রিয়া ও ভূতি এই দুই প্রকারে অবস্থিত হইয়া থাকে।

ভূতিরূপ যে সমুন্মেষ, তাহার স্বরূপ কয়প্রকার, তাহার পরিচয়, যথা—

"ভূতিঃ সা চ ত্রিধা মতা
অব্যক্তকালপুংভাবাত্তেষাং রূপং প্রবক্ষ্যতে।"

অব্যক্ত, কাল, পুরুষরূপে প্রকটিত হয় বলিয়া সেই সমুন্মেষ তিনপ্রকার হইয়া থাকে। এই অব্যক্ত, কাল ও পুরুষের স্বভাব কি, তাহা পরে বলা যাইবে।

ক্রিয়াময় সমুন্মেষ কি প্রকার, তাহার নির্দ্দেশ এইরূপ দেখা যায়—

"ক্রিয়াখ্যো যঃ সমুন্মেষঃ স ভূতিপরিবর্ত্তকঃ।
লক্ষ্মীময়ঃ প্রাণরূপোবিষ্ণোঃ সঙ্কল্প উচ্যতে॥
স্বাতন্ত্র্যরূপ ইচ্ছাত্মা প্রেক্ষারূপঃ ক্রিয়াফলঃ।
উন্মেষো যঃ সুসঙ্কল্পঃ সর্ব্বত্রাব্যাহতঃ ক্রতৌ॥
অব্যক্তকালপুংরূপাং চেতনাচেতনাত্মিকাম্।
ভূতিং লক্ষ্মীময়ীং বিষ্ণোঃ সর্গে সংযোজয়ত্যয়ম্॥
অব্যক্তং পরিণামেন কালং কলনকর্ম্মণা।
পুরুষং ভোজনোদ্যোগৈঃ সর্গে সংযোজয়ত্যয়ম্॥"

এই যে ক্রিয়া নামক সমুন্মেষ, তাহাই ভূতিরূপ সমুন্মেষের পরিবর্ত্তক; ইহা

লক্ষ্মী, ইহা প্রাণস্বরূপ এবং ইহাই বিষ্ণুর সঙ্কল্প বলিয়া (শ্রুতিতে) নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বিষ্ণুর স্বাতন্ত্র্যই এই সমুন্মেষের মূল বা নিদান, প্রেক্ষা (প্রকৃষ্ট ঈক্ষণ) ইহার স্বরূপ, ক্রিয়া ইহার পরিণাম, এই শোভন সঙ্কল্প সকল প্রকার কার্য্য-সম্পাদনে অব্যাহত। বিষ্ণুর লক্ষ্মীময়ী যে ভূতিশক্তি, তাহাকে এই সুসঙ্কল্পরূপ ক্রিয়াময় সমুন্মেষ-ই প্রকটিত করিয়া থাকে, এই ক্রিয়াময় সমুন্মেষই সৃষ্টিকালে অব্যক্তকে পরিণামের সহিত কালকে কলন (অর্থাৎ লয়করণরূপ) ক্রিয়ার সহিত এবং পুরুষ অর্থাৎ জীবসমূহকে ভোগবিষয়ে উদ্‌যোগের সহিত যুক্ত করিয়া থাকে।

এই ক্রিয়াময় সমুন্মেষই পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তে সুদর্শন এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুদর্শনের সুদর্শনত্ব কি ?

"সর্ব্বত্রাব্যাহতত্বং যৎ তৎ সুদর্শনলক্ষণম্"

(অহির্বুধ্ন্যসংহিতা)

এই সঙ্কল্পরূপ ক্রিয়া সমুন্মেষের যে সর্ব্বত্র অব্যাহত-ভাব, তাহাই ইহার সুদর্শনত্ব।

এই সুদর্শনের স্বরূপ-পরিচয়-প্রসঙ্গে সংহিতাকার আরও বলিতেছেন—

"সোঽয়ং সুদর্শনং নাম সঙ্কল্পঃ স্পন্দনাত্মকঃ।
বিভজ্য বহুধারূপং ভাবে ভাবেঽবতিষ্ঠতে ॥" (অহির্বুধ্ন্যসংহিতা)

এই সেই সুদর্শন নামক সঙ্কল্প, স্পন্দনই ইহার স্বরূপ, এই সুদর্শনই নানাপ্রকার রূপে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক বস্তুতে অবস্থিতি করিয়া থাকে।

ক্রিয়া-সমুন্মেষরূপ এই সুদর্শনের সত্তা প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুতে কিভাবে পরিলক্ষিত হয়, তাহার নির্ণয় অগ্রে করা যাইতেছে।

(৪)

জীবের পৃথক্ ভাব ও প্রপত্তি

পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্ত—পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধত্রয়ে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। সেই সিদ্ধান্তানুসারে শক্তি ও শক্তিমান্ একই, বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে ভেদ নাই, জগৎসৃষ্টি সেই শক্তিমান্ পরমেশ্বরের শক্তিরই অভিব্যক্তি। এই জগৎ-সৃষ্টির উদ্দেশ্য, জীবনিবহের সংসারভোগ ও অপবর্গ। জীবসমূহ সেই শক্তিমান্ পরমপুরুষের অংশ, অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিজ্ঞানময় সেই পরমাত্মা বা

বাসুদেব হইতে প্রপঞ্চসৃষ্টির পূর্ব্বে জীবসমূহ আবির্ভূত ও পৃথক্‌কৃত হয়। জীবসমূহও পরমাত্মার ন্যায় সচ্চিদানন্দময় হইলেও অনাদিসিদ্ধ অজ্ঞান, মায়া বা ভগবদ্‌বৈমুখ্যের বশে তাহারা সংসারী হয়; নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া মোহবশতঃ দুঃখ অনুভব করে, এবং পুনঃ পুনঃ জন্মমরণের বশবর্ত্তী হয়। এই মোহনিবৃত্তির একমাত্র উপায়, ভগবৎপ্রপত্তি বা আত্মকর্তৃত্বের অভিমান বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ভগবানের শরণ গ্রহণ করা। সেই প্রপত্তি বা শরণাগতি অবিশুদ্ধ চিত্তে সম্ভবপর নহে, এই কারণে চিত্তবিশুদ্ধির আবশ্যক। চিত্ত-বিশুদ্ধির হেতু কর্ম্ম, সেই কর্ম্ম পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে যেভাবে করিতে বলা হইয়াছে, সেইভাবেই করিতে হইবে। ইহাই হইল সংক্ষেপতঃ পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

ভক্তির জন্যই মুক্তি-গৌড়ীয় সিদ্ধান্ত

ভেদবাদী বা অভেদবাদী দার্শনিকগণের মতে যেমন মুক্তিই মানবের চরম বা পরম পুরুষার্থ, পাঞ্চরাত্র মতেও ঠিক সেইরূপ, অর্থাৎ মুক্তির স্বরূপ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও মুক্তিই যে মানবের চরম লক্ষ্য, সে বিষয়ে দার্শনিকগণের সহিত পাঞ্চরাত্রিকগণেরও কোন মতভেদ নাই। সাংখ্য, পাতঞ্জল, নৈয়ায়িক, মীমাংসক, বেদান্তী ও বৌদ্ধ প্রভৃতি দার্শনিকগণ নির্ব্বাণ-মুক্তিকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন; কিন্তু পাঞ্চরাত্রিকগণ নির্ব্বাণকে পরম-পুরুষার্থ বলিয়া জানিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে সালোক্য, সারূপ্য প্রভৃতি পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে কোন একটি হইলেই জীবের পরমপুরুষার্থ সিদ্ধ হইল। যে নির্ব্বাণে আমার নিত্যসিদ্ধ অহন্তার বিলোপ হয়, সেই নির্ব্বাণ কখনই কোন জীবের স্পৃহনীয় হইতে পারে না। পাঞ্চরাত্রিকগণের এই সিদ্ধান্ত আচার্য্য রামানুজ, মধ্বস্বামী, নিম্বার্ক ও বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তি-সম্প্রদায়ের মহাপুরুষগণের অভিমত। ইঁহাদের সকলেরই মতে ভক্তি মুক্তির সাধন; ভক্তি জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থা ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। অদ্বৈতবাদী দার্শনিকগণও ভক্তির সাধনতা স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু ভক্তিই পরমপুরুষার্থ—মুক্তির জন্য ভক্তি নহে, পরন্তু ভক্তির জন্যই মুক্তি, এই নবীন অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তই বাংলার সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তের প্রচার দার্শনিক ভাবে বাঙ্গালী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম করিয়াছেন। আর নবদ্বীপ এই সিদ্ধান্তের জন্মভূমি। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই এই সিদ্ধান্তের প্রথম প্রচারক। এই সিদ্ধান্তের প্রকৃত স্বরূপ কি—তাহার আলোচনা করিবার

জন্য এই "মুক্তি ও ভক্তি" শীর্ষক প্রবন্ধের অবতারণা করা হইয়াছে। এক্ষণে তাহারই বিশদ আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতানুবর্ত্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে মোক্ষ বা নির্ব্বাণ মানুষের চরম বা পরম পুরুষার্থ নহে। প্রেমই মানুষের পরমপুরুষার্থ। ভক্তির চরমাবস্থাকেই তাঁহারা প্রেম বলিয়া থাকেন। এই প্রেম বা প্রেমভক্তির স্বরূপ কি, তাহা দেখা যাউক।

ভক্তি ও ভজনীয়ের স্বরূপ

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রধান পার্ষদ শ্রীরূপ গোস্বামী প্রেমভক্তির পরিচয় প্রসঙ্গে ভক্তির যে সামান্য লক্ষণ করিয়াছেন, তাহা এই—

"অন্যাভিলাষিতাশূণ্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকুল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

সংক্ষেপতঃ এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই—কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি, কৃষ্ণের বা কৃষ্ণের প্রীতির কামনায় যে অনুশীলন তাহাই কৃষ্ণানুশীলন। অনুশীলন শব্দের অর্থ ক্রিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে যে কোন কার্য্যই অনুষ্ঠিত হয় কিংবা কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে কোন ক্রিয়া করা যায়, তাহাই কৃষ্ণানুশীলন। ক্রিয়া বা অনুশীলন তিন প্রকারের হইতে পারে—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। ফলে দাঁড়াইতেছে —শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রণামাদি দৈহিক ক্রিয়া কিংবা নামকীর্ত্তনাদি বাচনিক ক্রিয়া, বা অনুরাগ, চিন্তা, ধ্যান, উৎকণ্ঠা, অভিলাষ প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া বা মনোবৃত্তিনিচয়—এই সকলই কৃষ্ণানুশীলন হইয়া থাকে। এক্ষণে আর একটি শব্দের অর্থ বাকি আছে। কৃষ্ণ—কৃষ্ণ কে—তাহাই অগ্রে দেখা যাউক। ভক্তি সম্প্রদায়ের সকল আচার্য্যই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে,

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্। (ব্রহ্মসংহিতা)

ইহার তাৎপর্য্য এই—পরমেশ্বরই শ্রীকৃষ্ণ পদের অর্থ; তিনি বিগ্রহ বা শরীর-সমন্বিত ও সেই শরীর মায়িক বা ভৌতিক নহে; তাঁহার শরীর নিত্য এবং নিত্য শরীর চিন্ময় ও আনন্দময়। তাঁহার আদি বা উৎপত্তি নাই, অথচ তিনি সকলের আদি। তিনি সকল কারণেরও কারণ, এবং তিনি গোবিন্দ অর্থাৎ আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের পরিচালক, অথচ সর্ব্ববিধ জ্ঞানের প্রকাশক।

'কৃষ্ণ' নামের অর্থ

এই কৃষ্ণের স্বরূপ কি? তাহা আরও বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য শাস্ত্র কি বলিতেছেন? শাস্ত্র বলিতেছেন,

"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো নশ্চনির্বৃতি-বাচকঃ
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—কৃষ্ ও ণ এই দুই শব্দের মিলনে কৃষ্ণ এই শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার মধ্যে "কৃষ্" এই শব্দটি ভূ অর্থাৎ সত্তাকে বোধ করাইয়া থাকে। আর 'ণ' এই শব্দটি নির্বৃতি অর্থাৎ শান্তিকে বোধ করায়। ফলে দাঁড়াইল এই যে, পারমার্থিক সত্তা ও পরম শান্তি যে স্থানে শাশ্বতভাবে বিরাজমান, সেই পরব্রহ্মই কৃষ্ণ শব্দের একমাত্র প্রতিপাদ্য।

শ্রীকৃষ্ণই অনন্য উপাস্য

কৃষ্ণ শব্দের এই সর্ব্ববৈষ্ণবাচার্য্য-সম্মত অর্থ যদি স্বীকার করা যায়, তবে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় যে এই কৃষ্ণানুশীলনকে ভক্তি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে কোন সম্প্রদায়ের আপত্তি থাকিতে পারে না। তিনি যেভাবেই পরমাত্মার উপাসনা করুন না কেন, তিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণানুশীলনই করিয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ উপাস্য দেবতার নাম বা আকারে বৈলক্ষণ্য, সংস্কার বা রুচির বৈলক্ষণ্য অনুসারে, আপাততঃ প্রতীত হইলেও সকল উপাসকের উপাস্য দেবতাই সকল প্রপঞ্চের একমাত্র কারণ, আদ্যন্তহীন ও চিদানন্দময় এবং তিনিই পারমার্থিক সৎ ও শক্তির একমাত্র আশ্রয়। ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এই অত্যুদার ভক্তিতত্ত্বে নির্গুণ ব্রহ্মবাদীর সাকার-ব্রহ্মবাদিসহ বিবাদের কোন হেতু নাই। ইহার কোন অংশেই তথাকথিত গোঁড়ামির কোন গন্ধও উপলব্ধ হইতে পারে না। এই কৃষ্ণতত্ত্বে শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিবাদের কোন হেতুই উপলব্ধ হয় না, হইতেও পারে না। এই কৃষ্ণই শাক্তের চিদানন্দময়ী জগদম্বা; আবার এই কৃষ্ণই বৈষ্ণবের প্রেমযমুনাকূলে বিবেক-নীপ-মূলে নিত্য বিরাজমান দ্বিভুজ-মুরলীধর। যিনি যে স্থানে, যে ভাবে বা যে নামে পরমাত্মার উপাসনা করুন না কেন, তিনি এই কৃষ্ণেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনি কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব—ইহা না বুঝিয়া যাঁহারা উপাসনার শান্তিময় সর্ব্বসাধারণ নন্দনকাননে বিদ্বেষময় কলহ-কণ্টকতরু রোপণ করিতে প্রয়াস করিয়া থাকেন,

তাঁহারা বৈষ্ণব নহেন, শাক্তও নহেন। এক কথায় বলিতে গেলে তাঁহারা উপাসনাতত্ত্বের কিছুই বুঝেন না। ইহাই বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মুখ্য সিদ্ধান্ত।

অনুকূল ও প্রতিকূল ভাবে অনুশীলন

সেই কৃষ্ণানুশীলন বা পরমাত্মার উদ্দেশ্যে কায়িক, বাচিক বা মানসিক ক্রিয়া কিন্তু "আনুকূল্যেন" অর্থাৎ অনুকূল ভাবের সহিত হওয়া চাই। নহিলে তাহা ভক্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে কেহ যদি কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষপর চিত্তে তৎসম্বন্ধে কোন কায়িক, বাচিক বা মানসিক ক্রিয়া করে, তবে সেই সকল ক্রিয়াকে ভক্তি বলা যাইবে না। কংস কৃষ্ণকে শত্রু ভাবিয়া তাঁহার বিনাশার্থ পুতনা রাক্ষসীকে গোকুলে পাঠাইয়াছিল। এই পুতনাপ্রেরণ বা পুতনাকে প্রেরণ করিবার সময় কংসের অন্তঃকরণে যে কৃষ্ণবিষয়িনী চিন্তা, তাহার কোনটিই ভক্তি পদবাচ্য হইতে পারে না; কারণ তাহা আনুকূল্য ভাবের সহিত হয় নাই, প্রত্যুত তাহা প্রাতিকূল্য বা বিদ্বেষ সহকারে হইয়াছিল।

এই আনুকূল্য বা প্রাতিকূল্য ভাব বলিতে কি বুঝা যায়, এক্ষণে তাহা দেখা যাউক। যাহাকে না দেখিলে বা মনে পড়িলে মন আপনা হইতেই আর্দ্র হইয়া আসে, আবার দেখিবার জন্য বা বার বার ভাবিবার জন্য আকুল হইয়া উঠে, তাহাকে দেখায় বা তাহার চিন্তাতেই আনন্দ অনুভব করে, তাহার প্রতি মনের যে ঝোঁক বা প্রবণতা, তাহারই নাম আনুকূল্য। সুখের বা সুখসাধনের প্রতি অন্তঃকরণের যে উন্মুখতা বা অভিলাষময়ী তৎপরতা, তাহাই আনুকূল্য। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভে জীব গোস্বামী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রিয়জন দূরদেশে থাকিলে, তাহার মুখখানি মনে পড়িলে মনের মধ্যে যে আকুল ভাব-জড়িত আশা, আকাঙ্খা, বা উৎকণ্ঠাময় কোমল মনোবৃত্তি-বিশেষ আপনা আপনি জাগিয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন সময় নয়নের প্রান্তে অশ্রুবিন্দু দেখা দেয়; অবসাদমাখা প্রতপ্ত দীর্ঘশ্বাসে বুকটা যেন কাঁপিয়া দুরু দুরু করিয়া উঠে, সংক্ষেপে বুঝাইতে হইলে তাহাকে আনুকূল্য বলা যাইতে পারে। এই আনুকূল্যের সহিত যে কৃষ্ণানুশীলন, তাহাকেই উদ্ধৃত শ্লোকে সামান্য ভক্তি রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহাই সকল প্রকার ভক্তির সাধারণ লক্ষণ। এই ভক্তি অধম, মধ্যম ও উত্তমভেদে তিনপ্রকার হইয়া থাকে। অধম ও মধ্যম ভক্তির বিশেষ পরিচয় এই শ্লোকে প্রদত্ত হয় নাই, উত্তম ভক্তির স্বরূপ

কি, তাহাই বুঝাইবার জন্য শ্রীরূপ গোস্বামী এই শ্লোকে তাহার দুইটি বিশেষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা, "অন্যাভিলাষিতাশূণ্যং", এবং "জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্"। এক্ষণে দেখা যাউক এই দুইটি বিশেষণের তাৎপর্য্য কি ?

অন্যাভিলাষিতা-শূন্য অর্থাৎ অন্য পুমর্থের সাধন নহে

"অন্যাভিলাষিতা" শব্দের অর্থ ভগবৎ-প্রীতি ছাড়া আর যাহা কিছু কামনার বিষয়, তাহা পাইবার জন্য যে অভিলাষ, তাহা এবং নিজের সুখ-সম্ভোগের কামনা এই দুই প্রকার কামনাই অন্যাভিলাষিতা। তাহা যে কৃষ্ণানুশীলনে বিদ্যমান থাকে, তাহা উত্তম ভক্তি হইতে পারে না। মোটের উপর দাঁড়াইতেছে—দরিদ্রের ধন পাইবার জন্য, দুর্ব্বলের ঐশ্বর্য্যলাভের জন্য, কামুকের রূপবতী বনিতা লাভের জন্য, বুভুক্ষিতের অন্নলাভের জন্য, উপেক্ষিতের সম্মান বা কীর্ত্তিলাভের জন্য, যে কৃষ্ণভজন বা যে কোন ভগবদ্‌বিগ্রহেব ভজন, তাহা উত্তম ভক্তি নহে। এমন কি, সংসারে বিরক্ত ব্যক্তির আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বা মুক্তি পাইবার জন্য যে ভগবদ্‌ভজনা, তাহাও উত্তম ভক্তি নহে। সকল প্রকার কামনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কেবল ভগবান্ প্রীত হউন, এই একমাত্র কামনা—হৃদয়ে দৃঢ়রূপে পোষণ করিয়া যদি কেহ ভগবদ্‌ভজনে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহার সেই ভজন, বা কৃষ্ণানুশীলনই উত্তম ভক্তি বলিয়া পরিগণিত হয়।

ভোগাভিলাষের ন্যায় মুমুক্ষা বা মুক্তি কামনাও যে ভগবদ্‌ভক্তির প্রতিকূল, এই কথা স্পষ্ট ভাবে অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভক্তির যে উজ্জ্বল ও অত্যুদার ভাব এই ভারতে সর্ব্বপ্রথম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান অতি অল্প লোকেই রাখেন। বাংলায় প্রবর্ত্তিত ভক্তিসিদ্ধান্তের ইহাই সর্ব্বপ্রধান বিশিষ্টতা।

ভক্তি যে সাধন নহে, কোন পুরুষার্থ-সিদ্ধির উপায় নহে, কিন্তু ইহাই সকল প্রকার পুরুষার্থের শিরোমণি বা পঞ্চম মুখ্যতম পুরুষার্থ—ইহা পুরাণ, স্মৃতি বা শ্রুতিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হইলেও নির্ব্বাণ-বাসনা-কবলিত বুদ্ধিও উহাতে আগ্রহ-পরায়ণ নব দার্শনিকগণের শুষ্ক ও নীরস তর্কজালের ঘনান্ধকারে তাহা বৌদ্ধমত-প্রাবল্যের সময় হইতে আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ভক্তিশাস্ত্রের এই অতুলনীয় রহস্য যুগ-যুগান্তরের পর বঙ্গদেশেই আবার প্রথম উদ্ঘোষিত হয়। ভক্তির অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যেন এই অত্যাবশ্যক সিদ্ধান্ত রত্নের নির্ব্বাণোন্মুখী প্রভাকে

পুনরুজ্জ্বলিত করিবার জন্য আবির্ভূত হয়েন। ইহা প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর জানিবার ও ভাবিবার বিষয়।

ভুক্তি ও মুক্তির স্পৃহা পিশাচী

ইহাই বুঝাইবার জন্য শ্রীরূপ গোস্বামী একস্থানে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, "ভুক্তিমুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে ভোগের স্পৃহা ও মোক্ষের স্পৃহারূপ দুই পিশাচী বিদ্যমান থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহাতে ভক্তিরূপ অনাবিল সুখের উদয় কি করিয়া হইতে পারে?

নির্ব্বাণরূপ চরম পুরুষার্থের সাধন নির্ণয় করিবার জন্য শুষ্ক তর্কজালে জড়াইয়া পরস্পরে বিবদমান দার্শনিকগণকে লক্ষ্য করিয়া আর কেহ এমন কঠোর বিদ্রূপোক্তির সহিত উপনিষদের সার সিদ্ধান্ত এমন সরলভাবে ও সাহসের সহিত খ্যাপন করিতে 'পারিয়াছেন, ইহা মনে হয় না। আপনাকে দেহময় ভাবিয়া দেহসর্ব্বস্ব হইয়া যাহারা কাজ করে, তাহাদের ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশাধিকার নাই, ইহা সকল দেশের ও সকল কালের ধর্ম্মাচার্য্যগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে আত্মার পৃথকত্ব-জ্ঞান যাঁহার হয়, সেই ব্যক্তিই ধর্ম্মজীবনে অধিকারী হইয়া থাকে। বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যে দেহের বিভিন্নতা সত্ত্বেও ওই অবস্থাত্রয়ে মালার পুষ্পসমূহে অনুগত সূত্রের ন্যায় আমার এক-রূপতা অনুভব করিয়া অনুমান ও শাস্ত্রের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে দৃঢ়বিশ্বাস আসিবে—যে বাল্যশরীর নাশের পর যৌবনশরীর লাভ করিবার সময় যেমন আমার বিনাশ হয় নাই—তেমনই এই মনুষ্যশরীর বিনষ্ট হইবার পরও আমার বিনাশ সম্ভবপর নহে। মনুষ্যদেহ প্রাপ্তি যেমন আমার ইচ্ছানুসারে ঘটে নাই, এই মনুষ্য-দেহ-নিপাতের পরও সেইরূপ আমার সর্ব্বথা অজ্ঞাত কোন কারণের বশে হয় ত আবার কোন দেহের সহিত আমার সম্বন্ধ হইতে পারে, যদি সেইরূপ দেহের সহিত সম্বন্ধ হয়, অথচ সেই দেহে আমাকে বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে উহা বড়ই অশোভন ও বিড়ম্বনাকর হইবে; সুতরাং এই জন্মেই এমন কোন শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে, যাহার প্রভাবে ভবিষ্যতে দেহান্তরের সহিত সম্বন্ধ হইলে আত্মাকে আর কোন দুঃখ বহন করিতে না হয় এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সুখভোগ করিতে পারা যায়। এই প্রকার জ্ঞান ও বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ় হইলে মানুষ পারলৌকিক সুখ ও দুঃখনিবৃত্তির উপায় স্বরূপ

ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এইরূপ ভাবে যাঁহারা শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা সকাম কর্ম্মী বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়া থাকেন। ঐহিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে উৎপন্ন যে শক্তির বলে পরলোকে সুখ ভোগ করিবার আশা মানুষের হইয়া থাকে, সেই শক্তিকেই শাস্ত্রকারগণ পুণ্য বা শুভাদৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে এই শক্তি সঞ্চয়ের উপায় স্বরূপ যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, সেই সকল কার্য্যই ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই সকল ধর্ম্মকার্য্যের প্রবৃত্তির নিদান যে ভোগেচ্ছা, তাহাকে শ্রীরূপ গোস্বামী উক্ত শ্লোকে পিশাচী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভোগেচ্ছার দুরন্ত পরিণাম

বস্তুতঃ, এই ভোগেচ্ছা পিশাচীই বটে। কেন, তাহা বলি। পিশাচী কাহাকে বলে? একের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার দ্বারা অপরের পিশিত অর্থাৎ শোণিত পান করাই যাহার স্বভাব, তাহাকে শাস্ত্র বা লোক পিশাচী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তাহাই যদি হয়, তবে প্রকৃত পক্ষে যে কোন প্রকারেই হউক না কেন, আমি সুখ ভোগ করিব এইরূপ যে ইচ্ছা, তাহা কেন না পিশাচী হইবে? এই পিশাচীর অঙ্গুলী হেলনেই শ্যামা বসুন্ধরার কত শ্যামল অঙ্ক লক্ষ লক্ষ নর শোণিত স্রোতে যে রঞ্জিত ও প্লাবিত হইতেছে—তাহার সাক্ষী সমগ্র সভ্য মানবের ইতিহাস। রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ড, মহাভারতের কুরুক্ষেত্র, ভারতেতিহাসের পানিপথ, পলাশী, আর সেদিনের ইউরোপের সেই লোমহর্ষক মহাযুদ্ধ। আর কত বলিব? সমগ্র মানব জাতির সকল শোণিত কর্দ্দমময় ছোট বড় যুদ্ধ সবই ত ওই ব্যক্তি-বিশেষের বা জাতি বিশেষের হৃদয়-গুহা-নিবাসিনী করাল পিশাচী মনুষ্য-শোণিত পিপাসার পরিণতি। ইহা যিনি না বুঝেন, তাঁহার পক্ষে ইতিহাস পাঠ বিড়ম্বনা নয় কি?

এই লোকে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধরূপ ভোগ্য বিষয়ের উপভোগ-স্পৃহা যেমন অপরের ভোগ্য বস্তুর প্রতি অধিকার-স্থাপনের জন্য মানবকে প্রবর্ত্তিত করে বলিয়া তাহা স্বজাতীয় জনসমাজে অশান্তি ও উন্মত্ততাকর জনবিপ্লবময় ভীষণ কলহের সৃষ্টি করিয়া থাকে, সেই মত লোকান্তরেও ব্যক্তিবিশেষের ভোগাভিলাষ যে এইরূপ করিবে, তাহা ধ্রুব সত্য। সুতরাং কি ইহলোকে, কি

পরলোকে ভোগাভিলাষই যে জনসমাজে সকল প্রকার অনর্থ ও অমূলক সকল প্রকার অশান্তির মূল নিদান হইয়া থাকে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? তাই সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র-দার্শনিক প্রবর আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন,

যুক্তং হি পরসম্পদুৎকর্ষো হীন সম্পদং পুরুষং দুঃখা-করোতীতি।

অর্থাৎ দেহাভিমানী প্রাণিদিগের মধ্যে একের অধিক ভোগ্যসামগ্রী দেখিলে তদপেক্ষা হীন সম্পদ্‌যুক্ত ব্যক্তি যে দুঃখিত হইয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক।

মুমুক্ষা পিশাচী

এক্ষণে অনেকেই হয়ত বলিবেন যে ভোগস্পৃহা লোকমধ্যে আসক্তি ও উপদ্রব সৃষ্টি করে বলিয়া তাহাকে পিশাচীর ন্যায় বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু সংসারবিরক্ত পুরুষের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি পাইবার জন্য যে স্পৃহা, তাহা কেন পিশাচী হইবে? প্রত্যুত তাহা ত সকল মানবের পক্ষে কল্যাণকরী হইয়া থাকে। ভক্তিশাস্ত্রের আচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামী সেই মোক্ষস্পৃহাকে যে পিশাচী বলিয়া নিন্দা বা উপহাস করিয়াছেন, তাহা সত্য সত্যই বাতুলের প্রলাপের ন্যায় প্রত্যেক বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট উপহসনীয় হইবে না কেন? নির্ব্বাণ পক্ষপাতী দার্শনিকগণের এইরূপ আশঙ্কার অসারতা প্রতিপাদন করিতে যাইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যাহা বলিয়া থাকেন, এক্ষণে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে পিশাচী যাহাকে পাইয়া বসে, সে যে কেবল পরের উপর উপদ্রব করিয়া ক্ষান্ত হয়, তাহা নহে; সময় বিশেষে সে যাহাকে পাইয়া বসে, তাহার মাথা চিবাইয়া খাইয়া তাহাকে আত্মবিনাশের দিকে প্রবর্ত্তিত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। শাস্ত্রে বলিয়া থাকে, পিশাচগ্রস্ত ব্যক্তিগণ উদ্বন্ধন ও বিষ ভক্ষণাদি দ্বারা আত্মহত্যা করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। তবে এই যে নির্ব্বাণপ্রিয় দার্শনিক ধুরন্ধরগণের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির জন্য যুক্তি ও প্রমাণ কল্পনার সাহায্যে সরল ব্যক্তিগণকে নির্ব্বাণের জন্য উত্তেজিত করা, ইহা কি প্রকৃতপক্ষে আত্মহত্যার জন্য লোকদিগকে উৎসাহিত করার ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট উপহসনীয় ও নিন্দনীয় নহে? নির্ব্বাণ জিনিষটা কি? ইহার উত্তরে ভেদবাদী দার্শনিকপ্রবর নৈয়ায়িক বলিবেন, নির্ব্বাণ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি, অর্থাৎ একেবারে অনন্তকালের জন্য সকলপ্রকার দুঃখের হাত হইতে জীবের নিষ্কৃতিলাভই নির্ব্বাণ। কে এমন অনুন্মত্ত ব্যক্তি আছে, যে

এইরূপ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি রূপ নির্ব্বাণকে না চাহিয়া আপনাকে মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত না হয়? দার্শনিক ঋষিশ্রেষ্ঠ গৌতম এই নির্ব্বাণটিকে জীবের পরমপুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উপনিষদ্, পুরাণ, স্মৃতি সকল অধ্যাত্ম শাস্ত্রই একবাক্যে এই নির্ব্বাণকেই জীবের মুখ্য প্রয়োজন বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। এ হেন নির্ব্বাণ-কামনাকে যিনি পিশাচী বলিয়া উপহাস করিতে সাহসী হয়েন—তিনি যে স্বয়ং পিশাচগ্রস্ত নহেন, তাহার প্রমাণ কি?

এইপ্রকার নির্ব্বাণপক্ষপাতী ভেদবাদী দার্শনিকগণের মতও যে নিতান্ত নির্যুক্তিক তাহা বুঝাইবার জন্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যাহা বলিয়া থাকেন, অগ্রে তাহা আলোচিত হইয়াছে।

(৫)

মুক্তির অর্থ অহংবিলয়

মুক্তির কামনা যে-মানুষের হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে, সে ভক্তিসুখের আস্বাদন করিতে সমর্থ হয় না। কারণ, মুক্তির কামনা পিশাচী, ইহাই হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্ত; ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভারতের দার্শনিকগণের নিকট কিন্তু মোক্ষই চরম বা পরম পুরুষার্থ। উপনিষদের যুগ হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সময় পর্য্যন্ত সকল দার্শনিকই এই মুক্তির পরমপুরুষার্থতা একবাক্যে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ইহা স্বীকার করেন নাই। প্রত্যুত মুক্তিকামনাকেও তাঁহারা পিশাচী বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। কেন যে তাঁহারা এইরূপ করিয়াছেন, এইবার তাহারই আলোচনা করিতেছি।

নির্ব্বাণ-মুক্তির স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাইয়া, কি দ্বৈতবাদী কি অদ্বৈতবাদী সকল দার্শনিকই বলিয়া থাকেন যে, "আমি", বা অহং-ভাব যে পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে, সে পর্য্যন্ত জীবের দুঃখসম্বন্ধ অনিবার্য্য, "আমি" থাকিতে আমার দুঃখ মিটিবার নহে, সুতরাং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি যদি চাহ, তবে অহংভাবের বা আমিত্বের ঐকান্তিক বিলোপ করিতেই হইবে। আমিও থাকিব, আমার দুঃখও মিটিবে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। এই অহংতত্ত্বের বিলয়রূপ নির্ব্বাণ ভগবান্ বুদ্ধের সময় হইতে ভগবৎপাদ আচার্য্য

শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য রচনাকাল পর্য্যন্ত ভারতীয় দার্শনিক আচার্য্যগণের মধ্যে পরমপুরুষার্থরূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

অহং নহে অহঙ্কারের বিলোপ

উপনিষদের মধ্যে এই নির্ব্বাণমুক্তি বা আমিত্বের ঐকান্তিক বিধ্বংস পরমপুরুষার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইত কি না, তদ্বিষয়ে কিন্তু বিলক্ষণ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতি ভক্তিসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ বিচার করিয়া ইহাই নির্ণয় করিয়াছেন যে, অহংতত্ত্বের বিলয়রূপ নির্ব্বাণ-মুক্তি কিছুতেই উপনিষদ্‌সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না—প্রত্যুত অহংতত্ত্বই অবিনাশী আত্মা, এই অবিনাশী অহংতত্ত্বের সহিত দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জড়বস্তুর যে কল্পিত তাদাত্ম্য বা অধ্যাস, তাহারই নাম অহংকার। এই অহংকারের বিনাশই জীবের পুরুষার্থ বা মুক্তি, ইহাই হইতেছে উপনিষদ্‌সিদ্ধান্ত। আমি চিরকালই আছি ও থাকিব, কিন্তু, আমার অহংকার বা দেহাত্মভ্রান্তি থাকিবে না; ইহাই জীবের মুক্তি। উপনিষদ্‌সমূহের তাৎপর্য্য-বিচার দ্বারাও এইরূপ সিদ্ধান্তই ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। এই অহং ও অহংকারের পার্থক্য না বুঝিয়াই বৌদ্ধ প্রভৃতি নাস্তিক দার্শনিকগণ মুক্তির স্বরূপ-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া, আত্মবিনাশ পর্য্যন্ত জীবের স্পৃহণীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা কিন্তু আর্য্যঋষিগণের অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত নহে।

উপনিষদে অহং

এক্ষণে দেখা যাউক, উপনিষৎসমূহে অহং-পদার্থ বিষয়ে কিরূপ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়, জীবন্মুক্ত বামদেব ঋষি বলিতেছেন:—

"অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ"—আমিই মনু এবং সূর্য্য প্রভৃতি হইয়াছিলাম।

অথর্ব্বশিখোপনিষদে দেখা যায়:—

"অহমেকঃ প্রথমমাসং বর্ত্তামি চ ভবিষ্যামি।"

এই দুই স্থলেই দেখা যাইতেছে যে জীবন্মুক্ত বামদেব প্রভৃতিও অহং এই শব্দের দ্বারাই জীবন্মুক্ত আত্মার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন। অহং যদি কল্পিত বা অধ্যাস মাত্রই হইত, তাহা হইলে এই সকল বাক্যে অহং শব্দের প্রয়োগ না হইয়া ব্রহ্ম বা আত্মা এইরূপ শব্দের প্রয়োগ হইত।

সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থায় পরমাত্মা বা পরমেশ অহং শব্দের দ্বারাই আত্মনির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহারও প্রচুর প্রমাণ উপনিষদেই দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপে কয়েকটি বাক্য মাত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ" (ছান্দোগ্য উপনিষৎ)

"বহু স্যাং প্রজায়েয়" (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ)

"স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজৈ" (ঐতরেয় উপনিষৎ)

প্রথম শ্রুতিটিতে অহং শব্দের সাক্ষাৎ প্রয়োগ করা হইয়াছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রুতিতে "স্যাং" "প্রজায়েয়" ও "সৃজৈ" এই তিনটি ক্রিয়াপদের দ্বারা সেই অহমর্থই প্রকাশিত হইতেছে।

গীতায় অহং-শব্দ

গীতাতেও দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীভগবান্ আত্মস্বরূপ প্রতিপাদন করিতে যাইয়া বার বার অহং শব্দেরই উল্লেখ করিতেছেন, যথা :—

"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।"
"অহমাত্মা গুড়াকেশ ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।"
"ন ত্বেবাহং জাতু নাসং।"
"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।"
"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।"
"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।"
"তেষাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা।"
"বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন॥"

এইরূপ আরও অনেক বচন গীতাতে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল বচনেই শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে আত্মস্বরূপ বুঝাইতেছেন এবং আপনাকে অহং বা আমি বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতেছেন। আমি বা অহং যদি কল্পিত বস্তু হইত, তাহা হইলে, পরমার্থভূত ভগবান্ কখনই আপনাকে 'আমি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন না। ইহা ত হইল শাস্ত্রীয় প্রমাণ।

সর্ব্বত্র অনুবৃত্ত অহং

সর্ব্বানুভবসিদ্ধ লৌকিক প্রমাণও বলিয়া দিতেছে যে, প্রতি জীবে যে

পৃথক্ পৃথক্ 'অহং' প্রকাশ পায়, তাহা অবিনাশী ও বাস্তব। অদ্বৈতবাদিগণেরই যুক্তি ও প্রমাণের বলে ইহা সিদ্ধ হইয়াছে যে, যাহা অনুবৃত্ত বা অব্যভিচারী, তাহা নিত্য ও বাস্তব সৎ, এবং যাহা ব্যাবৃত্ত বা ব্যভিচারী তাহাই মায়িক বা কল্পিত। সকল প্রকার বুদ্ধিতে যাহা প্রকাশ পায়, তাহাকেই অনুবৃত্ত বলা হয়, আর যাহা কোন বুদ্ধিতে প্রকাশ পায় এবং কোন বুদ্ধিতে প্রকাশ নাও পায়, তাহাই ব্যাবৃত্ত, যেমন ঘট, পট ও মঠ প্রভৃতি। আমাদের যে-কোন জ্ঞানেই সৎ এইরূপে প্রকাশিত যে বস্তু, তাহাই অনুবৃত্ত; কারণ, ঘট আছে, পট আছে, মঠ আছে, এইরূপ জ্ঞানমাত্রেই 'আছে'—এইরূপে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহার ব্যভিচার বা অভাব দেখা যায় না বলিয়া এই 'আছে' শব্দ দ্বারা প্রকাশিত যে সৎ বস্তু, তাহাই অনুবৃত্ত, সুতরাং তাহা নিত্য ও বাস্তব সৎ; কিন্তু ঘট, পট প্রভৃতি বিশেষ বস্তুগুলি সকল জ্ঞানেই প্রকাশিত হয় না বলিয়া, তাহারা প্রত্যেকেই ব্যাবৃত্ত, সুতরাং কল্পিত বলিয়াই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ইহা হইল বাহ্য বস্তুর অনুবৃত্তভাব ও ব্যাবৃত্ত ভাবের উদাহরণ। এইরূপ আন্তর বস্তুর স্বরূপ বিচার করিলে বুঝা যায়, অহংবস্তু সকলজ্ঞানেই অনুবৃত্ত থাকে বলিয়া উহা অকল্পিত বা বাস্তব সৎ, আর দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বস্তু সকল জ্ঞানে প্রকাশ পায় না বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। আমাদের জাগ্রদ্দশাতে যত জ্ঞান হইয়া থাকে, প্রত্যেক জ্ঞানেই এই অহংবস্তু প্রকাশ পায়, ইহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি রোগী, আমি ধনবান্, আমি নির্ধন, এই প্রকার সকল জ্ঞানেই 'আমি' প্রকাশ পায় বলিয়া তাহা অনুবৃত্ত এবং সেই 'আমি' ছাড়া আর সকল বস্তুই কোন জ্ঞানে প্রকাশ পায়, আবার কোন জ্ঞানে প্রকাশ পায় না বলিয়া সে সকলই ব্যাবৃত্ত বা কল্পিত বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে।

সুষুপ্তিতে অহং-লয়

এক্ষণে দেখা যাউক, আমি বা অহং ব্যাবৃত্ত বা অনুবৃত্ত। অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, আমাদের জাগরণ ও স্বপ্ন এই দুই অবস্থাতে যত প্রকার জ্ঞান হয়, সেই সকল জ্ঞানেই "অহং" প্রকাশ পাইলেও, সুষুপ্তিকালে যে বিষয়-প্রকাশরহিত বা অজ্ঞানপ্রকাশরূপ জ্ঞান থাকে, তাহাতে "অহং" এর প্রকাশ হয় না বলিয়া, ঘট, পট প্রভৃতি বাহ্য বস্তুর ন্যায় এই "অহং" ও ব্যাবৃত্তই হইয়া থাকে। সুষুপ্তিকালে এই "অহং" এর প্রকাশ হয় না বলিয়া ইহাকে সকল জ্ঞানে অনুবৃত্ত

বলা যায় না। সুতরাং ঘটপটাদির ন্যায় ইহা মায়িক বা কল্পিত ছাড়া আর কি হইতে পারে? জাগরণ ও স্বপ্ন এই দুইটি অবস্থাতেই আমরা দুঃখ-ভোগ করিয়া থাকি, কিন্তু সুষুপ্তির সময় আমরা কোন প্রকার দুঃখের অনুভব করি না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, দুঃখানুভূতির মূল কারণ ব্রহ্মে "অহং" ভাবের আরোপ। এই আরোপিত "অহং" সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানে মিশিয়া যায় বা অব্যক্তভাবে বিদ্যমান থাকে। এই কারণেই সুষুপ্তিতে আমাদের দুঃখানুভূতি হয় না, আর জাগরণ ও স্বপ্নকালে এই কল্পিত বা আধ্যাসিক "অহং" ব্যক্তভাবে প্রকাশ পায় বলিয়া দুঃখেরও অনুভূতি হইয়া থাকে। অহং থাকিলেই দুঃখ-ভোগ অনিবার্য্য আর অহং না থাকিলে দুঃখভোগ হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং সংসারের সকল প্রকার অনর্থের মূল এই "অহং"—ইহার আত্যন্তিক বিনাশ ব্যতিরেকে মুক্তি সম্ভবপর নহে। সর্ব্বপ্রকার উপাধি-বিরহিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের প্রত্যক্ষানুভূতিই এই "অহং" এর বিনাশ সাধন করিতে সমর্থ। সাক্ষাৎ এই ব্রহ্মানুভূতি করিতে হইবে, তাহার উপায় শাস্ত্রই বলিয়া দিতেছে, যথা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন বা নিরন্তর ধ্যান। ইহাই হইল অদ্বৈতবাদিগণের অহংতত্ত্ব ও মুক্তি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত।

সুষুপ্তির স্মৃতিতে অহং

ভক্তি-সম্প্রদায়ের আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতির মতে অদ্বৈতবাদীর এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নহে, এবং ইহা আমাদের প্রত্যেকেরই স্বানুভব বিরুদ্ধ; সুতরাং এই নির্যুক্তিক সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত নির্ব্বাণ মুক্তি বা অহং-তত্ত্বনাশ কখনই বিবেক-সম্পন্ন ব্যক্তির গ্রাহ্য হইতে পারে না। তাঁহারা বলেন, নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকগণ, সুষুপ্তিকালে জ্ঞানমাত্রেরই বিলয় হইয়া থাকে, এইরূপ সিদ্ধান্ত অবলম্বন করেন। অদ্বৈতবাদিগণ নৈয়ায়িক প্রভৃতির এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যে যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করেন—তাহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, সুষুপ্তি দশায় আমাদের অহং বিলুপ্ত বা অব্যক্ত হয় না, প্রত্যুত তাহা বিস্পষ্টভাবে আপনিই প্রকাশ পাইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন,—

সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্ততমোবোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ।
সা চাববুদ্ধ-বিষয়া হ্যববুদ্ধং তদা তমঃ।—পঞ্চদশী।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, 'নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে' 'আমি এতকাল কিছুই

বুঝিতেছিলাম না' এই প্রকার যে সুপ্তোত্থিত পুরুষের জ্ঞান হইয়া থাকে, সেই জ্ঞান তাহার সুষুপ্তির স্মৃতি। যাহা পূর্ব্বে অনুভূত হয় নাই, তাহার স্মরণও হয় না, সুতরাং সুপ্তোত্থিত পুরুষের এইরূপ স্মৃতির বিষয় যে অজ্ঞান, তাহা নিশ্চয়ই সুষুপ্তিকালে অনুভূত হইয়াছিল তাহা অঙ্গীকার করিতেই হইবে।

অজ্ঞান-প্রকাশে অহং-সত্তা

এই প্রকার সর্ব্ববিষয়ক আবরক অজ্ঞানের অনুভূতিকে যদি সুষুপ্তি বলা যায়, তাহা হইলে নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকগণ কি করিয়া বলেন যে সুষুপ্তিকালে আমাদের কোন জ্ঞানই থাকে না? সুষুপ্তিকালে জ্ঞানের অস্তিত্ব-সাধন করিতে যাইয়া অদ্বৈতবাদিগণ এই প্রকার স্মৃতির সাহায্যই অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু এই যে স্মৃতি—ইহা কি কেবল সুষুপ্তিকালে জ্ঞান মাত্রেরই সত্তাকে সিদ্ধ করে, অথবা সেই জ্ঞানের আশ্রয় যে 'অহং', তাহারও সত্তাকে সিদ্ধ করে? তাহার বিচার করিয়া দেখা যাউক। আচার্য্য রামানুজ বলেন, এই স্মৃতির দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে যে, সুষুপ্তিকালে 'অহং' এরও সত্তা অনুভূত হয়। তাহার কারণ, এই স্মৃতিতে কেবল অজ্ঞান ও তাহার প্রকাশের সত্তা বিষয়ীভূত হয় না, প্রত্যুত, সেই অজ্ঞান-প্রকাশের আশ্রয় যে 'অহং' তাহাও প্রকাশিত হইয়া থাকে। কারণ, সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি স্মরণ করে, 'আমি কিছু বুঝি নাই'। এই প্রকার স্মৃতিতে তিনটি বিষয় যে প্রকাশ পায়, তাহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। প্রথম আমি বা 'অহং', দ্বিতীয় কিছুই নয় বা অজ্ঞান, তৃতীয় বুঝা বা অজ্ঞানের প্রকাশ। নামরূপে বিভক্ত সংসার তখন বুঝা যায় না, ইহা সত্য, কিন্তু না-বুঝার বুঝা যে, এই 'অহং'কেই আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, তাহা কে অস্বীকার কবিবে? তাহাই যদি হইল, তবে—আমার এই সর্ব্বস্বভূত অহং কল্পিত, সুতরাং ইহার বিনাশ না করিলে আমার দুঃখ মিটিবে না, এই কারণে, ইহার বিনাশের একমাত্র উপায় নিরাকার নির্ব্বিকার ব্রহ্মস্বরূপ অদ্বয় জ্ঞানের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন; জীবের দুঃখ-নিবৃত্তির ইহা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই—এই প্রকার অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত কিরূপে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়? সুতরাং এই পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তি মার্গই জীবের অবলম্বনীয়। এ পথে যাইতে হইলে 'অহং' এর বিনাশ-বাসনারূপ পিশাচীর বশীভূত হইতে হইবে না। এ পথে অহং থাকে, কিন্তু অহংকার থাকে না; সংসার থাকে, কিন্তু সকল দুঃখের কারণ সংসারে আসক্তি থাকে

না। এই অহংতত্ত্বের অনাবিল পরিস্ফুরণরূপ নির্ম্মল আলোকের প্রভায় ভক্ত ও উপাস্যের মধ্যে যে মধুর সেব্য-সেবক-ভাবরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, তাহাই পরিস্ফুটভাবে প্রকাশিত হয় ও তাহার ফলে সমস্ত বিষয়ই ভক্তের নিকট চিরসুন্দর, রসময় ও আনন্দময় বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে।

মধুর পরমপদে বঞ্চিত মুমুক্ষু

এই মধুর সম্বন্ধ বা প্রাণারামের সহিত তৃষিত জীবের আধ্যাত্মিক মিলনের অনাবিল ও শান্তিময় আনন্দের সংবাদ যাহার নাই, সেই সংসার-সংগ্রামে বিতথ-মনোরথ হইয়া নির্ব্বাণ-মুক্তির কামনা করে। এ কামনা মানবকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করে বলিয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ইহাকেও পিশাচী বলিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে,—

"নোর্দ্ধং বিক্রমণে শক্তিস্তেষাং সন্তৃতপাত্মনাম্।"

পিশাচ-ভাবাবিষ্ট ব্যক্তিগণের পাপরাশি সঞ্চিতই থাকে, তাহাদের ঊর্দ্ধলোক সঞ্চরণে শক্তি থাকে না। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও লিখিত হইয়াছে,—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ! বিমুক্তমানিনস্তয্যস্তভাবাদ বিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

হে নলিন-সুন্দর-নয়ন! এই মধুর ভক্তি মার্গকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা জ্ঞানমার্গে বিচরণ করিতে করিতে সময়ে সময়ে মানস-কম্পনের বশে আপনাদিগকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে, তাহাদের বুদ্ধি বিশুদ্ধ হয় না, কারণ, তোমার প্রতি তাহাদের অনুরাগ হয় নাই। এইজন্য তাহারা নানাপ্রকার ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক উন্নতপদ প্রাপ্ত হইলেও, আবার তাহাদিগকে এই দুঃখ-তাপময় সংসারে পতিত হইতে হয়। তাহাদের সেই সমুন্নত পদ হইতে এই প্রকার পতন অনিবার্য্য, যেহেতু তাহারা সর্ব্বভয়-নিবারণ ত্বদীয় চরণারবিন্দে আদরপরায়ণ হয় নাই।

ভাগবতে বেদব্যাস-সিদ্ধান্ত

অদ্বৈতবাদীর মহাপ্রামাণিক গ্রন্থ শারীরক-সূত্রের রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাসের শ্রীমদ্ ভাগবতে এই উক্তির দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, ভগবদ্‌ভক্তি-বিহীনের জ্ঞানমার্গে আত্মোদ্ধার হইয়া থাকে, এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, যাহারা মুক্তি কামনাকে হৃদয়ে যত্নের সহিত পোষণ করিয়া থাকে, তাহাদের

অভীপ্সিত সমুন্নত পদ লাভ কদাচিৎ সম্ভবপর হইলেও সেই পদ হইতে পতন অনিবার্য্য। পিশাচীগ্রস্ত না হইলে, কাহারও সমুন্নত পদ হইতে পতন সম্ভবপর নহে, সুতরাং অভক্তজনের মুক্তিকামনাও যে পিশাচী সদৃশ—এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত নির্ভিত্তিক কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতই নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারেন না। এই সত্যসিদ্ধান্তের দৃঢ় ভাগবত ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব কুলের পরমাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামী নির্ব্বাণমুক্তির কামনাকেও পিশাচী বলিতে অণুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেন নাই।

(৬)

ভক্তি জ্ঞান-কর্ম্মে অনাবৃত

আমার অস্তিত্ব আমার সুখের জন্য নহে, আমার অস্তিত্ব আমার দুঃখ মিটাইবার জন্যও নহে, কিন্তু, আমার অস্তিত্ব সেই বিশ্বাত্মা শ্রীভগবানের প্রীতির বা সেবার জন্য—এই অত্যুদার ভূমাত্মভাবই মানব-জীবনে ভক্তিময় শান্তিনিকেতনের স্থির ও দৃঢ় ভিত্তি, ইহাই বুঝাইবার জন্য শ্রীরূপ গোস্বামী পূর্ব্বোক্ত ভক্তি-লক্ষণে "অন্যাভিলাষিতাশূণ্যং" এই বিশেষণ পদের ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে দর্শিত হইয়াছে। কৃষ্ণানুশীলনরূপ ভক্তির আর একটি বিশেষণ হইতেছে "জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্"। এই বিশেষণ দ্বারা কি সূচিত হইতেছে, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

কৃষ্ণানুশীলন বা শ্রীভগবানের সেবা জ্ঞান বা কর্ম্মের দ্বারা আবৃত হইলে তাহা বিশুদ্ধ ভক্তি হইবে না। জ্ঞানাবৃত্ত বা কর্ম্মাবৃত অনুরাগ কেন যে শুদ্ধভক্তি বলিয়া পরিগৃহীত হয় না, এখন তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। জ্ঞান যদি জীব ও ব্রহ্মের অভেদ মাত্রকেই অবলম্বন করে, তাহা হইলে সেই জ্ঞানকে ভক্তির আবরক বলা যায়, অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম, আমার আমিত্ব কল্পিত ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে—এইরূপ ঈশ্বরত্বও ব্রহ্মের উপর কল্পিত; আমার ও ঈশ্বরের বাস্তব সত্তা নাই; এক ব্রহ্মই বাস্তব সৎ; এ প্রকার যে অত্যন্তাভেদ-জ্ঞান, তাহা ভক্তির অনুকূল নহে। এই প্রকার জ্ঞান দৃঢ়ভাবে বিদ্যমান থাকিলে ভগবদ্‌ভজন সম্ভবপর নহে—এই প্রকার আত্যন্তিক অভেদ-জ্ঞান ভগবদ্‌ভজনের বিরোধী হইয়া থাকে, এই কারণে ভক্তের পক্ষে ইহা একান্তই পরিহরণীয়।

প্রত্যক্ষ ও অনুমান অপর্য্যাপ্ত

এই সিদ্ধান্তটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে ঈশ্বরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব এবং জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর সম্বন্ধ কি, তাহা অগ্রে বুঝিতে হইবে; সুতরাং তাহারই আলোচনা করিতে হইতেছে। প্রথমে দেখিতে হইবে—কিরূপ প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রমাণ বলিলে আমরা বুঝিয়া থাকি, যাহার দ্বারা যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রমাণ। এই বিষয়ে সকল দার্শনিকেরই যে সম্মতি আছে, তাহা বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিবেন না। সেই প্রমাণ প্রত্যক্ষ বা অনুমান হইয়া থাকে, ইহাও এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত বলিতে পারা যায়। চার্ব্বাক নামে প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণ যদিচ কেবল প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলেন, কিন্তু তাঁহাদের এই প্রকার মত যুক্তিসিদ্ধ নহে। কারণ অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকার না করিলে প্রত্যক্ষেরও প্রামাণ্য সম্ভবপর হয় না। ইহা প্রত্যক্ষমাত্রেরই প্রামাণ্যবাদী চার্ব্বাককেও অঙ্গীকার করিতেই হইবে। চার্ব্বাক যে প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলিয়া মানেন, সেই প্রত্যক্ষ কেন প্রমাণ হইবে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, চার্ব্বাককেও যুক্তির উপন্যাস করিতেই হইবে। তাহাই যদি হইল, তবে চার্ব্বাক অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকার করেন না—এই কথা তাঁহার শোভা পায় না। কারণ, যুক্তির দ্বারা বস্তুতত্ত্ব নিরূপণ করার নামই অনুমান; সুতরাং অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া তাঁহাকে মানিতেই হইবে। এইরূপে অনুমানও প্রত্যক্ষ—এই দ্বিবিধ প্রমাণ সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু এই দ্বিবিধ প্রমাণ সাহায্যে আমরা যে সকল বস্তু জানিতে পারি, তাহা সকলই লৌকিক বা ব্যবহারিক। সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, আমাদের নিকট যে সকল বস্তু প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়, তাহাদেরই অস্তিত্ব এই প্রত্যক্ষ বা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া আর এক প্রকার প্রমাণ আছে, যাহার নাম শব্দ বা আগম—এই আগম প্রমাণ ব্যতিরেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বুঝিবার অন্য কোন উপায় নাই।

পরমার্থ-সাধক আগম অপৌরুষেয়

এই আগম বা শব্দপ্রমাণের দ্বারা ব্যবহারিক বস্তুও আমাদের প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে। ইহা সত্য, কিন্তু ব্যবহারিক বস্তুসিদ্ধির জন্য যে আগম-প্রমাণ অপেক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা আমাদের লৌকিক প্রত্যক্ষ ও অনুমানের ভিত্তির

উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণে সেই প্রকার আগম-প্রমাণ প্রকৃতপক্ষে লৌকিক প্রত্যক্ষ বা অনুমানের মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। বৈশেষিক-নামে প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণ এইরূপ আগম প্রমাণকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—

"শব্দোপমানয়োর্নৈব পৃথক্ প্রামাণ্যমিষ্যতে অনুমান-গতার্থত্বাৎ।"

শব্দ ও সাদৃশ্য-প্রতীতিমূলক উপমানকে পৃথক্ প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় না, কারণ, এই দুইটি "তথাকথিত" প্রমাণের সাহায্যে যে বস্তু বুঝা যায়, তাহা অনুমান প্রমাণের বিষয় ছাড়া আর কিছুই নহে।

এই অনুমান বা প্রত্যক্ষমূলক শব্দপ্রমাণ ভিন্ন আর একজাতীয় শব্দপ্রমাণ আছে এবং সেই শব্দপ্রমাণ ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বুঝা যায় না বলিয়া শ্রুতি ঈশ্বরকে "ঔপনিষদ" পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

"তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি"—ছান্দোগ্য উপনিষদ্।

নারদ সনৎকুমারকে বলিতেছেন, "আমি আপনার নিকট সেই "ঔপনিষদ" পুরুষের কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

এই উপনিষদ্ বা পরমার্থ-বস্তু-সাধক আগমপ্রমাণকে দার্শনিকগণ অপৌরুষেয় প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কেন যে তাঁহারা ইহাকে অপৌরুষেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা না বুঝিলে ইহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝা যায় না, এই কারণে এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

অপৌরুষেয় শব্দে অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস এই যে, শব্দ দুই প্রকার, ধ্বনি ও বর্ণ। মানবের কণ্ঠ, তালু ও বক্ষঃ প্রভৃতির সাহায্যে যে শব্দ উৎপন্ন হয় না, তাহাকে ধ্বনি বলা হয়। আর যে শব্দের উৎপত্তি মানবের কণ্ঠ ও তালু প্রভৃতি দৈহিক যন্ত্রের সাহায্যেই হইয়া থাকে, তাহাকেই বর্ণ বলা হয়। স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে ঐ বর্ণাত্মক শব্দ দুই প্রকারের হইয়া থাকে। সেই বর্ণগুলি মিলিত হইয়া যথাক্রমে পদ, বাক্য ও মহাবাক্যরূপে বিভক্ত হইয়া থাকে। এই বর্ণাত্মক শব্দসমষ্টিই যদি উপনিষদ্ হয়, তাহা হইলে তাহা ত পুরুষ অর্থাৎ মানবের উচ্চারিত শব্দই হইল। মানব যাহা নিজে বুঝে বা কল্পনা করে, তাহা পরকে বুঝাইবার জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক এই প্রকার বর্ণাত্মক শব্দসমষ্টির উচ্চারণ করিয়া থাকে—ইহাই যদি হইল সর্ব্ববাদিস্বীকৃত সিদ্ধান্ত, তবে উপনিষদ্ বা ঈশ্বর তত্ত্ববোধক আগমপ্রমাণও পুরুষোচ্চারিত, সুতরাং তাহা অপৌরুষেয় হইবে

কি প্রকারে? যদি বল, পুরুষ শব্দের অর্থ সংসারী জীব, (সংসারী জীবের উচ্চারিত শব্দই পৌরুষেয়), ঈশ্বর সংসারী জীব নহেন—এই কারণে তাঁহার উচ্চারিত শব্দরূপ যে উপনিষদ্, তাহা অপৌরুষেয় হইবে, তাহাতে বাধা কি?

নাস্তিক দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন, এই প্রকার উক্তি যুক্তি-সম্মত নহে। কারণ, এই প্রকার যুক্তি অবলম্বন করিয়া বেদের বা উপনিষদের অপৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ করা এবং তাহার দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিবার চেষ্টা প্রমাণতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নহে। যেহেতু, এইরূপ করিলে অন্যোন্যাশ্রয়-রূপ একটি গুরু দোষ উপস্থিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ উপনিষদের প্রামাণ্যসিদ্ধির জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিতে হইতেছে, আবার ঈশ্বরের অস্তিত্বসিদ্ধি করিবার জন্য উপনিষদের প্রামাণ্য মানিতে হইতেছে; সুতরাং এইরূপ দোষযুক্ত যুক্তির দ্বারা আগমের অপৌরুষেয়ত্ব এবং তন্মূলক ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিবার প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্রই হইয়া থাকে।

লৌকিক প্রমাণ প্রতিজনে পৃথক্

এক্ষণে দেখা যাউক, নাস্তিক দার্শনিকগণের এইপ্রকার আক্ষেপের নিরাকরণ করিবার জন্য আগমপ্রামাণ্যবাদী আস্তিক দার্শনিকগণ কি বলিয়া থাকেন।

তাঁহারা বলেন,—এই যে আমরা প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রভৃতি লৌকিক প্রমাণের দ্বারা বস্তুতত্ত্ব বুঝিয়া থাকি, ইহা কি আমাদের যথার্থ জ্ঞান বা অযথার্থ জ্ঞান, তাহা বুঝিবার উপায় কি বল দেখি? আমরা যাহা দেখি বা অনুমান করি বা শুনি, তাহা যে ভাবে আমাদের জ্ঞানের গোচর হইয়া থাকে, সেই ভাব বা তত্ত্ব বাস্তব কি না, তাহা জানিবার উপায় কি? আমি পর্ব্বতের নিম্নভাগে দাঁড়াইয়া সম্মুখস্থিত যে শিখরকে উচ্চ বলিয়া বোধ করি, সেই শৃঙ্গকেই পর্ব্বতের উচ্চতর শৃঙ্গে অবস্থিত ব্যক্তি নিম্ন বলিয়া বোধ করিয়া থাকে, আবার তাহার সমোচ্চ শৃঙ্গে অবস্থিত ব্যক্তির নিকট তাহা উচ্চ বা নিম্ন বলিয়া প্রতীত হয় না, কিন্তু সম বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে। এইরূপ স্থলে বাস্তবিক ভাবে সেই পর্ব্বতশৃঙ্গ উচ্চ নীচ বা সম—এই তিন প্রকারের কোন প্রকারের হইবে, তাহার নিরূপণ কে করিবে? একই বস্তু, উচ্চ, নীচ বা সম হইতে পারে না. সুতরাং বলিতে হইবে সেই শৃঙ্গ পর্ব্বত-বিশেষের পক্ষে উচ্চ, আবার অন্যের পক্ষে নীচ, এইরূপ অপর একজনের পক্ষে সম। বাস্তবপক্ষে

সে কিন্তু উচ্চও নহে, নীচও নহে, সমও নহে। আমার পক্ষে তাহার উচ্চতা ব্যবহারিক, শ্যামের পক্ষে তাহার নীচতাই ব্যবহারিক, সেইরূপ রামের পক্ষে তাহার সমতাই ব্যবহারিক। এই ভাবের ব্যবহারিক তত্ত্বই আমাদের লৌকিক প্রত্যক্ষ বা অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সকল ব্যবহারিক স্বরূপের মধ্যে একটা অপরিবর্তনশীল পারমার্থিক কোন এক-স্বভাবাক্রান্ত কিছু আছে, তাহা আমরা কোন্ প্রমাণের সাহায্যে বুঝিয়া থাকি, তাহারও ত নির্ণয় করা প্রয়োজন। আর বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, আমাদের ভোগ্য বিষয় অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি আমাদের রুচি, সংস্কার ও পারিপার্শ্বিক বস্তুনিচয়ের প্রভাবে প্রত্যেকেরই নিকট পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রতীত হইয়া থাকে ও হইবারই ত কথা। কারণ প্রমাতার বৈলক্ষণ্য অনুসারে প্রমাণেরও বৈলক্ষণ্য হওয়াই উচিত। প্রমাণের বৈলক্ষণ্য অনুসারে প্রমার ও বৈলক্ষণ্য স্বতঃসিদ্ধ। প্রমার বৈলক্ষণ্য অনুসারে প্রমেয় বস্তুর ভাববৈলক্ষণ্যও অপরিহরণীয়। এই যে প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমা ও প্রমেয়ের পরস্পর-সাপেক্ষ বৈলক্ষণ্য—তাহা আমাদের প্রত্যেকেরই স্বানুভবসংবেদ্য। তাহার অপলাপ করিবার সম্ভাবনা কোথায়? দুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বেশ বুঝা যাইতে পারে। শরতের বিমল স্নিগ্ধ নীলাকাশে সমুদিত রজতধবল পূর্ণচন্দ্রের দিগন্ত-প্রসারিণী মধুর জ্যোৎস্নার শান্ত প্রবাহের সঙ্গে মিশিয়া যখন পাপিয়ার মর্ম্মস্পর্শিনী কলকাকলী সুষুপ্তির আবেশে অলস প্রাণিবৃন্দের নয়নে, শ্রবণে ও অন্তঃকরণে অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের জগৎ জাগাইয়া তুলে, তখন তাহা সুখের বিলাস-বিহ্বল যুবক ও যুবতীর হৃদয়ে মধুরতাময় বলিয়া প্রতীত হইলেও বিরহীর হৃদয়ে দহন জ্বালাবর্ষীর ন্যায় দুঃখময় বলিয়া আস্বাদিত হয়। আবার সংসারি-বিরক্ত সমদর্শীর নিকট তাহাই শান্তিময় প্রবাহের চিরমনোহর উৎস বলিয়াই অনুভূত হয়।

প্রপঞ্চে বাস্তবজ্ঞান দেহাত্ম-বুদ্ধি-মূলক

এই একই প্রকারের সৌন্দর্য্যের অনুপম বিবর্ত্তের যে অনুভূতিগত বৈলক্ষণ্য, তাহা যে প্রমাতার বৈলক্ষণ্য প্রসূত, তাহা কে অস্বীকার করিবে? ইহারই বিবরণ করিতে যাইয়া বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদী দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন—

কুণপঃ কামিনী ভক্ষ্যমেকস্যাং প্রমদাতনৌ।
পরিব্রাড়্-কামুক-শুনামিতি তিস্রো বিকল্পনাঃ।

মদিরার তীব্রমদাবেশে লুপ্তচেতনা রাজমার্গে নিপতিতা একটি বার-

বাণতাকে দেখিয়া বিস্মিত হৃদয়ে নির্নিমেষ নয়নে সৌন্দর্য্যানুভবে বিভোর-প্রাণ এক জন যুবক তাহার জাগরণের অপেক্ষায় বিশ্বস্ত প্রহরীর কার্য্য করিতেছে—দূরে দাঁড়াইয়া একটা মাংসলোলুপ কুক্কুর তাহাকে দৈবপ্রেরিত ভক্ষ্য বিবেচনা করিয়া রসনা-পরিতৃপ্তির শুভ সুযোগ অপেক্ষা করিতেছে, আর সেই পথের পার্শ্ব দিয়া একজন বিরক্তপ্রকৃতি শ্রমণক যাইতে যাইতে তাহা দেখিতে পাইয়া তাহাকে একপ্রকার "জীবিত শব" বিবেচনায় উপেক্ষার সহিত অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছে; ইহাই হইল লৌকিক প্রমাণের বিচিত্র পরিণাত। ইহারই নাম ত্রিবিধ বিকল্পনা। লৌকিক প্রমার এই প্রকার প্রমাতৃসাপেক্ষ বৈচিত্র্যের—এইরূপ অসংখ্য নিদর্শন, পর্য্যবেক্ষণশীল বিবেকীর নিকট অহরহঃই অনুভূত হইয়া থাকে; কিন্তু অবিবেকী প্রমাতার নিকট এই বৈচিত্র্যের স্পষ্ট অনুভূতি সম্ভবপর নহে,—সে দেহেন্দ্রিয় সঙ্ঘাতে আত্মত্বাভিমানের চশমা পরিয়া যাহা কিছু দেখিয়া থাকে, তাহারই সংস্কারানুসারী বিকল্পনিচয়কে যথার্থানুভব বলিয়া বোধ করে ও তদনুসারে প্রাপঞ্চিক বস্তুনিবহের বাস্তব সত্তায় বিশ্বাস-পরায়ণ হইয়া ব্যবহার নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এই ব্যবহারিক সত্তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের মূল কারণ হইতেছে দেহাত্মাভিমান ও তন্মূলক আত্মার কল্পিত প্রমাতৃভাব। এই লৌকিক প্রমাতৃভাব মানবের যতদিন নিবৃত্ত না হয়, ততদিন তাহার বাস্তব সৎপদার্থ দর্শনে অধিকার জন্মে না। ইহাই হইল অধ্যাত্মবিদ্ দার্শনিকগণের লৌকিক প্রমাণবিষয়ে সিদ্ধান্ত।

ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা

এই জাতীয় লৌকিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া সুখের ও দুঃখের উত্তেজনাপূর্ণ ব্যবহার-পরম্পরা অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ও সংসারের শেষ পর্য্যন্ত চলিবে; কিন্তু অবিশ্রান্ত বিপদের কশাঘাতে এবং সর্ব্ব-শক্তিমান্ কালের প্রাতিকূল্যের প্রভাবে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত প্রতিকারচেষ্টার অকৃতকার্য্যতায় মানবের কল্পিত কর্তৃত্বের অভিমান যখন বিদূরিত হইতে আরম্ভ করে, তখন তাহার চিত্তদর্পণে সুচিরসঞ্চিত দেহেন্দ্রিয়াভ্যাসরূপ আবরক ধূলিরাশি সুপ্ত-প্রবুদ্ধ বিবেকরূপ মারুতের উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল প্রবল হিল্লোলে অপসারিত হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় সদ্‌গুরুর কৃপায় ও সাধুসঙ্গের প্রভাবে, বিশ্বাসের দৃঢ়তায় ও দৃঢ়তার সহিত অবলম্বিত সাধনসামগ্রীর প্রভাবে তাহার সঙ্কীর্ণ প্রমাতৃভাব বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে—পরিচ্ছিন্ন দেহাত্মভাবের আবরণ

দূর হইয়া যায়। এইপ্রকার সৌভাগ্যলব্ধ অবস্থায় তাহার যে পরমার্থবস্তুপ্রবণ নির্ম্মল চিত্তবৃত্তি স্বতঃই উদিত হয়, তাহাকেই যোগীগণ ঋতম্ভরাপ্রজ্ঞা নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, বৌদ্ধ দার্শনিকগণ ইহাকেই বোধিচিত্ত বলিয়া থাকেন। এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা বা বোধিচিত্তে ব্যবহারাতীত দুর্জ্ঞেয় অথচ সারসত্যভূত বস্তুনিচয় প্রতিভাত হয়। এইপ্রকার অবস্থায় উপনীত মানবের বস্তুদর্শনকে পৌরুষেয় দর্শন বলা যায় না। ইহাই হইল পরমার্থদৃষ্টি। এই পরমার্থদৃষ্টি হইতে সমুৎপন্ন যে ভাষা, তাহাই অপৌরুষের বাক্য বা সমাধিভাষা।

স্বতঃ প্রমাণ শ্রুতি

এই অপৌরুষেয় বাক্য কখনও ব্যভিচারী হয় না, ইহাই স্বতঃ প্রমাণ-পদবাচ্য হইয়া থাকে। এই স্বতঃ প্রমাণভূত বাক্যনিবহেরই নাম শ্রুতি। সারসত্যের সংবাদ এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারাই মানবহৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। প্রসাদ, শান্তি ও অনাবিল আনন্দের ইহাই অক্ষয় উৎস। যাঁহার কৃপা ব্যতিরেকে ইহার সন্ধান মরণধর্ম্মী মানবের পক্ষে একান্ত অসম্ভব, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর এই অপৌরুষেয় দশাপ্রাপ্ত মানবের বা ঋষির সমাধিপূত হৃদয়ে আপনি আবির্ভূত হইয়া তাহার বাক্শক্তিকে নিয়মিত করিয়া শ্রুতি-বাক্যরূপে প্রকাশিত হইয়া দুঃখনিমগ্ন জীবগণের উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দেন। তখন সাধনাসিদ্ধ পুরুষের সেই ভাষাই আমাদিগকে বলিয়া দেয়—

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।

তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥" শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই ব্রহ্মার (সমাধিপূত হৃদয়ে) বেদসমূহকে প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই স্বয়ংপ্রকাশ ও ক্রীড়নশীল এবং আপনা হইতেই বুদ্ধিতে আবির্ভাবী পরমেশ্বরকে আমি শরণ বলিয়া আশ্রয় করিতেছি।

এই স্বতঃপ্রমাণ শ্রুতিই ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ণয়ে অসাধারণ প্রমাণ। প্রাকৃত বা মায়িক বস্তুনিচয় যাহার সাহায্যে প্রতীত হয়, পারমার্থিক সদ্‌বস্তুকে যাহা প্রকাশ করিতে পারে না, সেই লৌকিক বা ব্যবহারিক প্রমাণ কখনই ঈশ্বরতত্ত্বকে প্রকাশ করিতে পারে না। তাহাই শ্রীমদ্‌ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে, যথা—

"তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।"

যিনি আদিতত্ত্বদর্শী ব্রহ্মাকে তদীয় সমাধিপূত হৃদয়ের দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইয়াছিলেন, লৌকিক প্রমাণে নির্ভরশীল পণ্ডিতগণ যাঁহাকে বুঝিতে সমর্থ হয়েন না।

শ্রীভগবানের পরা শক্তি

তাঁহার স্বরূপ প্রদর্শনার্থ উদ্যত শ্রুতি বলিতেছেন—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

তাঁহা হইতে পৃথক্ কোন কার্য্যই নাই, আবার সেই কার্য্য করিবার জন্য তাঁহার কোন পৃথক্ সাধনও নাই; কেহই তাঁহার সদৃশ নহে বা তাঁহা হইতে অধিকও কেহ নাই। তাঁহার স্বরূপভূত শক্তি যে কত প্রকার, তাহা বলিবার উপায় নাই এবং সেই শক্তিসমূহও প্রাকৃতশক্তি হইতে সর্ব্বথা বিলক্ষণ; সুতরাং তাহা পরা,—তাঁহার জ্ঞান স্বাভাবিক, তাঁহার বল অযত্নসিদ্ধ এবং ক্রিয়া বা জগদুৎপত্তির অনুকূল উন্মেষও অকৃত্রিম।

এই শ্রুতিতে যে ভগবানের স্বরূপভূত পরাশক্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার একটু বিশদ পরিচয় একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং অগ্রে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

শক্তি কারণের ধর্ম্ম, কিন্তু সেই ধর্ম্ম কারণ হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্, ইহা বলা যায় না। আবার তাহা যে কারণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহাও বলা যায় না। তাহা কারণ হইতে ভিন্নও নহে, কারণ হইতে অভিন্নও নহে—তাহার ঠিক স্বভাবটি কি, তাহা আমরা বুঝি না, বুঝাইবার সামর্থ্যও কাহারও নাই; অথচ তাহার স্বরূপ মানি না, তাহাও বলিবার উপায় নাই।

কারণে বিচিত্র শক্তির ক্রিয়া

এইজন্যই শক্তিবাদী দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন—

"শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যাতর্কগোচরাঃ॥"

সকল বস্তুর যে সকল শক্তি লোকপ্রথিত আছে, তাহা অচিন্ত্য এবং তাহা তর্কের গোচর নহে। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারাই ইহা বেশ বুঝা যাইবে।

মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও উত্তাপ, এই কয়টি বস্তুতে জগতের সর্ব্বপ্রকার

বৃক্ষের উৎপত্তির অনুকূল শক্তি নিহিত আছে, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এক মৃত্তিকা লইয়া দেখা যাউক, সেই শক্তির স্বরূপ কি? তাহাতে তুলার বীজ বপন কর, যে তুলা উৎপন্ন হইবে, তাহার স্বভাব হইবে কোমলতা; তাহাতে কণ্টকের বীজ বপন কর, যে কণ্টক উৎপন্ন হইবে, তাহার স্বভাব হইবে কঠিনতা; এইরূপ জল, বায়ু ও উত্তাপ একই প্রকার হইলেও, একই সময় একই অবস্থায় তাহাদের কার্য্যে পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ—কঠিনতা ও কোমলতা আসিল কোথা হইতে? যদি বল—মৃত্তিকা প্রভৃতি সাধারণ কারণ হইলেও অসাধারণ যে বিভিন্ন প্রকৃতির বীজসমূহ, তাহাদেরই স্বতঃসিদ্ধ একরূপ প্রকৃতি অনুসারে তুলায় কোমলতা ও কণ্টকে কাঠিন্য আসিয়া থাকে, তাহা হইলেও নিস্তার নাই। কারণ, সেই বীজসমূহও ত মৃত্তিকারূপ উপাদান হইতেই নির্ম্মিত হইয়া থাকে; একই প্রকারের মাটি হইতে তুলার বীজ ও কণ্টকের বীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা সকলেই দেখিয়া থাকেন, অথচ সেই বীজের কোনটিতে কাঠিন্যের শক্তি নিহিত হয়, আবার কাহাতেও কোমলতার শক্তি নিহিত হয়, ইহার হেতু কি, তাহা কে নির্ণয় করিবে?

আরও দেখ, একই মৃত্তিকা হইতে ধান্য উৎপন্ন হইল, তাহা ভক্ষণ করিতেছে ছাগ, মেষ, গো, মহিষ প্রভৃতি নানা জীব। সেই ধান্য ছাগের উদরে প্রবিষ্ট হইয়া ছাগের দেহের উপযোগী চর্ম্ম, অস্থি, কেশ প্রভৃতি কার্য্যরূপে পরিণত হইল। আবার তাহাই মেষ, গো প্রভৃতি জন্তুর উদরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের প্রত্যেকের শরীরের উপযোগী পৃথক্ পৃথক্ অস্থি, চর্ম্ম প্রভৃতি কার্য্যরূপে পরিণত হইল। এই বৈচিত্র্যময় কার্য্যসমূহের উপাদান কিন্তু সেই একই মাটি বা মাটি হইতে উৎপন্ন ধান্যাদি শস্য। এই বিচিত্র কার্য্য-নির্ম্মাণের অনুকূল শক্তি একই রূপ কারণে নিহিত আছে; তাহার সত্তা সেই একই কারণের সত্তার সহিত অনুস্যূত, সুতরাং তাহাকে ঐ কারণ হইতে পৃথক্ বলা যায় না। অথচ কারণের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ একরূপতায় তাহার বিচিত্ররূপতার সামঞ্জস্য করা যাইতেছে না বলিয়া তাহাকে কারণ হইতে অভিন্নও বলা যায় না। সুতরাং শক্তির দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে কারণের এই বিচিত্র-স্বভাবতা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। একরূপতা ও নানারূপতা একেরই স্বভাব বলিয়া বাধ্য হইয়া মানিতে হয়, আর তখন মানুষের লৌকিক বিচারশক্তি বস্তুনিরূপণ ব্যাপারে স্বতঃই প্রতিহত হইয়া যায়।

এই পরিচ্ছিন্ন বিচারশক্তি লইয়া অপরিচ্ছিন্ন অলৌকিক শক্তিনিবহের একীভূত কেন্দ্র জগৎকারণ জগদীশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য মানবের প্রয়াস-পরম্পরা যে অজ্ঞতামূলক অভিমানের বিজৃম্ভণ ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহা কে অস্বীকার করিবে ?

তাই দার্শনিকশিরোমণি বিদ্যারণ্যমুনি স্বীয় পঞ্চদশী নামক সুপ্রসিদ্ধ বেদান্তপ্রকরণ-গ্রন্থে শক্তিতত্ত্বনিরূপণ প্রসঙ্গে নিঃসঙ্কোচে বলিয়াছেন—

"নিরূপয়িতুমারব্ধে পণ্ডিতৈঃ সকলৈরপি।
অজ্ঞানং পুরতস্তেষাং ভাতি কক্ষাসু কাসুচিৎ ॥"

জগতের পণ্ডিতমণ্ডলী একত্র হইয়া এই কার্য্যকারণভাব ও শক্তিতত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেও কয়েক কক্ষা অগ্রসর হইতে পারেন, কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হইবার পর তাঁহাদের সকলেরই সম্মুখে বস্তুতত্ত্বের আবরক অজ্ঞান আসিয়া তাঁহাদের বিচারশক্তিকে কুণ্ঠিত করিয়া দেয়, ইহা ধ্রুবসত্য।

(৭)

দুঃসাধ্য শ্রৌতকর্ম্ম

ভক্তির আর একটি স্বভাব এই যে, ইহা সুদুর্লভ। ইহা আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়াই প্রতীত হইতে পারে। কারণ, সর্ব্বসাধারণের ইহাই বিশ্বাস যে, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ ত্রিবিধ সাধনের মধ্যে ভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ, বিশেষতঃ কলিযুগে। শাস্ত্রেও বহু স্থানে উক্ত হইয়াছে যে, কলিযুগে যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম ভাল করিয়া অনুষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ, লোকের শ্রদ্ধা ক্রমশঃই কমিতেছে, যজ্ঞসম্পাদনের প্রধান সাধন ঋত্বিক্ বা পুরোহিত, উপনয়ন-সংস্কার ও তন্মূলক বেদাধ্যয়ন প্রভৃতির অত্যন্ত অবনতি বা অভাববশতঃ বেদার্থজ্ঞান না হওয়ায় যজ্ঞ করিবার উপযুক্ত শ্রদ্ধা কদাচিৎ কোন ব্যক্তির থাকিলেও পুরোহিত পাওয়া ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহা ছাড়া বিশুদ্ধ ঘৃত প্রভৃতি যজ্ঞসাধন-দ্রব্যনিচয় ভেজালের দৌরাত্ম্যে ও গোহত্যার আধিক্যবশতঃ সুদুর্লভ হইতেছে। এইরূপ ক্ষেত্রে বেদবিহিত কোন কর্ম্মই যে কলিযুগে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইবে, তাহার সম্ভাবনা কোথায় ?

জ্ঞানের অধিকারী বিরল

বাকী রহিল জ্ঞান, এই জ্ঞানশব্দের অর্থ অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান, ইহা ত কোন যুগেই সুলভ ছিল না, বিশেষতঃ কলিযুগে ইহা একেবারেই অসম্ভব বলিলেও বড় একটা অত্যুক্তি হয় না। কারণ, অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান শব্দের অর্থ এই যে, কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া অনাদিকাল হইতে প্রসিদ্ধ যে জীব বা অহং, তাহা ব্যবহারিক বা অজ্ঞানকল্পিত; নামরূপবিবর্জ্জিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই সৎ; আর সকলই মিথ্যা, এই প্রকার জ্ঞান। ইহা বলিতে বা শুনিতে ব্যক্তিবিশেষের ভাল লাগিলেও ইহাকে ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে সমর্থ অতি অল্প লোকই হইয়া থাকে। দুঃখের দারুণ কশাঘাতে ক্ষণিক বৈরাগ্যের প্রেরণায়, 'আমি' কিছুই নহে, 'আমি' মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য এই প্রকার জ্ঞান কোন কোন ব্যক্তির কদাচিৎ সম্ভবপর হইলেও অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত সুদৃঢ় ভোগবাসনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। অধ্যাত্মশাস্ত্রও তাহাই বলিয়া থাকে, গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকেও ইহা বুঝাইতে যাইয়া স্পষ্টভাবেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

> "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
> যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে এই অদ্বৈততত্ত্বের অনুভূতিরূপ সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য একজন হয়ত প্রযত্ন করিয়া থাকে; সেই প্রযত্নশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ বা যথার্থভাবে এই অদ্বৈততত্ত্বের অনুভব করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। সমর্থ না হইবারই ত কথা, কারণ, গুণময়ী প্রকৃতির অনাদিকাল হইতে প্রসারিত বিচিত্ররূপ সৃষ্টির মধ্যে নিপতিত, সুখভোগলালসাও রূপের অনুভূতির জন্য বদ্ধপাগল, এই দেহসর্ব্বস্ব জীবের পক্ষে উন্মাদিনী রূপতৃষ্ণা বা বিষয়ভোগবাসনার পরিহার যে কিরূপ অসম্ভব ব্যাপার, তাহা কে না বুঝে? এই রূপতৃষারই চিত্র অঙ্কন করিতে যাইয়া ভাবের কবি বিদ্যাপতি প্রাণস্পর্শী ভাষায় গাহিয়াছেন—

> "জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
> সোহি মধুর বোল শ্রবণহি শুননু শ্রুতিপথে পরশ না গেল।"

বিষয়-বাসনা-বদ্ধের চিত্তশুদ্ধি দুর্ঘট

এই ত সংসার! রূপতৃষার দুর্ব্বিষহ দহনজ্বালায় হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছে,

তাহাতে নয়ন, শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ হোতার ন্যায় রূপাদি ভোগ্যসমূহকে অবিরত আহুতি দিতেছে, প্রতপ্ত ইক্ষুদণ্ডের চর্ব্বণবৎ মুখ পুড়িলেও রসাস্বাদের মোহময় আবেগে দহননিবৃত্তির চেষ্টা হইতেছে না, জ্বালা বাড়িতেছে, বাড়ুক, পতঙ্গের ন্যায় রূপের অনলময় সাগরে পুড়িয়া মরিতে পারিলেই যেন চরিতার্থতা লাভ করিতে পারা যায়, এই উন্মাদনাময় বিশ্বাস বা সংস্কার এক ক্ষণের জন্যও ভোগলম্পট জীবকে ছাড়িতে চাহে না। ইহাই হইল জড় ও চেতনের অনাদিসৃষ্ট ব্যবহারিক মিলনের অপরিহার্য্য পরিণাম, ইহা পরিণতিবিরস হইলেও আপাতমধুর, হেয় বলিয়া প্রতীত হইলেও অশক্যপরিহার, ইহা অনন্ত নরকের পূতিগন্ধে নিত্য কলুষিত হইলেও তোমার আমার পক্ষে ইহা অপেক্ষা আস্বাদ্যতর বস্তু গগনকুসুমবৎ অলীক ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। অন্তঃকরণের এই বিষয়োপভোগবাসনা নিবারণ করিবার উপায় বিহিতকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও নিষিদ্ধকর্ম্মের বর্জ্জন। কলিযুগে তাহা ক্রমশঃই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে, এই কারণে চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনা এ যুগে অতি বিরল, চিত্তশুদ্ধি না হইলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারও হইতে পারে না, ইহাই ত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। তাহাই যদি হইল, তবে জ্ঞানরূপ সাধনও এই যুগে প্রায় অসম্ভব, এইজন্য ভক্তি ব্যতীত কলিতে জীবের আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভের অন্য কোন উপায় নাই। অথচ সেই ভক্তিই যদি দুর্লভ হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়, কলির হতভাগ্য জীবের শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি কোন প্রকারেই হইতে পারে না।

ভক্তিযোগেব বিধান

ভাগবতে কিন্তু ভক্তির অধিকারী যেরূপভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, এই যুগে অধিকসংখ্যক মানবই ভক্তিরূপ সাধনের উপর নির্ভর করিতে পারে ও নির্ভর করিয়াও থাকে। কর্ম্মজ্ঞান ও ভক্তির অধিকারী এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভাগবতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—

"নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধশ্চ যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥"

এই দুইটি শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ এই—যাহাদের কর্ম্মে বিরক্তি আসিয়াছে, এবং বৈরাগ্যভরে যাহারা কর্ম্মে অনাসক্ত হইয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছে,

জ্ঞানযোগ দ্বারা তাহারাই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। যাহারা শ্রদ্ধালু অথচ সুখভোগ কামনা করে, তাহাদের পক্ষে কর্ম্মযোগই সিদ্ধিকর, কিন্তু যাহার বৈরাগ্য হয় নাই, অথচ যাহার ভোগ্যবিষয়ে অত্যন্ত আসক্তিও নাই, তাহার যদি আমার (ভগবানের) কথা শ্রবণে বা নাম গুণ প্রভৃতির কীর্ত্তনে, কোন ফলকামনা না থাকিলেও শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে ভক্তিযোগই শ্রেয়োলাভের সাধন হইয়া থাকে।

আরও ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে—

"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকোব মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥"

কলিযুগ অসংখ্য দোষের আকর হইলেও ইহার এই এক মহান্ গুণ যে, এই যুগে শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন করিতে পারিলেই বিষয়াসক্তি হইতে মুক্তি পাইয়া মনুষ্য পরম পদে যাইতে সমর্থ হয়।

নববিধ ভক্তির মধ্যেই কীর্ত্তন পরিগণিত হইয়াছে। এই কীর্ত্তন সুদুর্লভ নহে, ইহা সকলেরই বিদিত, ইহাই যদি ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে কি প্রকারে বলা সঙ্গত হয় যে, ভক্তির ইহাই স্বভাব যে, ইহা দুর্লভ ?

ভক্তি সুদুর্লভ

ইহার উত্তর এই যে, ভাগবতই ভক্তিকে সুদুর্লভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, যথা—

"রাজন্ পতিগুর্রুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ভক্তিযোগম্ ॥"—ভাগবত।

শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে রাজন্, ভগবান্ মুকুন্দ যদুবংশীয় ও তোমাদিগের পাণ্ডুকুলের কি নহেন ? উদ্ধব ও অর্জ্জুনকে দ্বার করিয়া তিনি তোমাদিগকে কর্ম্মজ্ঞান ও ভক্তির গূঢ়রহস্য বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন ; সুতরাং তিনি তোমাদের গুরু ; তোমরা সকলেই তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিয়াছিলে, এই কারণে তিনি তোমাদের প্রিয় ; সকল প্রকার বিপদ্ হইতে মুক্ত করিয়া তিনি তোমাদিগকে পালন করিতেন, এই জন্য তিনি তোমাদের কুলপতি ; তোমার পিতামহ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে

অভ্যাগত ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালন করিয়া তিনি কিঙ্করেরও কায ক
ইহা সকলই সত্য ; কিন্তু ইহাও সত্য, তিনি মুক্তি অনায়াসেই দিয়া থাকেন ; পরন্তু কোন সময়েই কাহাকেও মুক্তির ন্যায় ভক্তিযোগ শীঘ্র দান করেন না।

একই ভাগবত এইরূপে কখন ভক্তিকে অতি সুলভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, আবার কখনও তাহাকে অতি দুর্লভ বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন। ইহা আপাততঃ পরস্পর-বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও ইহার মধ্যে অবিরোধকর গূঢ়রহস্য বিদ্যমান আছে, যাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে এই প্রকার বিরোধশঙ্কা উঠিতে পারে না। এইক্ষণে তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

ভক্তি দ্বিবিধ, পরা ও অপরা

ভাগবতশাস্ত্রে ভক্তি দ্বিবিধ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ;—অপরা ভক্তি ও পরা ভক্তি। অপরা ভক্তির আর একটি নাম সাধনভক্তি ; পরা ভক্তির আর একটি নাম সাধ্যভক্তি। এই সাধ্যভক্তিই প্রেম, প্রীতি ও ভাব প্রভৃতি শব্দের দ্বারাও অভিহিত হইয়া থাকে। সাধন ভক্তি বা অপরা ভক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞান অপেক্ষা সুলভ। এই সাধনভক্তিতে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেরই অধিকার আছে। এই সাধনভক্তির সম্যক্ অনুষ্ঠান না হইলে সাধ্যভক্তি বা ভগবৎপ্রেম হয় না, ইহাই হইল, ভাগবত প্রভৃতি সকল ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। সাধ্যভক্তি বা প্রেমভক্তিরই সুদুর্লভতা শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু নামক গ্রন্থে যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সেই প্রেমভক্তির স্বরূপ কি, তাহার নিশ্চয় না হইলে এই সুদুর্লভতা স্পষ্ট বুঝা যাইবে না, সেই জন্য এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

পরমপুরুষার্থ প্রেম

ভক্তিশাস্ত্রে প্রেমই পরমপুরুষার্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটিই অন্যান্য শাস্ত্রে পুরুষার্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে ; প্রেম কিন্তু এই চারিটির মধ্যে প্রবিষ্ট নহে, ইহা পঞ্চম পুরুষার্থ। ইহাই হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অসাধারণ সিদ্ধান্ত। সেই প্রেম কাম বা ভোগাভিলাষ নহে, এই প্রেমতত্ত্ব নিরূপণ করিতে যাইয়া কোন ভক্তকবি বলিয়াছেন—

বিশুদ্ধ প্রেমের তত্ত্ব শুন মন দিয়া,
যার স্বল্প হিল্লোলে জুড়ায় দগ্ধ হিয়া।

প্রেম প্রেম বলে সবে প্রেম জানে কেবা ?
প্রেম ত কখনো নহে রমণীর সেবা।
পুত্রাদির লাগি মনে আর্ত্তি যদি হয়,
বিশুদ্ধ প্রেমের তত্ত্ব সেও কভু নয়। (গোবিন্দদাসের কড়চা)

তবে সে প্রেম কি ?—

আত্মারামের লাগি আর্ত্তি যদি হয়,
বিশুদ্ধ প্রেমের তত্ত্ব মহাজনে কয়। (গোবিন্দদাসের কড়চা)

শ্রীচৈতন্যের অনুগত প্রিয় ভৃত্য গোবিন্দদাস এই কয়টি পয়ারে অতি সংক্ষেপে বিশ্বজনীন ভগবৎপ্রেমের যেরূপ সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। এই প্রেমরহস্যই সমগ্র ভক্তিশাস্ত্রের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত। একটু দার্শনিক-ভাবে ইহার আলোচনা না করিলে, এই দুরূহ বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝা যাইবে না, সুতরাং এক্ষণে তাহাই করিব।

আনন্দ-স্বভাব জীব

মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাব—সুখ পাইবার জন্য অদম্য ইচ্ছা, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না—সুখ আমাদের চিরপরিচিত, সর্ব্বদা অনুভূত হইলেও তাহারই পরিচয় ও তাহারই অনুভব করিবার জন্য আমরা সর্ব্বদা লালায়িত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছি। যাহা নিত্যবিরাজমান, যাহার সহিত বিচ্ছেদ কখনও সম্ভবপর নহে, তাহা পাইবার জন্য লালসার বৃশ্চিকদংশন কেন যে মানবের সর্ব্বদা হইতেছে, তাহার উত্তর কে দিবে ? কে সেই রহস্যের উদ্ঘাটন করিয়া আমার এই চিরদিনের ভ্রান্তি ও তন্মূলক ব্যাকুলতা মিটাইবে ? শ্রুতি বলিতেছেন—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি।"

প্রাণিসমূহ আনন্দ হইতেই উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া তাহারা আনন্দেই বাঁচিয়া থাকে, আবার প্রয়াণকালে সেই আনন্দেই বিলীন হয়।

এই আনন্দেই অভিব্যক্তি, আনন্দেই স্থিতি ও আনন্দেই লয় যদি জীবের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম বা স্বভাব, তবে এই আনন্দ পাইবার জন্য এই যে জীবের ব্যাকুলতা, এই যে দারুণ পিপাসা, ইহা আইসে কোথা হইতে ?

আনন্দ-সন্ধানের প্রেরণা

আনন্দ পাইবার জন্য—আনন্দ আস্বাদন করিবার জন্য—আনন্দময় হইবার জন্য অনিবার্য্য অভিলাষ যেমন জীবের স্বভাব, তেমনই এই আনন্দ স্বতঃসিদ্ধ হইলেও, নিত্যপরিচিত হইলেও, ইহাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা যে কেন হয়, তাহাও জানিবার জন্য তীব্র অভিলাষও আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মানবীয় ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থে—শ্রুতিতে এই নিগূঢ় রহস্য উদ্ভেদ করিবার জন্য মানবের উৎকট আকাঙ্ক্ষা কেমন সুন্দর ও সরলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে ;—

"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃশ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥"

(কেনোপনিষৎ)

কাহার প্রেরণায় সুখ খুঁজিতে মন চঞ্চল হইয়া বিষয়ে পড়িতেছে? জননী-জঠর হইতে নিপতিত হইবামাত্র কে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্বারা প্রাণপ্রবৃত্তিকে পরিচালিত করিয়াছে? কাহার প্রেরণায় বিষয়ভোগের জন্য বাগিন্দ্রিয় পরিচালিত হইতেছে? ওগো! সে দেবতাটি কে, যিনি আমাদের নয়নকে রূপের অনুভূতির জন্য আর শ্রবণকে শব্দ শুনিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন?

চেতন ও জড়ের ভোগ্য-ভোক্তৃভাবে এই বিচিত্র মিলনরূপ প্রাকৃত রাজ্যে—বাহিরে উপভোগ্য বিষয়নিবহের বা অন্তরে বাক্ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়, চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের যাহা কিছু ক্রিয়া, স্পন্দন বা উন্মেষ, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় সুখাস্বাদন বা ভোগ, সেই সুখাস্বাদনের যাহা কিছু অন্তরায়, তাহাই দুঃখ। সুতরাং দুঃখনিবৃত্তির জন্য যত প্রকার চেষ্টা পরম্পরায় হউক্ আর সাক্ষাতেই হউক, সে সকলেরই উদ্দেশ্য ঐ সুখাস্বাদ বা ভোগ ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে, সুখাস্বাদের অন্তরায় যতই প্রবল হয়, ততই সুখাস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হইয়া থাকে, ইহা বোধ করি কাহারও অবিদিত নহে।

আত্মাতে দুঃখ-সম্বন্ধের হেতু

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, এই ভোগ বা সুখাস্বাদের অন্তরায় বা দুঃখ আসে কোথা হইতে? আত্মা যদি সুখস্বরূপ হয়, প্রকাশ যদি তাহার স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব হয়, তাহা হইলে সে প্রকাশময় আত্মাতে সুখ-স্ফুরণের অভাব ক্ষণকালের

জন্যই বা হয় কেন? আর সেই অভাবের আক্রমণ হইতে আত্মাকে রক্ষা করিবার জন্য জীবনিবহের মন, ইন্দ্রিয় বা দেহের এই অবিশ্রান্ত প্রবৃত্তিই বা কিরূপে হয়? জড় প্রাকৃত রাজ্যের পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহৎ, বৃহত্তর বা বৃহত্তম এমন কোন বস্তুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যাহার প্রভাবে চেতন, অপরিণামী সুখময় ও প্রকাশময় চিদাত্মাতে এই অনির্ব্বচনীয় দুঃখাত্মতা উপনীত হইতে পারে। বৌদ্ধ প্রভৃতি নৈরাত্মবাদী দার্শনিকগণ এই প্রশ্নের অন্য কোন উত্তর খুঁজিয়া পান নাই, তাই তাঁহারা আত্মা বা অহং পদার্থকে একেবারে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। চার্ব্বাকগণ এই সমস্যার অন্য কোন সমাধান করিতে না পারিয়া আত্মাকে জড়নিচয়ের পরিণতিরূপে পরিণত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আস্তিক দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ বা আত্মাকে অর্দ্ধ-জড় ও অর্দ্ধ-চেতন বলিয়াছেন। এই সকল মতবাদের বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইহা উপযুক্ত অবসর নহে; কারণ, ঐ প্রকার নৈরাত্মবাদী বা অর্দ্ধনৈরাত্মবাদী দার্শনিকগণের মতবাদের উপর ভক্তিসিদ্ধান্তের অস্তিত্ব নির্ভর করে না। আত্মার অবিনাশিত্ব ও ভোগপ্রপঞ্চের মায়িকত্বে যাঁহারা বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে দুইটি সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। এক সম্প্রদায় আত্মার অহংভাবকে কল্পিত বা অজ্ঞানপ্রসূত বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহারা অদ্বৈতবাদী বলিয়া দার্শনিক সমাজে সুপরিচিত। আর এক সম্প্রদায় জীবের অহম্ভাবকে পারমার্থিক বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বলিয়া দার্শনিকগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই দ্বৈতাদ্বৈত-বাদিগণের সিদ্ধান্তই ভক্তিবাদের সুদৃঢ় ভিত্তি, এই সিদ্ধান্তানুসারে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আত্মাতে এই প্রাপঞ্চিক আবরণ কেন আইসে, দুঃখ-সম্বন্ধ কেন হয়, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

চর-পরিচিতের অপরিচয় রহস্য

সুখময় আত্মার সুখী হইবার জন্য পূর্ব্বোক্ত অদম্য আকাঙ্ক্ষা আর আকাঙ্ক্ষার বশে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণের সর্ব্বদা ব্যাকুলতাময় পরিস্পন্দন বা প্রবৃত্তি কেন কোথা হইতে আইসে, এই জিজ্ঞাসার পরিচয় আমরা কেনোপনিষদে পরিস্ফুটভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। ইহার উত্তর দিতে যাইয়া সেই কেনোপনিষৎ কি বলিতেছে, এখন তাহাও দেখা যাউক :—

> "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি ন মনো নো বিদ্মঃ
> ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ।

অন্যদেব তদ্বিদিতাৎ অথোঽবিদিতাদধি
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তাহা চক্ষুর বিষয় নহে বলিয়া তাহা বুঝান যায় না, মন তাহাকে ধরিতে পারে না। তাহা বুদ্ধিরও বিষয় হয় না। তাহা যে কি, তাহা আমরা বিশদ ভাবে বুঝি না। কেমন করিয়া তাহাকে কেহ বুঝাইয়া দিবে? তথাপি, যাঁহারা আমাদিগকে তাহার কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি, তাহা জ্ঞাত বস্তুনিচয় হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ অথচ তাহা একেবারে যে অবিদিত, তাহাও নহে। 'হরি হরি! প্রশ্নও যেমন রহস্যময় কুজ্ঝটিকায় আবৃত, উত্তরও দেখিতেছি তদপেক্ষা অবেদ্যতার সূচীভেদ্য অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন!' এই উত্তর শুনিয়া হয় ত অনেকেই এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিতে অণুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিবেন না। ভক্তিবাদী কিন্তু মনে করেন, এই উত্তরই তাঁহার জীবনের সকল সংশয়ের কুহেলিকা অপসারণ করিয়া গন্তব্য পথের দিক্ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে।

আমরা যাহাকে জানি না, চিনি না, যাহার পরিচয় দিবার ভাষার সঙ্গে আমাদের একেবারেই কোন পরিচয় নাই, তাহার অপেক্ষা অধিকভাবে জ্ঞাত বা পরিচিত যে এ সংসারে আমার কেহই নাই, এইরূপ কল্পনা কি সত্য সত্যই আমাদের নিকট গগনকুসুমের ন্যায় একান্ত অলীক? বোধ হয়, তাহা নহে; চিরপরিচিতের অপরিচয়, চিরজ্ঞাতের অজ্ঞান ও চিরপ্রাপ্তের অপ্রাপ্তি ইহাই ত সাংসারিক জীবের সুপরিচিত স্বভাব। একটি দৃষ্টান্তেই ইহা বেশ বুঝা যাইতে পারে। এই ধর না কেন, এ সংসারে এমন কে আছে যে, সুন্দরকে ভাল না বাসে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহার ভালবাসার বিষয় সুন্দর বস্তুটি কি? তাহা কি সে কখনও বুঝিয়াছে না বুঝাইতে পারিয়াছে?

প্রিয়তম 'আমি'র সন্ধান

এ সংসারে মানুষ সকলের চেয়ে অধিক ভালবাসে আপনাকে, ইহা লোকতঃ এবং শাস্ত্রতঃ সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত; কিন্তু বল দেখি, সেই ভালবাসার পাত্র যে আপনি বা স্বয়ং অথবা অহং, তাহাকে আমাদের মধ্যে কয় জন চিনিয়াছে? যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া দার্শনিককুল এই আত্মনিরূপণব্যাপারে বিব্রত; কত পুঁথি যে তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই; তাহা সত্ত্বেও তৃপ্তি নাই, এখনও রাশি রাশি পুঁথি লেখার ব্যাপারের বিরাম নাই। কখনও যে বিরাম

হইবে, তাহার সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত। কৈ, যে 'আমি'কে আমি সকলের চেয়ে ভালবাসি, সুতরাং যে 'আমি' আমার এ সংসারে সকলের চেয়ে সুপরিচিত, তাহার পরিচয় দিবার ভাষা এ পর্য্যন্ত আমার—শুধু আমার কেন, সেই আদিকবি চতুরানন হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত কোন কবি বা কোন দার্শনিকের মুখে ফুটিল না কেন? আমি যে এই অন্নরসবিকার-জড়পিণ্ড দেহ নহি, তাহা অনেক সময়ে ভাবিয়া ঠিক করিয়া বসি, শাস্ত্রও আমাকে তাহা বুঝাইবার জন্য সর্ব্বদা সমুত্থত, কিন্তু আমাকে দেখিবার জন্য যখনই সাধ হয়, তখনই আমি দর্পণের সাহায্য লইয়া থাকি। তাহাতে দেখি কি?

কদর্য্য দেহোপাদান

দেখি, এই আমার ভোগায়তন শরীর, যাহা ভিতরে মল, মূত্র, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, শোণিত, বাত, পিত্ত ও কফে পরিপূর্ণ; বাহিরে শ্লেষ্মা, অশ্রু, কেশ, রোম, নখ ও চর্ম্মে আবৃত। এই সকল আমার আমিত্বের বাহ্য ও আভ্যন্তর মালমসলার কোন্‌টী যে আমি, তাহা ত খুঁজিয়া পাই না। আমি যে আমার চেয়ে সুন্দর আর কাহাকেও জানি না; কিন্তু এই মালমসলার কোন-টিকেও যে আমি সুন্দর দেখি না, প্রত্যুত ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকটিই আমার সম্পর্করহিত হইলেই ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য ও হেয় বলিয়া আমি বিশ্বাস করিয়া থাকি। শাস্ত্রও ইহাদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া থাকে। ইহা কে না বুঝে? ফলে দাঁড়াইতেছে এই যে, আমি যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে খুঁজিয়া পাই না; যাহাকে খুঁজিয়া পাই, যাহাকে চিনি, তাহাকে আমি ভালবাসি না; কিন্তু তাই বলিয়া আমার কাছে আমি যে অপরিচিত, অদৃশ্য, অস্পৃশ্য, ইহা কখনও আমি মনে ভাবিতেও পারি না, আমি আমাকেই চিনি না, ইহা কি কখন সম্ভবপর হইতে পারে? সে আমি যে আমার চির-পরিচিত, চির-আদৃত, চির-আস্বাদিত, তাহাকে যে কখন ভুলা যায় না, তাহার অদর্শনই ত আমার মরণ; আমার চির-পরিচিত আত্মার বা আমির যখন এই অবস্থা, তখন আমার তৃপ্তির বাহ্য সাধন কোন স্ত্রী বা পুরুষের সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বিচার করিবার প্রবৃত্তিও যে এইরূপ অনাশ্বাসে পরিণত হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? এই আত্মসৌন্দর্য্য ও পরসৌন্দর্য্যের অনির্ব্বচনীয়তা অথচ প্রিয়তাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতও ত এই কথাই বলিতেছেন :—

শ্লেষ্মাশ্রুকেশনখলোমপরীতমস্ত র্মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্‌কফবাতপিত্তম্‌।
জীবচ্ছবং শ্রয়তি কান্তধিয়া বতান্যা যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী ॥

রুক্মিণী দেবী শ্রীভগবান্‌কে কহিতেছেন—এ সংসারে যে রমণী তোমার শ্রীচরণারবিন্দের মকরন্দসৌরভ জীবনে কোন দিন আঘ্রাণ করে নাই, সেই প্রাকৃত রমণীই জীবিত শবকে কান্ত ভাবিয়া আশ্রয় করিয়া থাকে। কারণ, সে যাহাকে সুন্দর বলিয়া ভালবাসে, তাহা বাহিরে শ্লেষ্মা, অশ্রু, কেশ, নখ ও লোমে আবৃত, আর অভ্যন্তরে তাহা মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, বাত ও পিত্তে পরিপূর্ণ।

(৮)

জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদে পরমপুরুষার্থ

ভক্তির স্বরূপ কি, তাহা লইয়া জ্ঞানী ও ভক্ত এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। জ্ঞানী বলেন, মোক্ষের সাধন জ্ঞান, জ্ঞানের সাধন ভক্তি। ভক্ত বলেন মোক্ষ ত চাই না, জ্ঞান চাই বটে , কিন্তু সেই জ্ঞান কি ? তাহা যদি ভক্তির সাধন হয়, তবেই তাহা চাই, নচেৎ তাহা উপেক্ষার্হ, ভক্তি পরম পুরুষার্থ। শুধু পরম পুরুষার্থ বলিলে চলিবে না, ভক্তি পরম বা চরম, অথবা পঞ্চম পুরুষার্থ। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম পুরুষার্থ, মোক্ষ পরম পুরুষার্থ, ভক্তি হইতেছে চরম বা পঞ্চম পুরুষার্থ। ভক্তির এই পঞ্চম পুরুষার্থতাবাদ বঙ্গের নিজস্ব। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ইহাই চরম সিদ্ধান্ত। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে এই ভক্তির পঞ্চমপুরুষার্থ-বাদ শ্রুতি ও পুরাণ শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত ছিল। দার্শনিক ভাবে সর্ব্বপ্রথম ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্য সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়, তৎপরে জীব গোস্বামী তাঁহার ভাগবত-সন্দর্ভ নামক গ্রন্থে ইহার বিস্তৃতভাবে আলোচনা ও প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহাদের পদাঙ্কসরণী অনুসরণ করিয়া এই ভক্তি রহস্যের আলোচনা করা যাইতেছে। নিজ নিজ অধিকারানুসারে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে মানবের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়, ইহা কি দ্বৈতবাদী অথবা অদ্বৈতবাদী সকল দার্শনিকই স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই অন্তঃকরণের বিশুদ্ধ অবস্থা না হইলে পরমার্থ বস্তুর দর্শন হয় না, পরমার্থ দৃষ্টি হইলে সাংসারিক নিখিল বস্তুনিচয়ের অসারতা বুঝিতে পারা যায় ; তাহার ফলে ঐ

সকল বস্তুর প্রতি আস্থা কমিয়া যায়। এ পর্য্যন্ত জ্ঞানী ও ভক্তের কোন মতদ্বৈধ নাই, ইহার পরেই কিন্তু মতভেদ আসিয়া পড়ে। জ্ঞানবাদীর মতে ইহার পর সাধকের অন্তঃকরণে বৈরাগ্য বৃত্তি উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে এবং সেই প্রবল বৈরাগ্যবশে সাধক অহং বা জীবাত্মাকেও ব্যবহারিক বলিয়া পরব্রহ্মে তাহারও বিলয় করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হয়। এই অবস্থায় জীবের ধ্যেয় শুদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্ব, এই ধ্যানে জীবতত্ত্ব বিলীন হইয়া যায়, কেবল নির্গুণ নিরাকার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উপলব্ধি মাত্রই থাকে, ইহাই হইল, জ্ঞানবাদীর চরম লক্ষ্য। দেহ থাকিতে এই প্রকার অহংভাব-বিবর্জ্জিত ব্রহ্মোপলব্ধির নামই জীবন্মুক্তি। এই প্রকার জীবন্মুক্ত অবস্থায় যদি দেহপাত হয়, তাহা হইলে আর দেহ-পরিগ্রহ করিতে হয় না। ইহারই নাম নির্ব্বাণ। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের মতে ইহাই পরমপুরুষার্থ। ভক্তিবাদী বলেন, শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতির মধ্যে এই প্রকার মোক্ষের স্বরূপ বর্ণিত থাকিলেও—ইহাই যে জীবের চরম পুরুষার্থ, তাহা ঋষিগণের অভিপ্রেত নয়, প্রেম বা ভক্তিই জীবের চরম পুরুষার্থ, ইহাই শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রসম্মত এবং ইহাই যে মানবের আত্যন্তিক পুরুষার্থ, তাহা যুক্তি-প্রমাণ, স্বানুভূতির দ্বারাও ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে।

রসস্বরূপ প্রাণমূলে

শ্রুতি নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলিতেছেন—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দীভবতি, কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ রস আনন্দো ন স্যাৎ।"

তিনিই রস, এই জীব সেই রসকে লাভ করিয়াই আনন্দ পাইয়া থাকে, সেই আনন্দস্বরূপে রস যদি না থাকিত, তাহা হইলে এই সংসারে কে স্পন্দিত হইত, কে বা বাঁচিয়া থাকিত? এই রস কি? ইহা মধুর, অম্ল, কটু, কষায়, তিক্ত ও লবণ এই ছয় প্রকার রসনেন্দ্রিয়াস্বাদ্য রসের অন্তর্ভুত নহে। কারণ, ইহার কোনটিই আনন্দ বা সুখ নহে, এই ছয় প্রকার রসের উপর জীবের স্পন্দন বা প্রাণনের সহিত ঐকান্তিক সম্বন্ধও নাই; শ্রুতি কিন্তু স্পষ্টই বলিয়া দিতেছেন, এই আনন্দময় রস না থাকিলে সকল প্রকার স্পন্দন বা জীবন কথামাত্র-শেষ হইয়া পড়ে। সমাধি ও সুষুপ্তিদশায় জীবন থাকে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ছয়টি রসের কোনটিরও আস্বাদন হয় না; সুতরাং এই শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট রস যে উক্ত ষড়্‌বিধ লৌকিক রসের অন্যতম নহে, তাহা সিদ্ধ হইতেছে। তবে কি ইহা কবি-সমাজে প্রসিদ্ধ শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ প্রভৃতি নববিধ রসের অন্যতম? তাহাও হইতে

পারে না ; কারণ, এ সংসারে কাব্যরসের আস্বাদন ব্যতিরেকে অনেক শিক্ষিত বা অশিক্ষিত মানব বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, অথচ শ্রুতি বলিতেছেন, এই আনন্দময় রস না পাইলে কেহই জীবিত থাকিতে পারে না, তবে এই রস কি ? ভক্তি সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ বলেন এই রস প্রীতি বা প্রেম, লোকে ইহারই নাম ভালবাসা, এই প্রীতি বা ভালবাসার উপর বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহারই জন্য বিশ্বপ্রপঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে, আবার ইহাতেই তাহা মিশিয়া যাইবে।

রসের প্রকাশ প্রীতি

এই রসময় প্রীতিকে আনন্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া শ্রুতিও ইহাই বলিতেছেন—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি।"

এই আনন্দ হইতেই প্রাণিনিচয় আবির্ভূত হয়, আবির্ভূত হইয়া ইহার দ্বারাই তাহারা জীবিত থাকে, আবার প্রলয়ের সময় তাহারা ইহাতেই মিশিয়া যায়।

এই প্রীতি বা রস, ইহা নিত্য, জীব-হৃদয় ইহার অভিব্যক্তির স্থান বা অধিষ্ঠান, দেহাত্মাধ্যাস-কলুষিত অন্তঃকরণে ইহার অভিব্যক্তি হইলে ইহা কাম নামে অভিহিত হয়। এই প্রীতি ও কামের নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া কবিরাজ-গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃতে বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম,
আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।"

এই পয়ারটির মধ্যে যে গভীর দার্শনিকতত্ত্ব সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হইয়াছে, তাহার বিশদ ব্যাখ্যান ব্যতিরেকে রসতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় না, এই কারণে এই ক্ষণে তাহাই কয়া যাইতেছে।

প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, এই রস বা প্রীতি, যাহা অন্তঃকরণে অভিব্যক্ত হয়, তাহার স্বরূপ কি, অর্থাৎ তাহা জ্ঞানবিশেষ বা ইচ্ছাবিশেষ অথবা তাহা জ্ঞান ও ইচ্ছার বিষয় আনন্দ-স্বরূপ কোন পদার্থ।

প্রেমভক্তি সম্প্রদায়ের আচার্য্য গোস্বামিগণ বলেন ইহা কেবল জ্ঞানও নহে, কেবল ইচ্ছাও নহে অথবা কেবল আনন্দও নহে। তবে ইহা কি ? তাহারই উত্তর দিতে যাইয়া শ্রীজীব গোস্বামী প্রীতি-সন্দর্ভে বলিয়াছেন,—

"এতদুক্তং ভবতি প্রীতিশব্দেন খলু মুৎ-প্রমদ-হর্ষানন্দাদি-পর্য্যায়ং সুখমুচ্যতে ভাবহার্দ্দসৌহৃদাদিপর্য্যায়া প্রিয়তা চ উচ্যতে। তত্র উল্লাসাত্মকো জ্ঞানবিশেষঃ সুখং, তথা বিষয়ানুকূল্যাত্মকস্তদানুকূল্যানুগত-তৎস্পৃহা-তদনুভবহেতুকোল্লাসময় জ্ঞানবিশেষঃ প্রিয়তা।" (ভাগবতসন্দর্ভে প্রীতিসন্দর্ভঃ)

এই সংস্কৃতাংশের অনুবাদ এইরূপ—"ইহাই বলা হইতেছে যে, প্রীতি এই শব্দ দ্বারা সুখ অভিহিত হইয়া থাকে, মুদ্, প্রমদ, হর্ষ ও আনন্দ প্রভৃতি শব্দই এই সুখের নামান্তর, (কেবল সুখই যে প্রীতি শব্দের অর্থ, তাহা নহে, কিন্তু) প্রিয়তাও এই শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়। ভাব, হার্দ্দ, সৌহৃদ প্রভৃতি শব্দ এই প্রিয়তার নামান্তর। সেই সুখ ও প্রিয়তার মধ্যে সুখ হইতেছে উল্লাস, ইহাও জ্ঞান-বিশেষ, আর প্রিয়তাও জ্ঞানবিশেষ, এই প্রিয়তা বা জ্ঞানবিশেষকেই বিষয়ানুকূল্য শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, (শুধু তাহাই নহে) বিষয়ানুকূল্য হইলে সেই বিষয়ের প্রতি যে স্পৃহা হয়, এবং সেই বিষয়ের অনুভব হইতে যে উল্লাস আবির্ভূত হয়, সেই দুইটিও প্রিয়তার স্বরূপ॥"

ইহাই হইল উক্ত উদ্ধৃত সংস্কৃতাংশের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য; ইহার ভিতরে যে দার্শনিক গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে, এক্ষণে তাহারই বিশদভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

সুখের চেষ্টা ও আশার চির অশান্তি

এ সংসারে সকল প্রাণীই চাহে সুখ, সুখের জন্য সকলেই সর্ব্বদা ব্যাকুল, সেই সুখ কি উপায়ে পাওয়া যায়, তাহাই জানিবার জন্য সকলে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে; সেই সাধন বুঝিয়া তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য সকলেই সামর্থ্যানুসারে চেষ্টা করিয়া থাকে; দেহাত্মবাদী নাস্তিক হইতে আরম্ভ করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মবাদী পর্য্যন্ত সকল দার্শনিকই এই সিদ্ধান্ত মানিয়া থাকেন এবং তদনুসারে চলিয়া থাকেন। ইহা কেহই অস্বীকার করেন না বা করিতে পারেন না। সুখের সাধন কিন্তু কি, তাহা লইয়াই যত গণ্ডগোল। ব্যক্তিগত রুচি, শিক্ষা, অভ্যাস ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতির বৈচিত্র্য-নিবন্ধন এই সুখ-সাধন প্রত্যেকের নিকট বিভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। তোমার নিকট যাহা সুখের সাধন, হয়ত তাহা আমার পক্ষে উদ্বেগের কারণ হইতে পারে; না হয় তাহাতে আমার বিতৃষ্ণার উদ্ভব হইয়া থাকে। এই সুখসাধন-নির্ণয়ে পরস্পর মতভেদ ও রুচির বৈচিত্র্যই স্বাভাবিক। ইহাকে উপেক্ষা করা চলে না, ইহাই

সংসারে সকল বৈষম্যের মূল, এই সুখ-সাধন আয়ত্ত করিবার জন্য জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীই সর্ব্বদা সচেষ্ট; ইহারই নাম জীবের জীবন-সংগ্রাম। এই সংগ্রামে জয়লাভের সম্ভাবনা না থাকিলেও ইহাতে জয়ী হইবার আশা কাহাকেও ছাড়িতে চাহে না। এই আশাই সকলের জীবন-সম্বল, ইহা কে না বুঝে? কিন্তু আশাই সকল প্রকার অশান্তির নিদান। পাপ করিয়া, বিপদে পড়িয়া, সর্ব্বনাশের পথে দাঁড়াইয়াও মানুষ এই আশার প্রেরণায় আরও পাপ করিতে প্রবৃত্ত হয়, সুখের—সম্পদের সমুন্নত শৈল-শিখরে চড়িয়াও আবার এই নিত্য নবীন আশার প্ররোচনায় অন্ধ মানব অকস্মাৎ লম্ফ দিয়া বিপদের অন্ধতম গভীর গর্ত্তে নিপতিত হয়। এই আশায় তৃষ্ণাই বাড়িয়া যায়। কিন্তু পিপাসা মিটে না, ইহা আসক্তিকে তীব্র করে, কিন্তু ইষ্ট বস্তুকে দুর্ল্লভ ও আশু বিনশ্বর করে। তাই অশান্তির মাত্রা প্রতিদিনই বাড়াইয়া দেয়।

জ্ঞানে, কর্ম্মে ও ভক্তিতে উপায়-সন্ধান

এই আশাময়, পিপাসাময় ও অশান্তিময় আশার কারগার হইতে নিষ্কৃতি লাভের পথ দেখাইতে যাইয়া দার্শনিক বলেন, ইহার মূল যে দেহাত্মাভিমান, তাহার উচ্ছেদ কর—আত্মার উপর কল্পিত অনর্থময় সংসারকে মিথ্যা ভাবিয়া উড়াইয়া দেও, শান্তি আসিবে, নির্ব্বাণ বা ব্রহ্মসংস্থালাভ অনায়াসেই হইবে। কর্ম্মী বলিয়া থাকেন, নিজ নিজ অধিকারানুরূপ বিহিত কর্ম্ম বিশ্বাসের সহিত করিতে থাক, সুখের নিরবধি সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইবে, সুখের অল্পতা ও দুর্ল্লভতা দূর হইবে, ভূমা বা নিরবচ্ছিন্ন সুখের সহিত শাশ্বত মিলন হইবে, তুমি শান্তি পাইবে, অমর হইবে। ভক্তি সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের মতে এই জ্ঞান ও কর্ম্মমার্গে মানবের আত্মা তৃপ্তিলাভে সমর্থ হয় না, হইতেও পারে না; কারণ, এই দ্বিবিধ মার্গেই মানবের নিজ স্বভাবে বা স্বরূপে অবস্থিতির সম্ভাবনা নাই, প্রীতি বা প্রেমই মানবাত্মার স্বভাব বা স্বরূপ, সেই প্রীতি একদিকে উল্লাস বা সুখ, অন্যদিকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর চিরপরিচিত হইলেও, প্রতিক্ষণে নূতন প্রিয়তমের অনাবিল অনুভূতি—এই দুই-এর মিলনের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রিয়তমের প্রতি আনুকূল্য বা স্বার্থগন্ধবিরহিত নিত্যবর্দ্ধনশীল সেবাভিলাষ এই অভিলাষময়, উল্লাসময় চিরসুন্দরের অনুভূতিই বৈষ্ণব দর্শনে প্রীতি বা প্রেম শব্দের মুখ্য প্রতিপাদ্য।

যুগপৎ ইচ্ছা, সুখ ও অনুভূতি

নৈয়ায়িক বা বৈশেষিক বলিবেন, এ কেমন কথা? ইচ্ছা, সুখ ও অনুভূতি আত্মার এই তিনটি বিশেষ গুণ পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন, প্রত্যক্ষসিদ্ধ এই আত্মবিষয়ে গুণত্রয় এক সময়ে হইতে পারে না, অগ্রে জ্ঞান হয়, তাহার পর ইচ্ছা হয়, তৎপরে ঈপ্সিত বস্তুর প্রাপ্তি নিবন্ধন সুখ উৎপন্ন হয়; ইহাই হইল স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম। পূর্ব্বোক্ত প্রকার অনুভব, ইচ্ছা ও সুখ এই তিনটি মিলিত হইয়া একাকারে প্রকাশ পাইলে তাহা প্রীতিপদ-প্রতিপাদ্য হয়। এই প্রকার শ্রীজীব গোস্বামীর প্রীতি-নির্ব্বচন সুতরাং প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না এবং ইহা নিতান্ত নির্যুক্তিক। সর্ব্বত্র ভেদদর্শনশীল নৈয়ায়িক বা বৈশেষিক দার্শনিকের এই আপত্তি শুনিয়া ভক্ত দার্শনিক বিচলিত না হইয়া, ইহাই বলিয়া থাকেন যে, এই সিদ্ধান্ত নৈয়ায়িক বা বৈশেষিক দার্শনিকের অভিমত না হইতে পারে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া যে ইহা প্রমাণসিদ্ধ নহে, তাহা কি করিয়া বলিব? ইষ্টবস্তুর আস্বাদনের সঙ্গে উল্লাস ও অভিলাষ মিলিত হইয়া থাকে—ইহা স্থির করিবার জন্য প্রবল দার্শনিকের শরণাপন্ন হইবার কোন আবশ্যকতা নাই। তোমার আমার প্রত্যেকের অবাধিত অনুভূতি প্রতিদিনই এই বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই দেখ না কেন, আমরা যখন কাশীর ভাল লেঙড়া বা লক্ষ্ণৌ-এর সফেদা আম্র খাইতে বসি, তখন সেই আম্রের সৌরভ, মধুর স্পর্শ ও ঈষদম্ল ও ঘন-মধুর রসের অনুভূতি বা আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে আরও আস্বাদনের ইচ্ছা ও উল্লাস বা সুখ আমাদের একই সময়ে হইয়া থাকে। সেই আস্বাদন সুখ ও অভিলাষ মিলিত হইয়াই যে আমাদের আত্মাতে প্রতিভাসমান হয়, তাহা ত আমরা বেশ বুঝিয়া থাকি। তুমি হয়ত শপথ করিয়া বলিবে এই আস্বাদন, অভিলাষ ও উল্লাস এক সময়ে হইতে পারে না বলিয়া, এক সময়ে হইতেছে—এইরূপ যে আমার প্রতীতি হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। তুমি বা আমি এই সকল মনোবৃত্তির ক্রমিকতা বা বিভিন্ন-ক্ষণিকতা বুঝিতে পারি না। কিন্তু যুক্তির সাহায্যে স্থির করিয়া লইতেই হইবে, ইহারা এক কালের বা এক ক্ষণের বস্তু নহে, ইহারা ক্রমিক। নৈয়ায়িকের শপথের উপরে যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি এ কথা বেদবাক্যের ন্যায় প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইতে পারেন বা মানিয়া লউন, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। সর্ব্বমানবের অবাধিত স্বারসিক অনুভূতিকে যাঁহারা প্রমাণ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা কিন্তু নিঃসঙ্কোচে এই প্রীতিরূপ বস্তুটির জ্ঞান, ইচ্ছা ও

সুখরূপতা অঙ্গীকার করিতে কখনই পশ্চাৎপদ হইবেন না বা হইবার উপযুক্ত কোন কারণও খুঁজিয়া পাইবেন না।

প্রীতি-হীন কর্ম্ম ও জ্ঞান ক্লেশ-সার

তাই বলি, রস বা প্রীতিতত্ত্বের বিচার করিতে যাইয়া এই শুষ্ক তর্কের কচকচি বা আড়ম্বর হইতে দূরে থাকাই একান্ত বিধেয়, সুতরাং এখন প্রকৃতেরই অনুসরণ করা যাউক। প্রকৃত কথাটি এই যে, এই রসময়ী প্রীতির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর কর্ম্ম ও জ্ঞান যদি প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে সেই কর্ম্ম ও জ্ঞান সিদ্ধিকামী মানবের পক্ষে অনর্থক বা ক্লেশকরই হইয়া থাকে—ইহাই হইল উপনিষদের বা তত্ত্বদর্শী আর্য্যঋষিগণের চরম কথা বা প্রাণের সিদ্ধান্ত। তাই শ্রুতি বলিতেছেন,—"প্লবা হ্যেতে অদৃঢা যজ্ঞরূপা ঃ"—দুঃখময় সংসার-সাগরে এই সকল বিহিত যজ্ঞরূপ ভেলা—দৃঢ় নহে অর্থাৎ আত্যন্তিক শান্তিলাভের উপায় নহে। শ্রীমদ্‌ভাগবতও উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছেন,—

শ্রেয়ঃ স্রুতিংভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশলএব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্‌॥"

শ্রেয়োলাভের একমাত্র পথ তোমার এই প্রীতিলক্ষণ ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া, হে প্রভো! যাহারা কেবল বোধলাভের জন্য ক্লেশ করিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে এই জ্ঞানযোগ কেবল ক্লেশেরই কারণ হইয়া থাকে। যেমন শস্যহীন তুষনিকরের অবঘাত করিলে তাহা নিষ্ফল ও ক্লেশকর হয়, তাহাদেরও তদ্রূপ ভক্তিহীন জ্ঞানযোগ নিরর্থক ও ক্লেশকরই হইয়া থাকে। প্রেমহীন জ্ঞানও কর্ম্ম আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভের উপায় নহে,—কিন্তু ভক্তিই উপায় হইয়া থাকে, তাহাই বুঝাইবার জন্য ভক্তিশাস্ত্রের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান প্রমাণস্বরূপ ভাগবত বলিতে আরম্ভ করিয়া নৈমিষারণ্যের পরমর্ষিসভায় মুক্তকণ্ঠে স্থত' ঘোষণা করিয়াছেন,—"স বৈপুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

যাহা হইতে প্রপঞ্চাতীত ভগবত্তত্ত্বে ভক্তির উদয় হয়, তাহাই মানব সমূহের পরধর্ম্ম। সে ভক্তি কেমন? যাহাতে ভোগলিপ্সা বা মুক্তিকামনার লেশমাত্র নাই, বিসদৃশ অবস্থানিচয়ের ঘাতপ্রতিঘাতে যাহা কখনও প্রতিহত হয় না—সেই প্রীতিলক্ষণ ভগবদ্‌ভক্তিযোগই প্রকৃত ভক্তিযোগ—তাহার উদয়ে আত্মা সুখময় প্রসাদলক্ষণ পরমশান্তিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রীজীব গোস্বামীর মতে প্রীতি বা প্রেমভক্তি—অভিলাষময় উল্লাসময় অনুভূতি-বিশেষ, ইহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। সেই অভিলাষ কিসের? তাহা চিরসুন্দরের—চিরবাঞ্ছিতের সেবার অভিলাষ ছাড়া আর কিছুই নহে। আমার অকপট সেবার দ্বারা তাঁহাকে সুখী করিব, তাঁহার সুখের জন্য আমার যাহা কিছু আছে, সব বিসর্জ্জন করিব, এই প্রকার অভিলাষই হইল প্রীতির বা প্রেমভক্তির প্রধান উপাদান। তিনি অসীম শক্তিশালী, তিনি আত্মারাম অথচ লাবণ্যের সার ও মাধুর্য্যের পার। তাঁহাকে যে একবার দেখিয়াছে, একবার তাঁহার শ্রীমুখের আশ্বাসময়ী অভয়বাণী শুনিয়াছে, সে এ সংসারের সকল বস্তুর প্রতি অনাশ্বাসপর হইয়াছে। তখনই সে বুঝিতে পারে—

"যে তু সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥"

হে কুন্তীনন্দন। ইন্দ্রিয় সকলে ভোগ্য বিষয়সমূহের সহিত সম্বন্ধ হইতে যে সুখানুভব হয়, তাহাতে বিবেকী পুরুষের প্রীতি হয় না, কারণ, তাহার আদি ও অন্তে দুঃখভোগ অপরিহার্য্য এবং তাহা বিনাশশীল।

কর্ম্ম মার্গে অনাস্থা

সংসারের প্রত্যেক জীবই চাহে, আমার দুঃখ না হউক এবং আমি সুখী হই। জীবের এই অনাদিসিদ্ধ অভিলাষ পূর্ণ করিবার তিনটি উপায় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে;—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। কর্ম্ম দুই প্রকার;—এক বিহিত আর এক প্রতিষিদ্ধ। যে কর্ম্ম করিলে লোক ভবিষ্যতে ভয়ঙ্কর দুঃখভোগ করিয়া থাকে, অথচ আপাততঃ যাহা ইষ্টলাভের সাধন বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাকেই প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম বলা যায়, আর যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ভবিষ্যতে সুখলাভ হয় অথচ অনুষ্ঠানকালে অপরিহার্য্য যে দুঃখ, তাহা হইতে অধিক দুঃখের সম্ভাবনা না থাকে, সেই প্রকার কর্ম্মকেই বিহিত কর্ম্ম বলা যায়। অতি প্রাচীনকাল হইতে বৌদ্ধযুগের আরম্ভকাল পর্য্যন্ত এই কর্ম্মই ভারতে প্রধান সাধনরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল, নানাপ্রকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার অপরিহার্য্য পরিবর্ত্তনে বৌদ্ধযুগের আরম্ভকাল হইতে শাস্ত্রবিহিত যাগাদিরূপ ধর্ম্মের প্রতি ক্রমে লোকসমূহের অনাস্থা জন্মিতে লাগিল। যাগ, দান ও হোমরূপ বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান বহুবিত্তব্যয় ও আয়াসসাধ্য

এবং উহা দ্বারা দৃষ্ট কোন প্রকার লোকরুচিকর ফল হয় না এবং উহার ফলে ঋত্বিক্ বা পুরোহিত সম্প্রদায়ই প্রচুর পরিমাণে লাভবান্ হইয়া থাকেন অথচ তাঁহাদের মধ্যে ত্যাগ, তপস্যা ও সংযম প্রভৃতির ক্রমশঃ হ্রাস নিবন্ধন তাঁহাদের অনায়াসলব্ধ প্রভূত সম্পত্তির দ্বারা জনসাধারণের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন উপকার সাধিত হইতেছে না—ইহা দেখিয়া দেশের চিন্তাশীল মনীষিবর্গ এই শুষ্ক কর্ম্মবাদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে লাগিলেন। অপর দিকে বেদপ্রামাণ্যে অনাস্থাসম্পন্ন, স্বাধীনচিন্তাশীল দার্শনিকগণ পরলোকের সুখসাধনার্থে কর্ম্মানুষ্ঠান একান্ত নিরর্থক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য নানা লোকপ্রিয় যুক্তিজালের অবতারণা করিতে লাগিলেন। ফলে সাধারণ জনসমূহের মতিগতি উত্তরোত্তর বিহিত যাগাদি অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধ হইয়া পড়িল। এইরূপ অবস্থাতেই ভারতে বৈরাগ্যপ্রধান বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন জনসাধারণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রবল হইতে আরম্ভ করিল।

আচার্য্য শঙ্করের ব্রহ্মবাদ

প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল, পরিণামে বিনাশগ্রস্ত স্থূলদেহের উপর আত্মত্ববুদ্ধি ও তন্মূলক রাগ ও দ্বেষ প্রভৃতি অন্তঃশত্রুগণই মানবের এই সংসারে সকল প্রকার দুঃখের মূলকারণ, সুতরাং ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় কি? তাহারই অনুসন্ধান চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই জীবনের প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইল, তাহারই ফলে ধ্যান-ধারণা-সমাধির প্রভাব বাড়িতে লাগিল, ভারতে অধ্যাত্মবিদ্যার সাম্রাজ্য নানাদিকে নানাসম্প্রদায়ের আচার্যগণ কর্ত্তৃক উদ্ঘোষিত হইল। এই সকল আচার্য্যগণের মধ্যে পরস্পর মতের অনৈক্যনিবন্ধন বিরোধও প্রবলবেগে চলিতে লাগিল। এই প্রকার বিরোধের ফলে দেশের সর্ব্বত্রই অশান্তি দেখা দিল। যাহার যাহা ভাল লাগিল, সে সেই মত অবলম্বন করিয়া নানা প্রকার বৈধ বা অবৈধ উপায়ে আত্মসম্প্রদায়ের পুষ্টি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নির্যাতনে প্রবৃত্ত হইল। শান্তির জন্য প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানসাম্রাজ্য নানাপ্রকার অশান্তির কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। এই সকল বিরুদ্ধ মতবাদের প্রবল ঝটিকার প্রভাবে ভারতের অধ্যাত্মবিজ্ঞান যখন ঐকান্তিকভাবে বিক্ষুব্ধ ও উদ্বেলিত হইতেছিল, সেই সময় ভগবৎপাদ আচার্য্য শঙ্কর উদিত হইলেন, প্রাপঞ্চিক সুখের অসারতা, অস্থিরতা ও মায়িক-তার সমর্থক বৌদ্ধ দার্শনিকগণের উদ্ভাসিত যুক্তিসমূহ তিনি উপেক্ষা করিলেন।

না; কিন্তু তাহাদিগের ঐকান্তিক ধ্বংসবাদ বা সর্ব্বশূন্যতাবাদ ভারতীয় সভ্যতার মূলভিত্তি হইতে পারে না, ইহা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও প্রবল যুক্তিনিচয়ের দ্বারা প্রতিপাদন করিয়া তিনি পারমার্থিক প্রমাণের সাহায্যে চিদানন্দস্বরূপ শাশ্বত ব্রহ্মই সকল প্রপঞ্চের মূল, তাহারই উপর সূত্রে মণিগণের ন্যায় নিখিল ব্যবহার মায়াবশে কল্পিত, সেই মায়া বা অজ্ঞান অধ্যাত্মবিজ্ঞানের প্রভাবে বিদূরিত করিতে পারিলে জীবের সকল দুঃখ নিবৃত্ত হয়, সেই অধ্যাত্মবিজ্ঞানই ভারতীয় সভ্যতার মূলভিত্তি, এই বিশ্ববিস্ময়কর শ্রৌতসিদ্ধান্ত সমগ্র ভারতের বিদ্বন্মণ্ডলীকে সরলভাবে সুযুক্তির সাহায্যে ভাল করিয়া বুঝাইয়া আবার শান্তির সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

ভক্তিবাদের অভ্যুদয়

আচার্য্য শঙ্করের এই অদ্বৈতজ্ঞানমার্গ কিন্তু অধিককাল ব্যাপিয়া ভারতের চিন্তাশীল মনীষিগণের উপর অপ্রতিহতভাবে প্রভাববিস্তারে সমর্থ হয় নাই। আচার্য্য রামানুজ সর্ব্বপ্রথমে আচার্য্য শঙ্করের এই অদ্বৈতব্রহ্মবাদের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা সগুণ ব্রহ্মবাদ তৎপ্রণীত শারীরক ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের দ্বারা প্রচারিত হইয়া ভক্তিবাদের প্রাধান্য ও রুচিরত্বকে মনীষিবৃন্দের ভাবপ্রবণহৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া তুলিল, এই ভক্তিবাদের প্রাধান্য ও মাধুর্য্য মধ্বাচার্য্য, নিম্বার্ক ও বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যকুলগৌরব ভক্ত সাধকবৃন্দের রচিত নানাবিধ যুক্তিমণ্ডিত ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্যে ক্রমেই জনসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল।

দুঃখনাশের জন্য অহংলোপ—আত্মঘাত

আচার্য্য শঙ্কর উপনিষদের সাহায্যে জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির সাধন বলিয়া যে অদ্বৈতাত্মবিজ্ঞান ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা এই সকল ভক্তিবাদী আচার্য্যগণের মতে কি কারণে অঙ্গীকৃত হয় নাই বা হইতে পারে না, তাহাও বলি। তাঁহারা বলেন যে, অদ্বৈতাত্মজ্ঞান হইলে ব্রহ্মব্যতিরিক্ত সকল বস্তুই মিথ্যা হইয়া পড়ে, এই সকল বস্তুর মধ্যে জীব বা অহংপদার্থও প্রবিষ্ট, কারণ, জীব বা অহং অদ্বৈতবাদীর মতে অজ্ঞানকল্পিত, জ্ঞান হইলে যখন অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তখন তাহার যাহা কিছু কার্য্য, তাহা সকলই বিনষ্ট হইয়া থাকে, ইহাই ত হইল অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত কিন্তু তোমার বা আমার

কাহারও অভিপ্রেত হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে মোক্ষ বা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি কাহার হইবে, তাহাই ঠিক হয় না। যে দুঃখভোগ করিতেছে, যে বদ্ধ, সেই দুঃখনিবৃত্তি বা বন্ধননিবৃত্তি চাহিয়া থাকে, জীব দুঃখভোগ করে বা সংসারে আবদ্ধ হয়, সেই জীব নিজেই যদি না থাকে, তাহা হইলে তাহার বন্ধনিবৃত্তি বা মোক্ষ ইষ্ট হইবে কেন? দুঃখ সহিতে পারি না, সুতরাং আমি দুঃখনিবৃত্তির উপায় করিব, এই প্রকার চেষ্টা সকলেই করিয়া থাকে; কিন্তু দুঃখনিবৃত্তির জন্য, আত্মবিনাশের জন্য প্রবৃত্তি কোন বিবেকীরই হইতে পারে না। যাহার সেইরূপ প্রবৃত্তি হয়, অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহাকে উন্মত্ত বা অপ্রকৃতিস্থ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

অহং থাকিতেও দুঃখনাশ শাস্ত্রসিদ্ধ

তুমি হয় ত বলিবে, আমি যত কাল থাকিব, আমার দুঃখও তত কাল থাকিবে। আমার আমিত্বের বিনাশ ব্যতিরেকে আমার দুঃখবিনাশের সম্ভাবনা নাই। ইহা যদি দৃঢ়তর প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়, তখন যে দুঃখ সহিতে পারে না, তাহার পক্ষে আত্মবিনাশ ছাড়া আর কি গত্যন্তর হইবে? সংসারে প্রবেশ করিয়া অবধি আমি যখন দুঃখই ভোগ করিয়া আসিতেছি, ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলাম যে, আমি থাকিতে আমার দুঃখের নিষ্কৃতি একেবারে অসম্ভব, তখন এই দুঃখের চির-সহচর আমার আমিত্ব থাকিয়া লাভ কি? যত শীঘ্র ইহার বিসর্জ্জন সম্ভবপর, ততই মঙ্গলেব বিষয়। মোক্ষবাদী বৈদান্তিকের এইরূপ যুক্তিও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, আমি থাকিতে আমার দুঃখ একেবারে মিটিতে পারে না—এই সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদী কোথা হইতে পাইলেন? অগ্রে দুঃখভোগের কারণ কি কি, তাহা নির্ণয় করা উচিত। তাহার পর আমার অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াও সেই সকল কারণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব কি না, তাহা নির্ণয় করিয়া—দুঃখনিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য।

দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি জড় বিষয়ের সহিত আত্মাকে অভিন্ন বলিয়া ভাবনা বা দেহাত্মাধ্যাসই যে আমাদের সকল প্রকার দুঃখ ও অশান্তির নিদান, ইহা চার্ব্বাকব্যতিরিক্ত সকল ভারতীয় দার্শনিকেরই সিদ্ধান্ত। ভক্তিবাদী দার্শনিকগণও এই সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি হইতে পৃথক্ বলিয়া যাহার বিশ্বাস নাই, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ শাস্ত্রবিহিত কোন মার্গেই তাহার অধিকার নাই।

"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।"

যে অজ্ঞ, যাহার দেহাদি ভিন্ন আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস নাই, আর যে সকল বিষয়েই সন্দিহান, তাহার বিনাশ হইয়া থাকে।

এই গীতোক্ত ভগবদ্‌বাক্যে ইহাই স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিতেছে।

মোক্ষদশায় জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব

জীবাত্মার অস্তিত্বই যে সকল দুঃখের নিদান, এই অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত কিন্তু ভক্তিসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, এই প্রকার সিদ্ধান্ত শ্রুতিসম্মত নহে, প্রত্যুত ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ, কারণ,—

"পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা জুষ্টস্তদা তেনামৃতত্বমেতি।"

আত্মাকে পৃথক্ বলিয়া এবং আত্মার প্রেরয়িতাকে পৃথক্ বলিয়া বুঝিলে পরে তাহার সহিত মিলিত হইলে জীব মোক্ষলাভে সমর্থ হইয়া থাকে।

এই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্-বাক্য পরমাত্মা ও জীবের পার্থক্য এবং মোক্ষদশায় জীবের সহিত পরমাত্মার মিলন হইয়া থাকে, ইহা স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিতেছে।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরেকঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥"

আত্মরূপ দুইটি পক্ষী মিলিত হইয়া দুইটি সখার ন্যায় এই দেহরূপ বৃক্ষের মধ্যে বাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যে একটি পক্ষী (জীব) ঐ বৃক্ষের নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখ ও দুঃখরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে, আর একটি পক্ষী (পরমাত্মা) কিন্তু কোন ফলের আস্বাদন করে না, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করিয়া থাকে।

এই শ্রুতিবাক্যটিও জীবাত্মা ও পরমাত্মার পৃথকৃত্ব স্পষ্টভাবে বুঝাইতেছে।

নির্বিশেষ জ্ঞান অসম্ভব

উল্লিখিত প্রমাণ ও সর্ব্বসাধারণ অনুভবের সাহায্যে অহংপদার্থ বা জীবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব এবং তাহার অবিনাশিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। সেই জীবাত্মার যাবতীয় দুঃখসম্বন্ধের মুখ্য হেতু হইতেছে, দেহ প্রভৃতি জড় ও বিনাশী বস্তু সমূহে আত্মাধ্যাস বা আত্মীয়ত্বারোপ। এই অধ্যাস বা আরোপ যদি সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে দুঃখভোগের কারণ না থাকায়, তাহাও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, এই দেহাত্মাধ্যাস কোন্ উপায়ের দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে? অদ্বৈতবাদিগণ স্থির করিয়াছেন, নির্গুণ নিরাকার

নির্ব্বিকার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারই এই অধ্যাসনিবৃত্তির একমাত্র উপায়। ভক্তিবাদী আচার্য্যগণ বলেন,—এইরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার কেবল কথার কথা। ইহা কখনও যে কাহারও হইয়াছে বা হইবে, তাহা সম্ভবপর নহে, কারণ, আমাদের মনোবৃত্তিরূপ জ্ঞানের স্বভাবই এই যে, তাহা সবিশেষ বস্তুকেই প্রকাশ করিয়া থাকে, যাহাতে কোন ধর্ম্ম নাই, যাহা একেবারে নির্ব্বিশেষ বা নিরাকার, তাহা কখনও কোন প্রকার জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, সুতরাং তোমাদের নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কি করিয়া জ্ঞানের বিষয় হইবে? তাহাই যদি না হইল, তাহা হইলে নির্গুণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা জীবের দেহাত্মাধ্যাস নিবৃত্ত হইলে মোক্ষলাভ হইবে, এই প্রকার কল্পনা প্রমাণবিরুদ্ধ ও নির্য্যুক্তিক।

ভক্তিবাদে আত্মাধ্যাস-নিবৃত্তি

তবে এই অধ্যাস মিটিবে কিসে? ইহার মীমাংসা করিতে হইলে ভক্তিবাদের আশ্রয়গ্রহণ ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। ভক্তিবাদী এই প্রশ্নের উত্তর যে ভাবে দিয়া থাকেন, এক্ষণে তাহারই অবতারণা করা যাইতেছে।

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদ্ ঈশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেচ্চ তম্ ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥"

শ্রীমদ্‌ভাগবতের এই শ্লোকটির দ্বারা ভক্তিবাদের মূল সিদ্ধান্ত অতি সুন্দরভাবে সূচিত হইয়াছে। এই শ্লোকটির তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ;—

"ঈশ্বরপরাঙ্মুখ ব্যক্তিরই ঈশ্বরব্যতিরিক্ত অন্য বস্তুতে আত্মত্ব বা আত্মীয়ত্বের অভিনিবেশ হইয়া থাকে। এই অভিনিবেশের পরিণতি হইতেছে, সৎ, সুন্দর ও মধুর বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া অসৎ, অসুন্দর ও অমধুর বস্তুকে সুন্দর, মধুর ও সৎ বলিয়া বুঝা বা ভ্রান্তি ও আত্মস্বরূপ-বিস্মৃতি। ভ্রান্তি ও আত্মবিস্মৃতির ফল নানাপ্রকার ভীতি, এই সকল অনর্থ-পরম্পরার হেতু সেই পরমেশ্বরের মায়া বা বহিরঙ্গা শক্তি। এই কারণে বিচক্ষণ ব্যক্তির একমাত্র কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করা বা ভক্তিযোগের শরণ লওয়া। সেই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইলে অগ্রে গুরুকেই দেবতা ভাবিয়া শরণ লইতে হইবে।"

শ্রীমদ্‌ভাগবতের এই শ্লোকটির একটু বিশেষ ব্যাখ্যা না করিলে মানব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ভক্তির মূল তত্ত্ব প্রকৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে না। এই কারণে ভক্তিসম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অগ্রে তাহাই করা যাইতেছে।

অধ্যাসের মূলে রসাস্বাদনী বৃত্তি

মানুষ যে দেহ, ইন্দ্রিয় ও ভোগ্য বিষয়নিচয়ের উপর আত্মত্ব বা আত্মীয়ত্ব-ভাবকে আরোপ করে, তাহার কারণ কি, এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মানবের প্রকৃতিসিদ্ধ রসাস্বাদনী বৃত্তিই ইহার মূল কারণ। যে ক্ষণ হইতে মানবের সংসারে প্রবেশ, সেইক্ষণ হইতেই সে এই রসাস্বাদনী বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ আজন্মসিদ্ধ প্রকৃতি হইতেছে সুখভোগের লালসা। সেই সুখের সাধন বলিয়া সে যাহা অনুভব করে, তাহাই তাহার নিকট সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়, যাহা সুন্দর, তাহার প্রতিই তাহার আসক্তি হইয়া থাকে, সুখের আস্বাদন বা অনুভূতির জন্য সে সর্ব্বদা উৎসুকতা তাহার কিছুতেই মিটে না। সে যত বেশী সুখের আস্বাদন করিতে পায়, আরও বেশী সুখ আস্বাদন করিবার জন্য তাহার উৎসুকতা বা আকাঙ্ক্ষা সেই পরিমাণে বাড়িতে থাকে--ইহাই হইল তাহার অপরিবর্ত্তনশীল স্বভাব, এই সুখাস্বাদনের প্রতিবন্ধক বা আবরণ তাহার অসহ্য, এবং তাহাই তাহার নিকট দুঃখরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। এই দুঃখরূপ আবরণের হেতু বলিয়া সে যাহা বুঝে, প্রাণপণে তাহাকে হটাইবার জন্য সে বিশেষভাবে প্রযত্ন করিয়া থাকে, সুতরাং দুঃখ নিরাকরণ করিবার জন্য তাহার যে প্রবৃত্তি, তাহারও মূলে তাহার রসাস্বাদনী বৃত্তি-সুখভোগের জন্য লালসা ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে সর্ব্বদাই বিদ্যমান রহিয়াছে। এই লালসাই ভক্তিশাস্ত্রে কাম নামে প্রসিদ্ধ, এই কামের মূল কিন্তু সেই প্রীতি, যে প্রীতির পরিচয় দিতে যাইয়া শ্রীজীব গোস্বামী "আকাঙ্ক্ষাময় উল্লাসময় প্রকাশবিশেষ" এই প্রকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রীতিই হইল জীবের স্বভাব। ইহাই মলিন হইয়া কামরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই জীবের স্বতঃসিদ্ধ প্রকৃতিস্বরূপ যে প্রীতি, তাহা কিরূপে মলিন হইয়া কামরূপে পরিণত হয় এবং সকল প্রকার দুঃখের কারণ হইয়া উঠে, তাহার নির্ণয় এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঈশবিমুখ আসক্তি কাম

জীবের ঈশবিমুখতাই দ্বিতীয়াভিনিবেশের হেতু। এখানে অভিনিবেশ শব্দের অর্থ আসক্তি বা কাম। সকল সুখের সারভূত, সকল সৌন্দর্য্যের একমাত্র আধার—চিন্ময়রসস্বরূপ পরমেশ্বরের মধুরমূর্ত্তিকে উপেক্ষা করিয়াছে বলিয়াই জীব এই মায়ার রাজ্যে প্রবিষ্ট হয়, এবং মায়ারচিত দেহ, ইন্দ্রিয় ও শব্দস্পর্শ প্রভৃতি

সুখময় আত্মার ছায়াসমন্বিত ভোগ্যবস্তুনিবহের উপর আসক্ত হইয়া পড়ে। আসক্তির বা কামের পরিণাম ভয়, কারণ, আসক্তির বিষয় প্রাপঞ্চিক বস্তুমাত্রই বিনাশশীল। যাহার প্রতি আসক্তি আছে, তাহা থাকিবে না, এই জ্ঞান হইতেই ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাই হইল প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়ম। ভয় হইতে বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন হয় অর্থাৎ মূঢ়তা বা মোহ আসিয়া পড়ে। মোহের পরিণাম পূর্ব্বস্মৃতিভ্রংশ বা বুদ্ধিনাশ। এই ভাবে জীবের পরমেশ-বৈমুখ্য সকল প্রকার অনর্থপ্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এই জীবের ঈশবিমুখতা, ইহা আইসে কোথা হইতে? ইহারই উত্তর হইতেছে, 'তন্মায়য়া', এই সকলের কারণ হইতেছে জগদীশ্বরের 'মায়া'।

অচিন্ত্য শক্তি হইতে মায়া

এই মায়া, জীব ও ঈশ্বরতত্ত্ব এবং এই ত্রিবিধ তত্ত্বের পরস্পর সম্বন্ধই বা কিরূপ, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে শেষোক্ত উত্তরের প্রকৃত মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারা যাইবে না। এই জন্য ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে এই বিষয়ের যাহা শেষ মীমাংসা, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। শ্রীজীব গোস্বামী তদীয় ভাগবতসন্দর্ভ নামক গ্রন্থে ভগবত্তত্ত্বনির্ণয় প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"একমেব তৎপরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্বৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধা অবতিষ্ঠতে সূর্য্যান্তর্মণ্ডলস্থতেজ ইব মণ্ডল-তদ্বহির্গতরশ্মিতৎ-প্রতিচ্ছবিরূপেণ।" অর্থাৎ সেই অদ্বিতীয় পরমতত্ত্ব স্বীয় স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে সর্ব্বদাই স্বরূপ, স্বরূপবৈভব, জীব ও প্রধানরূপে অবস্থিত। সূর্য্যমণ্ডলের অন্তর্গত তেজঃ যেমন স্বরূপমণ্ডল-বহির্গতরশ্মি এবং প্রতিফলিতরশ্মি-রূপে অবস্থিত, সেইরূপ বুঝিতে হইবে।

এ স্থলে শঙ্কা হইতে পারে যে—শাস্ত্র যখন সেই পরমতত্ত্বকে বিভু অর্থাৎ দেশ কাল প্রভৃতির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সুতরাং সর্ব্বব্যাপক বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া থাকে, তখন সেই পরমতত্ত্বের বহির্দ্দেশ কি করিয়া সম্ভবপর হইবে এবং তন্মূলক এই চারি প্রকারের বিভাগই বা কিরূপে উৎপন্ন হইবে? এই প্রশ্নের সমাধানার্থ শ্রীজীব গোস্বামী বলিতেছেন—

"অত্র ব্যাপকত্বাদিনা তত্তৎসমাবেশাদ্যনুপপত্তিশ্চ শক্তেরচিন্ত্যত্বেনৈব পরাহতা। দুর্ঘটঘটকত্বং হি শক্তেরচিন্ত্যত্বম্।"

এই পরতত্ত্বের এই প্রকার বিভাগবিষয়ে, তিনি ব্যাপক, তিনি অদ্বিতীয়,

তিনি নির্ব্বিশেষ এই কারণে যে অনুপপত্তি আশঙ্কিত হইতে পারে, তাহার পরিহার এই যে, তাঁহার শক্তি যেহেতু অচিন্ত্য, এই কারণে তাঁহাতে কোন প্রকার অনুপপত্তিই সম্ভবপর নহে। যাহা দ্বারা দুর্ঘটঘটনাই হইয়া থাকে, তাহাকেই অচিন্ত্য শক্তি বলা যায়।

পরতত্ত্বে শ্রৌতপ্রমাণ

ভক্তিসম্প্রদায়ের পরমাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীর ঈশ্বরতত্ত্বগত এই অচিন্ত্য শক্তির কথা শুনিয়া ব্যবহারিক প্রমাণমাত্রসম্বল দার্শনিকগণ হাসিয়া উঠিতে পারেন; কিন্তু পারমার্থিক প্রমাণবাদী ভক্তসম্প্রদায়ের তাহাতে লজ্জিত বা অবসন্ন হইবার কোন হেতু নাই।

ঈশ্বরতত্ত্বের স্বরূপনির্দ্ধারণে পারমার্থিক প্রমাণ শ্রুতি ও তন্মূলক পুরাণেতিহাস, স্মৃতি প্রভৃতিই যে একমাত্র অবলম্বনীয়, তাহা কি অদ্বৈতবাদী অথবা দ্বৈতবাদী সকল আস্তিক দার্শনিকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, এ স্থলে সুতরাং তাহার বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক। তাহা হইলে জ্ঞানবাদী আস্তিক দার্শনিকগণের সহিত ভক্তিবাদী আস্তিক দার্শনিকগণের এই বিষয়ে যে মতভেদ লক্ষিত হয়, তাহার সমাধান ব্যতিরেকে শ্রুতিপ্রদর্শিত পথকে অবলম্বন করিয়াও ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ে সন্দেহ সম্পূর্ণভাবে অপনোদিত হয় না। এই কারণে এক্ষণে এই মতভেদ নিরাকরণের অনুকূল মীমাংসা গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ কি ভাবে করিয়াছেন, তাহার একটু বিশদভাবে আলোচনা একান্ত আবশ্যক বোধ করি; সুতরাং এক্ষণে তাহাই করা যাইতেছে।

(১০)

ন্যায়মতে ঈশ্বরকার্য্য

আস্তিক দার্শনিকগণের মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে যে সকল মতভেদ লক্ষিত হয়, তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক। ভেদবাদী নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকের মতে ঈশ্বর নিরাকার, তিনি আকাশের ন্যায় বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক। ইঁহাদিগের মতে পরিমাণ-বিষয়ে জীব ও ঈশ্বরে কোন বৈলক্ষণ্য নাই, অর্থাৎ জীবও আকাশের ন্যায় ব্যাপক, ঈশ্বরও আকাশের ন্যায় ব্যাপক। অনন্ত জীব সকলেই বিভু, অথচ তাহাদের মধ্যে যেমন পরস্পর ঘেঁষাঘেঁষি হয় না, কেহ

কাহারও আধারও নহে, আধেয়ও নহে, সেইরূপ ঈশ্বরের সঙ্গেও কোন জীবের সংযোগ বা আধার-আধেয়ভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। জীবের বিশেষ গুণ অনেকগুলি আছে, যেমন জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সংস্কার, সুখ ও দুঃখ। ঈশ্বরের কিন্তু এতগুলি গুণ নাই, তাঁহার গুণ মাত্র তিনটি, যথা—জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন। তাঁহার সুখ বা দুঃখ নাই, তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, কিন্তু জগতের উপাদান পরমাণু সৃষ্টি করিবার তাঁহার শক্তি নাই। পরমাণু সকল নিত্য, সুতরাং তাহাদের উৎপত্তি বা ধ্বংস নাই। কুম্ভকার যেমন মাটী হইতে ঘট নির্ম্মাণ করে, কিন্তু মাটী প্রস্তুত করিবার তাহার শক্তি নাই, তেমনই ভগবান্ পরমাণু হইতে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন, কিন্তু পরমাণু সৃষ্টি করিবার তাঁহার শক্তি নাই। ইঁহাদিগের মতে আকাশও ভগবানের ন্যায় নিত্য, সুতরাং আকাশ সৃষ্টি করিবারও তাঁহার শক্তি নাই। তাঁহার কাজ হইল ভাঙ্গা আর গড়া, অর্থাৎ মূল উপাদান স্বরূপ যে সব পরমাণু, সেইগুলিকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া এই বিচিত্র আকারের বিশ্ব তিনি নিম্মাণ করিয়া থাকেন, এবং যত দিন পরমাণুনিচয় এইরূপ পরস্পর সংযুক্তভাবে থাকে, ততদিন তিনি ইহার প্রতিপালন করিয়া থাকেন এবং প্রলয়কালে তাঁহারই ইচ্ছানুসারে ঐ পরমাণুনিচয় পরস্পর বিযুক্ত হইয়া পড়ে। ইহাই হইল তাঁহার সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য্য। কেন এইরূপ কার্য্য তিনি করিয়া থাকেন, তাহার উত্তরে তার্কিকগণ বলেন যে, সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকার্য্যে পরমেশ্বরের নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও জীবনিচয়ের অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত অদৃষ্টের খাতিরে পড়িয়া বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহাররূপ কার্য্য অনবরতই করিতে হইতেছে।

বিভু জীবে ঈশ্বরের কিরূপ অন্তর্যামিতা

এই প্রকার ঈশ্বর-স্বরূপ শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি সম্মত, ইহা নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করিলেও, বাস্তবিক পক্ষে ভক্তি-সিদ্ধান্তের সহিত এই প্রকার ঈশ্বর-স্বরূপের কোনরূপ সামঞ্জস্য সম্ভবপর নহে বলিয়া, ভক্ত সম্প্রদায় ঈশ্বরস্বরূপ যে এই প্রকার, ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে, এই প্রকার ঈশ্বরতত্ত্ব কখনও শ্রুতি-সম্মত হইতে পারে না। কারণ ঈশ্বরতত্ত্ব-নিরূপণে প্রবৃত্ত শ্রুতি স্পষ্ট ভাবেই নির্দ্দেশ করিতেছেন—"স এষ আত্মা অন্তর্যামী" অর্থাৎ এই সেই আত্মা সকলের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া সকলকেই নিয়মিত করেন। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, ন্যায়-মতে ঈশ্বর ও জীব দুইই বিভু,

তাহাদিগের পরস্পর সংযোগ সম্ভবপর নহে, এরূপ অবস্থায় জীবের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ঈশ্বর কি করিয়া জীবসমূহকে নিয়মিত করিতে পারেন ? সুতরাং এই শ্রুতির সহিত ন্যায়-মতের বিরোধ স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে।

বিভুদ্বয়ে পরস্পর সংযোগ

আরও শ্রুতি বলিতেছেন, "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দীভবতি ॥"

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥"

অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর রস-স্বরূপ। সেই রসকে লাভ করিয়াই এই জীব সুখী হইয়া থাকে। পর্ব্বতশৃঙ্গস্থিত তুষাররাশি হইতে বিগলিত, ভিন্ন ভিন্ন পথে ভিন্ন ভিন্ন আকারে ধাবমান নদীসমূহ যখন সমুদ্রে যাইয়া পড়ে, তখন তাহাদিগের পৃথক্ নাম বা পৃথক্ রূপ কিছুই থাকে না, তাহারা সমুদ্রই হইয়া যায়, সেইরূপ পরমেশ্বরতত্ত্বের জ্ঞাতা পুরুষ, নামরূপ পরিহার করিয়া, সেই পরাৎপর পুরুষ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই শ্রুতির সহিতও তার্কিক মতের সামঞ্জস্য হয় না। কারণ, শ্রুতি স্পষ্টই বলিতেছেন যে, জীব মোক্ষদশায় নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া সেই পরাৎপর পুরুষ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিভু বলিয়া জীব ও পরমেশ্বরের পরস্পর-সংযোগ অসম্ভব, এরূপ অবস্থায় মোক্ষদশায় জীব পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবে কিরূপে ?

আর একটি শ্রুতি বলিতেছেন—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।" অর্থাৎ যে ব্রহ্মবিদ্, সে পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরস্পর বিভুর মধ্যে একজন আর একজনকে প্রাপ্ত হইবে কি প্রকারে ? সুতরাং এই শ্রুতির সহিতও ন্যায়মতের স্পষ্টই বিরোধ হইতেছে।

নিত্য আকাশের সৃষ্টি

আর এক স্থানে শ্রুতি বলিতেছেন—

"তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ।"

অর্থাৎ সেই এই পরমেশ্বর হইতেই আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। এই শ্রুতিতেও স্পষ্টই উক্ত হইতেছে যে, পরমেশ্বর হইতেই আকাশ উৎপন্ন হইয়াছিল। তার্কিকগণ কিন্তু আকাশকেও পরমেশ্বরের ন্যায় নিত্য বলিয়া থাকেন; সেই নিত্য আকাশ পরমেশ্বর হইতেই উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা কিরূপে সম্ভবপর ?

ঈশ্বর স্বরূপে আকার ও অবয়ব

আর একটি শ্রুতিতে দেখা যায়—"য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরন্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুহিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিতঃ; উদিতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ।" অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডলের মধ্যে এই যে পুরুষ দেখা যায়, যাঁহার শ্মশ্রুরাজি হিরণ্ময়, যাঁহার কেশ হিরণ্ময়, যাহার নখ হইতে সকল অঙ্গই কপির বা বানরের পুচ্ছমূলের অধোভাগের ন্যায় গলিত সুবর্ণ-সম সমুজ্জ্বল রক্তবর্ণ, তাঁহার নাম হইতেছে উৎ, কারণ, তিনি সকল প্রকার পাপ হইতে উদিত বা নিষ্ক্রান্ত, যে ব্যক্তি সুবর্ণ-জ্যোতির্ম্ময় এই পরমপুরুষকে জানে, সেও সকল প্রকার পাপ হইতে উদিত বা নিষ্ক্রান্ত হয়। এই উপনিষদে পরমপুরুষের যে স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিরবয়বও নহে, নিরাকারও নহে। তাহার নখ হইতে কেশ পর্য্যন্ত পুরুষোচিত সকল প্রকার অঙ্গই বিদ্যমান আছে, সুবর্ণের ন্যায় তাঁহার অঙ্গের প্রভা। ন্যায় ও বৈশেষিকের মতে ঈশ্বরের স্বরূপ কিন্তু এরূপ নহে।

যুগপৎ অণু ও বিভু

আর একটি উপনিষদে বলিতেছে,—

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্, আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতোগুহায়াম্।
তমক্রতুঃপশ্যতি বীতশোকঃ ধাতুঃ প্রসাদান্ মহিমানমাত্মনঃ॥"

অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর অণু হইতেও অণুতর ও মহান্ গগনাদি হইতেও মহত্তর, তিনিই আত্মা এবং সকল প্রাণীর অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে তিনি বিদ্যমান আছেন, সকাম কর্ম্মপরিত্যাগকারী পুরুষ অবিদ্যাবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহার দর্শনলাভ করিতে সমর্থ হয়, ধাতা সেই পরম পুরুষের অনুগ্রহ হইলেই সেই জীব সমূহের মহিমাত্মক পরমপুরুষের দর্শনলাভ হইয়া থাকে। এই উপনিষদে ঈশ্বর অণু হইতেও অণুতর এবং মহৎ হইতেও মহত্তর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ন্যায় ও বৈশেষিকের মতে ঈশ্বর আকাশের ন্যায় বিভু; কিন্তু আকাশ হইতে মহত্তর নহেন এবং অণু হইতে অণুতরও নহেন

ঈশ্বর কর্ত্তা এবং ভোক্তা

গীতাতে উক্ত হইয়াছে—"উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥"

ইহার অর্থ এই যে, এই দেহের মধ্যেই সেই পরমপুরুষ বিদ্যমান আছেন। তিনি উপদ্রষ্টা, তিনিই অনুমন্তা, তিনিই ভর্ত্তা, তিনিই ভোক্তা, তিনিই মহেশ্বর এবং তাঁহাকেই শাস্ত্রে পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তার্কিকের মতে ঈশ্বর কর্ত্তা, তিনি ভোক্তা নহেন। কারণ, আত্মগত সুখের যে সাক্ষাৎকার করে, তাহাকেই ভোক্তা বলে; ন্যায়মতে পরমাত্মা সুখ-দুঃখের আশ্রয় নহেন, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে; সুতরাং তিনি ভোক্তা হইতে পারেন না। এই গীতা-বাক্য কিন্তু ভোক্তাকেই সাক্ষাৎ পরমাত্মা বলিয়া স্পষ্টই নির্দেশ করিতেছে; সুতরাং ন্যায় মতের সহিত এই গীতা-বাক্যের বিরোধ সুব্যক্তভাবে প্রতীয়মান হইতেছে।

প্রয়োজন হইলে, শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে এই প্রকার রাশি রাশি বাক্য উদ্ধৃত হইতে পারে, এবং ঐ সকল বাক্যের সহিত ঈশ্বর বিষয়ক ন্যায়-মতের বিরোধ একান্ত অপরিহার্য্য, প্রবন্ধগৌরব ভয়ে এ স্থলে তাহা করা হইল না।

বিবর্ত্তবাদে জীব ও ঈশ্বর

এইবার অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণের ঈশ্বর-স্বরূপ বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত প্রচলিত আছে, তাহারই অবতারণা করা যাইতেছে। তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিতে হইলে অগ্রে জীবের স্বরূপ কি, তাহা বুঝিতে হয়। এই মতে জীব এবং ঈশ্বরে বাস্তবিক কোন পার্থক্য নাই। জগৎপ্রসবকারী অজ্ঞান একই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উপর জীব ও ঈশ্বরভাব কল্পনা করিয়াছে, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন উপাধি সম্পর্কে একই পরমাত্মা জীব ও ঈশ্বরভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকেন মাত্র, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি জীবও নহেন পরমেশ্বরও নহেন। এই সিদ্ধান্তের রহস্য বুঝিতে হইলে বিবর্ত্তবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। বিবর্ত্ত বলিলে কি বুঝায়, তাহাই বলিতেছি—

> "সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ।
> অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥"

ইহার অর্থ এই—কারণের যেরূপ সত্তা, কার্য্যকে সেইরূপ সত্তাযুক্ত বলিয়া যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সেই কার্য্যকে বিকার বা পরিণাম বলিয়া থাকে; কিন্তু কারণের যেরূপ সত্তা, কার্য্যকে সেইরূপ সত্তা হইতে বিলক্ষণ সত্তাযুক্ত বলিয়া যদি ধরা যায়, তাহা হইলে সেই কার্য্যকে বিবর্ত্ত

কহা যায়। বিকার বা পরিণামের দৃষ্টান্ত, যথা—মাটী হইতে ঘটরূপ যে কার্য্য হয়, তাহা মাটীর পরিণাম বা বিকার; কারণ মাটীর যে সত্তা বা মাটীর যা ধর্ম্ম, ঘটে তাহা সবই দেখিতে পাওয়া যায়। মাটীর যে রূপ, মাটীর যে গন্ধ, মাটীর যে রস, মাটীর যে স্পর্শ প্রভৃতি ধর্ম্ম বা গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সকলই মাটীরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন ঘটরূপ কার্য্যে দেখা যায় বলিয়া ঘট মাটীর পরিণাম বা বিকার বলিয়া বিবেচিত হয়।

রজ্জু সর্প ভ্রান্তি

এইবার বিবর্ত্তের একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। অস্পষ্ট আলোকযুক্ত গৃহে একগাছি মোটা দড়ি পড়িয়া আছে। দূর হইতে কোন ব্যক্তি তাহা দেখিবামাত্রই তাহাকে সর্প বলিয়া বুঝিল। সে স্পষ্টই দেখিতে পাইল যে, গৃহমধ্যে একটি সর্প বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন কারণে সেই দড়িগাছা একটু নড়িয়া উঠিল, ভ্রান্ত পুরুষের মনে হইল, যেন সর্প তাহাকে দংশন করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। তখন সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে দৌড়িয়া গৃহ হইতে পলায়ন করিল। পলাইয়া গৃহান্তরে যখন পৌছিল, তখন জিজ্ঞাসিত হইয়া সে বলিল, গৃহে এক ভয়ানক সর্প দেখিয়াছি, সেই সর্প আমাকে দংশন করিতে আসিলে আমি গৃহ হইতে পলাইয়া আসিয়াছি।" যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সে কিন্তু একটু পূর্ব্বেই সেই গৃহে দড়িগাছা দেখিয়া আসিয়াছিল, ভীত ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া সেই ঘরে যাইয়া আলোকের সাহায্যে সে যখন দেখাইল, উহা রজ্জু, সর্প নহে, তখন তাহার ভ্রান্তি নিবৃত্ত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভ্রান্তিজনিত সর্পও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। ঐ যে সর্প যাহাকে দেখিয়া সে ভয় পাইয়া পলাইয়াছিল, তাহাই রজ্জুরূপ কারণের বিবর্ত্ত বলিয়া পরিগণিত হয়; কারণ, রজ্জুর যে সত্তা, সর্পের সে সত্তা নহে, রজ্জু ব্যবহারিক ও সর্প প্রাতিভাসিক, রজ্জুর স্বরূপ অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইলে, তাহার উপর প্রাতিভাসিক সর্প উৎপন্ন হয়। এই কারণে রজ্জুকে কারণ ও সর্পকে কার্য্য বলা যায়, কিন্তু রজ্জুর সত্তা হইতে সর্পের সত্তা বিলক্ষণ বলিয়া ইহা রজ্জুর পরিণাম নহে, কিন্তু বিবর্ত্ত।

জীব—বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ, তুরীয়

অদ্বৈতবাদীর মতে এই রজ্জু-সর্পের ন্যায় ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত আর সকল বস্তুই মায়িক বা কল্পিত। সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের উপর অজ্ঞানবশতঃ

রজ্জুতে সর্পের ন্যায় এই নিখিল প্রপঞ্চ আরোপিত হইয়াছে, ইহার বাস্তবিক কোন সত্তা নাই; সর্প যেমন রজ্জুভিন্ন আর কিছু নয়, ইহাও তেমনি ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই নয়, ইহাই হইল পরিণাম ও বৈবর্ত্তের বৈলক্ষণ্য! যে অজ্ঞান বা মায়া হইতে এই নামরূপময় বিচিত্র প্রপঞ্চ নির্ম্মিত হয়, সেই অজ্ঞান বা মায়া অন্তঃকরণরূপে পরিণত হইলে, সেই অন্তঃকরণের দ্বারা বিশেষিত যে আত্মার বা ব্রহ্মের কল্পিত অংশবিশেষ, তাহাকে অদ্বৈতবাদীরা জীব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জীবের তিনটি অবস্থা;—জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত বাহ্য বিষয়ের সম্পর্ক হইলে যে জ্ঞান উপস্থিত হয়, সেই জ্ঞানকেই জাগরণ বলা যায়; নিদ্রার আবেশে ইন্দ্রিয়ব্যাপার নিবৃত্ত হইলে অন্তরে যে সমুদায় জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহাকেই স্বপ্ন বলা যায়; আবার অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় উভয়েব ব্যাপার বিরত হইলে গভীর নিদ্রাকালে যে অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া আত্মা প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেই অজ্ঞানকে সুষুপ্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। বেদান্ত শাস্ত্রে জাগরিত জীবকে বৈশ্বানর বা বিশ্ব কহে, স্বপ্নাবস্থায় অবস্থিত জীবকে তৈজস কহে এবং সুষুপ্তি অবস্থায় জীবকে প্রাজ্ঞ কহে। অবিদ্যাকল্পিত অন্তঃকরণের দ্বারা বিশেষিত যে জীব, তাহার এই ত্রিবিধ অবস্থা জ্ঞানের দ্বারা যখন বিলীন হইয়া যায়, তখন তাহার সেই অবস্থাকে তুরীয় বলে। তুরীয় শব্দের অর্থ চতুর্থ, অর্থাৎ জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ এই তিন অবস্থা হইতে পৃথক্ যে চতুর্থ অবস্থা, তাহাই তুরীয়।

ঈশ্বরে জীবের অন্তঃকরণ সমষ্টি

অদ্বৈতমতে জীব এবং ঈশ্বরের বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, তবে যে ভেদ পরিদৃষ্ট হয়, তাহা কল্পিত বা ব্যবহারিক। একটি বিশেষ উপাধির দ্বারা আত্মা বিশেষিত হইলে তাহাকে জীব বলা হয় এবং সেই উপাধি অন্তঃকরণ বা অন্তঃকরণের উপাদান অবিদ্যা; এই অন্তঃকরণ অসংখ্য, কারণ, প্রত্যেক দেহের মধ্যেই এক একটি অন্তঃকরণ বিদ্যমান আছে। দেহের যেমন সংখ্যা করা অসম্ভব, সেইরূপ অন্তঃকরণেরও সংখ্যা করা অসম্ভব। এই অসংখ্য অন্তঃকরণের সমষ্টির দ্বারা বিশেষিত চৈতন্যময় আত্মাই বেদান্ত শাস্ত্রে ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

প্রত্যেক জীবের উপাধি তিনটি; যথা—অজ্ঞান, তাহার কার্য্য অন্তঃকরণ

এবং সেই অন্তঃকরণ হইতে অভিব্যক্ত দশবিধ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি। এই ত্রিবিধ উপাধিযুক্ত একই আত্মা যেমন প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বৈশ্বানর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ এই ত্রিবিধ উপাধির সমষ্টির দ্বারা বিশেষিত আত্মাই যথাক্রমে ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট এই তিন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যথা—অসংখ্য জীবের উপাধিভূত অসংখ্য অজ্ঞানের যে সমষ্টি, তাহার দ্বারা উপহিত আত্মাই ঈশ্বরপদবাচ্য; অসংখ্য জীবের উপাধিস্বরূপ যে অসংখ্য অন্তঃকরণ তাহার সমষ্টির দ্বারা উপহিত যে আত্মা, তাহাই হিরণ্যগর্ভ এবং অসংখ্য জীবের উপাধিস্বরূপ যে অসংখ্য ইন্দ্রিয়াদি সংঘ, তাহার দ্বারা উপহিত যে আত্মা, তাহা বিরাট বলিয়া অভিহিত হয়েন। এই ত্রিবিধ ঈশ্বরই যখন এই ত্রিবিধ উপাধি হইতে বিনির্ম্মুক্ত হন, তখন তাঁহাকে তুরীয় ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। এক একটি জীবের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির দিক্ দিয়া যেমন তুরীয়ের স্বরূপ বুঝিতে হয়, সেইরূপ সমষ্টির দিক দিয়াও বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বরের অবস্থা অতিক্রম করিয়া তুরীয়ের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। ইহাই হইল অদ্বৈতবাদী বেদান্তমতে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাহাদের মধ্যে পরস্পর বৈলক্ষণ্য।

জীব ও ঈশ্বর মায়িক

জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিয়া উভয় দিক্ দিয়া সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইলে মানব সংসারের সকল বস্তুকেই কল্পিত বা মায়িক বলিয়া বুঝিতে সমর্থ হয়। তখন তাহার আর এ সংসারের প্রতি রাগ বা দ্বেষ কিছুই থাকে না, সমাধির বশে নির্ম্মলচিত্ত স্থির করিয়া সে তখন কেবল সেই আনন্দস্বরূপ চিন্ময় ব্রহ্মেরই ভাবনা করে, ভাবিতে ভাবিতে সে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করে এবং সেই সাক্ষাৎকারের প্রভাবে তাহার শোক, ব্যাধি, জরা, মরণ প্রভৃতি দুঃখের একমাত্র নিদানভূত যে জীবভাব, তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে, সে তখন ব্রহ্মই হয়; ইহাই হইল বেদান্তমতের মুক্তি।

সমষ্টি ঈশ্বরও ব্যষ্টি জীবে উপাস্য-উপাসক ভাব

ভক্তিবাদিগণ অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণের বর্ণিত এই প্রকার ঈশ্বরস্বরূপে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না এবং এই প্রকার মুক্তিও তাঁহাদের স্পৃহণীয় নহে

তাঁহারা বলেন, অদ্বৈতবাদিগণ কর্তৃক যেভাবে ঈশ্বর বর্ণিত হইয়াছেন, তাহার সার নিষ্কর্ষ হইল এই যে, জীবসমষ্টির নাম ঈশ্বর। সমষ্টি ব্যষ্টি হইতে পৃথক্ হইতে পারে না, তাহাই যদি হইল, তবে ঈশ্বর নিয়ন্তা ও জীব নিয়ম্য, এই প্রকার ব্যবস্থা কিরূপে উৎপন্ন হইবে? ব্যষ্টির উপর সমষ্টির কোন কর্তৃত্ব নাই; সুতরাং ঈশ্বরকে পৃথক্ ভাবে কর্তা বলিয়া যে শ্রুতিতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই মতে তাহাও সংলগ্ন হয় না। আর একটি কথা, সমষ্টিরূপ উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে চিদাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বর, তাঁহাতে ব্যষ্টিগত শক্তিসমূহ হইতে অতিরিক্ত কোন পৃথক্ শক্তি আছে, তাহা বলা যায় না; যদি তাঁহার অতিরিক্ত কোন শক্তি বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলেই সেই শক্তিমান্‌কেই ঈশ্বর বলিয়া ধরিলে চলে, তবে আবার সমষ্টিকে তাঁহার উপাধি বলিয়া স্বীকার করিবার প্রয়োজনীয়তা কি? ব্যষ্টিসমূহকেই ত সমষ্টি বলে, সুতরাং সমূহে যে সকল শক্তি আছে, তাহার কোনটিও ব্যষ্টিশক্তি হইতে যে পৃথক্, তাহা বলা যায় না। তাহাই যদি হইল, তবে জীব ঈশ্বরকে আশ্রয় বা উপাসনা করে, ইহা বলিলে কি বুঝা যায়? ইহা বলিলে ইহাই বুঝা যায় যে, সে আপনা হইতে পৃথক্ কোন একটি ব্যষ্টিকে বা কতকগুলি ব্যষ্টিকে আশ্রয় করে। সমষ্টির মধ্যে সেই জীবও একটি ব্যষ্টি বলিয়া পরিগণিত, সুতরাং সে আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর কোন এক ব্যষ্টি বা ব্যষ্টিসমূহকে আশ্রয় বা উপাসনা করে। কিন্তু এরূপ উপাসনা বেদান্তমতে ঈশ্বরের উপাসনা হইতে পারে না, কারণ, কোন একটি ব্যষ্টি জীবের যে উপাস্য হইবে, সে সেই ব্যষ্টি ভিন্ন অন্য ব্যষ্টিসমূহের দ্বারা উপহিত, নিখিল ব্যষ্টির দ্বারা উপহিত নহে, সুতরাং তাহা ঈশ্বরপদবাচ্য হইতে পারে না। এই কারণে সমষ্টির দ্বারা উপহিত চিদাত্মাকে যাঁহারা ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে ঈশ্বরের উপাসনা সিদ্ধ হয় না। তাহার পর আরও দেখ— শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতিতে ঈশ্বরকে করুণাময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাঁহারই ইচ্ছায় জীবের বন্ধন বা মোক্ষ হইয়া থাকে, ইহাও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। এখন বল দেখি, সমষ্টির দ্বারা উপহিত যে ঈশ্বরের করুণা, সে কোন ব্যষ্টির করুণা? সমষ্টির করুণা, ইহা ত কখনও সম্ভবপর হয় না। কারণ সমষ্টির অর্থ ব্যষ্টিসমূহ, ব্যষ্টিতে যে করুণাসমূহ বিদ্যমান আছে, তাহাকেই সমষ্টির করুণা বলা যাইতে পারে। সে করুণার সহিত আমার মুক্তির সম্বন্ধ কি? সকল জীবে করুণা করিয়া আমাকে মুক্ত করিবে, ইহা কিরূপে

সম্ভবে? ঐ সকল জীবের মধ্যে প্রত্যেক জীবই আমার ন্যায় বদ্ধ, বদ্ধের করুণায় বদ্ধজীব মুক্তি লাভ করিবে, ইহা কি সম্ভবপর? যে নিজে মুক্ত নহে, সে অপরকে মুক্তি প্রদান কিছুতেই করিতে পারে না। কোন জীবই আপনার ইচ্ছায় বদ্ধ হয় না, মুক্তও হয় না। প্রত্যেক জীবেরই যখন এই স্বভাব, তখন জীবসমষ্টি-স্বরূপ ঈশ্বরে জীবের বন্ধন ও মোক্ষের কারণস্বরূপ ইচ্ছা আসিবে কোথা হইতে? এই কারণে সমষ্টিরূপ উপাধি হইতে পৃথক্ অন্য কোন উপাধির দ্বারা উপহিত চিদাত্মাকে যদি ঈশ্বর বলা যায়, তাহা হইলে সমষ্টিকে তাহার উপাধি বলিয়া অঙ্গীকার করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। এই সকল কারণে ভক্তিবাদী দার্শনিকগণ অদ্বৈতবাদীর সম্মত ঈশ্বরতত্ত্বের উপর ঐকান্তিক আস্থাযুক্ত হইতে পারেন না।

তাঁহারা কিভাবে ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিয়া থাকেন এবং কিরূপ প্রমাণের সাহায্যে সেই ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপিত হইয়া থাকে, এইবার তাহারই আলোচনা করা যাইবে।

(১১)

ভক্তি বা প্রীতি জীব ও ঈশ্বরে ভেদ-সাপেক্ষ

অদ্বৈতবাদীর মতে জীব ও ঈশতত্ত্বের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে অবলম্বন করিলে ভক্তিসিদ্ধান্ত দাঁড়াইতে পারে না, কারণ, ভক্তি শব্দের অর্থ প্রীতি বা অনুরাগ, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। এই প্রীতি যে বিষয়কে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে নিজের বৈলক্ষণ্য জ্ঞান বা ভেদানুভূতি না থাকিলে ইহা হইতেই পারে না। প্রীতির বিষয় বা প্রীতির আধার কখনই এক হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদীর মতে জীবে ও ঈশ্বরে কোনপ্রকার ভেদ না থাকায় জীবের ঈশ্বরে প্রীতি হওয়া কখনও সম্ভবপর নহে। অবশ্য ইহার উপর অদ্বৈতবাদিগণের একটা কথা বলিবার আছে। তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে এ সংসারে প্রীতি দুই প্রকার, এক সোপাধিক, দ্বিতীয় নিরুপাধিক। আপনার সুখের সাধন বলিয়া জগতে যে সকল বস্তু প্রসিদ্ধ আছে, তাহাদিগের উপর আমাদের যে প্রীতি, তাহাকে সোপাধিক প্রীতি বলা যায়; যেমন স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য প্রভৃতিতে আমাদিগের প্রীতি। নিজের প্রতি লোকের যে স্বাভাবিক প্রীতি আছে, তাহাকেই নিরুপাধিক প্রীতি বলা যায়। এই

নিরুপাধিক প্রীতি অধ্যাত্ম শাস্ত্রে ভক্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। জীব ঈশ্বর হইতে অভিন্ন হইলে, এই প্রীতিরূপা ভক্তি তাঁহার প্রতি হইবে না কেন? তিনি যদি আমা হইতে পৃথক না হয়েন, তাহা হইলে আমার প্রতি আমার যে প্রীতি আছে, তাহাই ঈশ্বরপ্রীতি বা ভক্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে। অদ্বৈতবাদিগণের এই প্রকার মত ভক্তিসিদ্ধান্তের অনুকূল হইতে পারে না, কারণ, অধ্যাত্মশাস্ত্রে জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থাই ভক্তিশব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদীর মতে সে জ্ঞান কি? তাঁহাদের মতে সে জ্ঞান নিরুপাধিক শুদ্ধ ব্রহ্মের জ্ঞান, যে জ্ঞানে কোন প্রকার ভেদ বা বৈলক্ষণ্যের প্রকাশ হয় না, নাম বা রূপের অতীত, শুদ্ধ, চিন্ময় ব্রহ্মই যে জ্ঞানে প্রকাশিত হয়, সে জ্ঞান কি করিয়া প্রীতিরূপে পরিণত হইবে, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, অভিলাষময়, উল্লাসময় যে প্রকাশ-বিশেষ, তাহাই ভক্তিশাস্ত্রে প্রীতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অভিলাষ বা ইচ্ছা ভেদজ্ঞান না থাকিলে হইতেই পারে না, এই কারণে অনুরাগময় যে প্রীতি, যাহা ঈশ্বরে অর্পিত হইলে ভক্তি বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা অদ্বৈতবাদীর মতে ঈশ্বরের প্রতি জীবের হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। তাই বলিতেছিলাম, যে জাতীয় তত্ত্বজ্ঞান চরমে এই প্রীতি বা ভক্তিরূপে পরিণত হইতে পারে, তাহার স্বরূপ কি, তাহা ভক্তিসিদ্ধান্তানুসারে নিরূপণ করিতে হইলে অদ্বৈতবাদীর অভেদজ্ঞান পর্য্যাপ্ত নহে। এই কারণে এক্ষণে ভক্তিসিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া সেই ঈশতত্ত্বজ্ঞানের অবতারণা করা যাইতেছে।

শক্তিতে সর্ব্ববিরোধ সমন্বয়

ভক্তের নিকট ভগবান সুখময়। এ সুখ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে যে সুখ হয়, তাহা নহে। ইহা নিত্য সুখ। এ সুখে চৈতন্য আছে। এ সুখ নিরাকার নহে, ইহার অনন্ত আকার আছে। এই চিন্ময়, আনন্দময়, অনন্ত-আকার-সম্পন্ন ঈশতত্ত্বই ভক্তের প্রীতি বা ভক্তির একমাত্র অবলম্বন। এই ভগবত্তত্ত্ব বুঝিতে হইলে শাস্ত্র বা শ্রুতি প্রধান প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হয়। শ্রুতি বলেন :—

> "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্, আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
> তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদাৎ মহিমানমাত্মনঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, "তিনি অণু হইতেও অণুতর, মহান্ হইতেও

মহত্তর, তিনি সকলের আত্মা, সকলের হৃদ্দেশে বিরাজমান, তাঁহার কর্ম্মফলে স্পৃহা নাই। দেহে যাহার আত্মভ্রান্তি নাই, এবং সেই ভগবান্ যাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, সেই ব্যক্তি সেই মহনীয় মহিমময় দেবতাকে দেখিতে পায়।

এই শ্রুতি বলিতেছেন, তিনি অণু হইতেও অণুতর ও মহান্ হইতেও মহত্তর। ব্যবহারিক প্রমাণের যাঁহারা তত্ত্ব-নিরূপণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা হয় ত বলিবেন যে, ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর? অণু-পরিমাণের সহিত মহৎ-পরিমাণের নিত্য বিরোধ; যে অণু, সে মহান্ হইতে পারে না; যে মহান্, সে অণু হইতে পারে না। এ শ্রুতিতে কিন্তু পরমেশ্বরকে একই সময়ে অণুতর ও মহত্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে—ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইবে? দার্শনিক দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া এ শ্রুতির যথাশ্রুত অর্থ বুঝিতে না পারা যাইলেও, ভক্তের দৃষ্টি অনুসারে ইহার যথাশ্রুত অর্থ পরমার্থ সত্য বা পরিপূর্ণ সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। কারণ, ভক্তি শক্তির উপর নির্ভর করে, সকল বিরোধের সমন্বয় যে শক্তি দ্বারা হইয়া থাকে, সেই শক্তিই ভক্তির প্রধান অবলম্বন। শ্রুতি বলিতেছেন:—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।"

অর্থাৎ এই পরমেশ্বরের বিবিধ লোকাতীত শক্তি আছে, ইহা শুনিতে পাওয়া যায়।

শক্তি অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর

শক্তির স্বরূপ কি? সে বিষয় নিরূপণ করিতে যাইয়া শাস্ত্র বলিতেছে:—

"শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানাম্ অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।"

অর্থাৎ ভাববস্তু মাত্রেরই যত প্রকার শক্তি আছে, তাহার প্রত্যেকটি অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর অর্থাৎ চিন্তা বা তর্কের দ্বারা যে জ্ঞান প্রসূত হয়, সেই জ্ঞান শক্তিতত্ত্বকে বিষয় করে না।

এই যে 'শক্তি', 'শক্তি' বলিয়া আমরা কোন একটি বস্তুকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, বল দেখি সে বস্তুটি কি? লোকে বলে, বহ্নিতে দাহিকা শক্তি আছে। বল দেখি সে শক্তির সহিত বহ্নির সম্বন্ধ কি? তাহা কি বহ্নির স্বরূপ, না বহ্নি হইতে পৃথক্ বহ্নির কোন ধর্ম্ম? বহ্নি হইতে তাহা অভিন্ন, ইহা বলা যায় না, কারণ বহ্নি আছে, তাহা দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু তাহার শক্তি দেখিতে পাইতেছি না; বহ্নি প্রত্যক্ষ, শক্তি অনুমেয়; সুতরাং বহ্নি ও তাহার শক্তি একই বস্তু হইতে পারে না। যদি বল, ঐ শক্তি বহ্নি হইতে পৃথক্, বহ্নির

ধর্ম্মবিশেষ, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ যে বস্তু দুইটির পরস্পর অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য আছে, তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর ধর্ম্মধর্ম্মিভাব সম্ভবপর নহে ; যেমন গো হইতে মহিষ অত্যন্ত বিভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া, গো মহিষের ধর্ম্ম বা স্বভাব হয় না বা মহিষ গো'র ধর্ম্ম বা স্বভাব হইতে পারে না, সেইরূপ বহ্নি ও তাহার শক্তি যদি পরস্পর অত্যন্ত বিলক্ষণ হয়, তাহা হইলে বহ্নি ও তাহার শক্তির মধ্যে পরস্পরের ধর্ম্মধর্ম্মিভাব হইতে পারে না। তবেই দেখা যাইতেছে যে, বহ্নির যাহা শক্তি, তাহা বহ্নি হইতে ভিন্ন নহে, অভিন্নও নহে। তবে তাহা কি ? এ জগতে বস্তু মাত্রেরই এই স্বভাব যে, তাহা কোন বস্তু হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু বহ্নির যে শক্তি, তাহা বহ্নি হইতে ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে। এই কারণে শাস্ত্র বলিতেছে, শক্তি-মাত্রই অচিন্ত্য স্বভাব এবং তর্ক ও জ্ঞানের অগোচর।

আবার অন্যদিক্ দিয়া দেখ, বহ্নির শক্তি দাহরূপ কার্য্যের অনুকূল হইয়া থাকে। দাহরূপ কার্য্য যখন না থাকে, তখন বহ্নি এবং তদীয় শক্তির মধ্যে কোনপ্রকার পার্থক্যের অনুভূতি হয় না, উভয়ই একই হইয়া থাকে, দাহরূপ কার্য্যের সমাবেশ-স্থানে আবার সেই শক্তিই বহ্নির ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সুতরাং এই দাঁড়াইতেছে যে, যাহা বহ্নি হইতে ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে, অথচ যাহা ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে তাহাই বহ্নির শক্তি।

অচিন্ত্য শক্তিমান্ প্রেম-গম্য

শ্রুতি যখন ভগবানকে শক্তিমান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং শক্তি যখন শক্তিমান্ হইতে অভিন্ন, তখন শক্তি যেমন তর্কের ও জ্ঞানের অগোচর এবং অচিন্ত্যস্বভাব, সেইপ্রকার অনন্ত কোটি শক্তিশালী ভগবান্‌ও জ্ঞানীর নিকট, প্রমাতার নিকট অচিন্ত্যস্বভাব ও অতর্ক্যজ্ঞানগোচর। প্রমাণ যাহাকে খুঁজিয়া পায় না, সেই ভগবান্‌কে দেখিতে হইলে, যে উপায়কে আশ্রয় করিতে হইবে, সে উপায় লোকসিদ্ধ প্রমাণ নহে, তাহা পরমার্থ-প্রমাণের চরম পরিণতি প্রেম বা ভক্তি। তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতনেত্রবিশেষগম্যম্।"

অর্থাৎ প্রেমরূপ অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত যে নেত্র বিশেষ, তাহার দ্বারা ভগবানের স্বরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে।

শক্তিরহস্য—এক কারণে বিচিত্র কার্য্য

বাস্তবিকই শক্তিতত্ত্ব অতিদুরূহ। লৌকিক প্রমাণের দ্বারা যাহা পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, শক্তির দিক্ দিয়া তাহাই অবিরুদ্ধ হইয়া উঠে। চন্দ্রের কিরণ নয়নকে স্নিগ্ধ বা প্রসন্ন করিয়া থাকে, ইহা কে না জানে? তদনুসারে সকলেই বলিয়া থাকে, নয়নেব প্রীতি-দায়িনী শক্তি চন্দ্রকিরণে আছে; কিন্তু বিরহ-ক্লিষ্ট প্রণয়ীর চক্ষুতে সেই চন্দ্রকিরণ সন্তাপ প্রদান করিয়া থাকে। সন্তাপ-কারিণী শক্তির সহিত প্রসাদ-কারিণী শক্তির স্বভাব বিরুদ্ধ হইলেও চন্দ্ররশ্মিতে এই বিরুদ্ধ-স্বভাবের শক্তিদ্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। তীব্র হলাহলের জীবননাশিনী শক্তি সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ; কিন্তু সেই হলাহল সান্নিপাতিক বিকারগ্রস্ত রোগীকে জীবন প্রদান করিয়া থাকে, ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এক জাতীয় আহার্য্য দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন জীবের পাকস্থলীতে প্রবিষ্ট হইয়া কত বিচিত্র কার্য্যের সৃষ্টি করে, তাহার ইয়ত্তা করে কে? ছোলা অশ্বের উদরে প্রবিষ্ট হইয়া অশ্বশরীরের বৈচিত্র্যময় পুষ্টি করে, আবার তাহাই ছাগের পাকস্থলীকে প্রবিষ্ট হইয়া ছাগের বিচিত্র প্রকারের শরীররূপে পরিণত হয়। একই মাটি, জল, বায়ু ও উত্তাপ ভিন্ন ভিন্ন বীজের সহিত মিলিত হইয়া তাহা হইতে অনন্তপ্রকার বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতির উৎপাদন করে, ইহা ত আমরা সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র দেখিতে পাইতেছি। ইহা দেখিয়াও কিরূপে বলিতে পারি যে, শক্তির স্বরূপ বা শক্তির সহিত শক্তিমানের সম্বন্ধ আমার বুদ্ধির মাপকাঠি দিয়া মাপিয়া স্থির করিব?

প্রপঞ্চমূলে অনন্তশক্তি অদ্বয় কারণ

ভৌতিক বিজ্ঞান ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে যতই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, ততই বিচিত্র কার্য্যসমষ্টির মূলে অনন্ত শক্তিশালী অদ্বয় কারণের বিশ্বব্যাপিনী ও সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ী সত্তার দিকে সকল মনীষিবৃন্দের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতেছে, ইহা কোন্ শিক্ষিত ব্যক্তির অবিদিত? সেই কারণের কি স্বরূপ, তাহা বুঝাইবার ভাষা তোমার বা আমার আয়ত্ত না হইলেও, ভাষার সাহায্যে আমরা যাহা বুঝি বা বুঝাইতে পারি, সেই সকল বস্তুই যে সেই মূল কারণের অংশ, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? তাহা তোমার আমার অনুভূতি-গোচর জড়প্রপঞ্চের মধ্যে একটা কিছু না হইলেও, অথবা তোমার আমার ন্যায় ভোক্তৃনিবহের মধ্যে একজন না হইলেও, নিখিল জড় প্রপঞ্চেরও

ভোক্তৃনিচয়ের তাহাই যে একমাত্র আশ্রয় ও চরম বিশ্রান্তি-নিকেতন, তাহার অপলাপ করিতে কে সাহসী হইবে? সেই ভূমার, সেই সর্ব্বাশ্রয়ের, সেই সর্ব্বকারণ-কারণের, সেই মহামহিমময় বিশ্বনিয়ন্তার অনুসন্ধান না করিয়া, তাঁহাকে না বুঝিয়া, এই মর্ত্তলোক হইতে যাহারা চলিয়া যায়, তাহারাই এই সংসারে মানবজন্ম লাভ করিয়াও মানব-নামের যোগ্য নহে, এই কথাই শ্রুতি বলিতেছেন :—

"যোবা এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্গি অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।"

অর্থাৎ হে গার্গি! সেই অবিনাশী পরম পুরুষকে না বুঝিয়া এই লোক হইতে যে মানুষ লোকান্তর প্রাপ্ত হয়, সেই কৃপণ বা শোচনীয়।

কর্ত্তা ও ভোক্তা এক—তদ্ভিন্ন সব আভিমানিক

তোমার, আমার বা রামের, শ্যামের যে সত্তা, তাহা সেই ভূমা হইতেই আবির্ভূত হয়, আবার তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়। মায়ার মোহে, কর্ত্তৃত্বের অভিমানে, দেহাত্মবাদের নেশায় পড়িয়া তাঁহার দিকে একবারও না তাকাইয়া তুমি এ সংসার হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় লইতে পার, কিন্তু তিনি একক্ষণের জন্যও তোমাকে ছাড়েন নাই, ছাড়িতে পারেনও না। তোমার ভোক্তৃত্ব, তোমার কর্ত্তৃত্ব আভিমানিক। আসল কথা এই যে এ সংসারে একা তিনিই ভোক্তা, একা তিনিই কর্ত্তা; তাঁহাকে জান, তাঁহার আশ্রয় লও, দেখিবে, তোমার আমার আভিমানিক কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব সব মিটিয়া যাইবে, তুমি অনন্ত শান্তি লাভ করিবে। তাই গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥"

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! আমিই যজ্ঞ ও তপস্যার ফলভোগ করিয়া থাকি, সকল লোকের আমিই একমাত্র মহেশ্বর বা পরমনিয়ন্তা, সকল জীবের আমি একমাত্র সুহৃৎ, এইরূপে আমাকে যে জানিতে পারে সেই শান্তিলাভে সমর্থ হয়।

ভক্তের প্রতি অনুগ্রহে অসীমের নানা মূর্ত্তি

এই সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, লৌকিক প্রমাণের অগোচর, সর্ব্ববিরোধের সমন্বয়ভূমি, শাশ্বত শান্তির মূল উপাদান পরমেশ্বর-স্বরূপই ভক্তের জ্ঞেয়, ধ্যেয় ও উপাস্য। ইহাই হইল ভক্তিশাস্ত্রের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত। ভক্তের নিকট ভগবান্ বিভু হইলেও,

অণু বা মধ্যম-পরিমাণ হইতে পারেন। অনন্তশক্তির নিকেতন, সুতরাং অনন্তরূপধারী ভগবান্ ভক্তেরই অভিপ্রায়ানুসারে ভক্তের অভীষ্টরূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হয়েন। তাই ভাগবত বলিতেছেন—

"ত্বং ভক্তিযোগ-পরিভাবিত-হৃৎসরোজে,
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তৎতদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, হে নাথ! ভক্তের হৃদয়রূপ কমল যখন প্রেমভক্তি-রূপ যোগদ্বারা পরিভাবিত বা সমুৎফুল্ল হয়, তখন তুমি তাহাতে আবির্ভূত হও। তোমাকে পাইবার উপায় কল্পনাবলে লব্ধ হয় না, কিন্তু তোমার তত্ত্ববিদ্ আচার্য্যের নিকট শ্রদ্ধাসহকারে শুনিলেই তাহা প্রকটিত হয়। এই ভাবে হে উরুগায়! (মহাজনগণ যাঁহার গান করিয়া থাকেন, অথবা যাঁহার গানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তিনি উরুগায়) সেই সকল ভক্তিবিশুদ্ধচেতা ভক্তগণ তোমার যে যে মূর্ত্তিকে ধ্যানের সাহায্যে মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তুমিও তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য সাধুগণের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া এই সংসারে সেই সেই মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া থাক।

উপাস্য ভূমা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভগবান্ ভক্তের নিকট বিভুও হইয়া থাকেন, মধ্যম পরিমাণেরও হইয়া থাকেন। মানবের হৃদয় সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত্ত হইতে এই দীর্ঘ দীর্ঘতর কাল কেবলই পরিচ্ছিন্ন ভাবিয়া আসিতেছে; বিরাটের কথা, বিভুর কথা. ভূমার কথা তাহার কানে শাস্ত্রের সাহায্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে, ইহা অস্বীকার করি না। তাহার দৃষ্টি কিন্তু সান্ত ও সাবয়ব বস্তুনিচয়ের সহিত অনাদিকাল হইতে সংবদ্ধ, সে দৃষ্টিতে অনন্তের অনবয়বের স্বরূপ কিছুতেই প্রকাশিত হইতে পারে না, অথচ শ্রুতি বলিতেছেন—

"যো বৈ ভূমা স উপাসিতব্যঃ নাল্পে সুখমস্তি।"

অর্থাৎ যিনি ভূমা, যিনি মহান্, যিনি অনন্ত, তাঁহাকেই উপাসনা করিবে, কারণ অল্পে সুখের সম্ভাবনা নাই। অল্পে সুখ নাই তাহা ত প্রতিক্ষণ অনুভব করিতেছি, যাহা অল্প, যাহা আদ্যন্তযুক্ত, যাহার সহিত সংযুক্ত হইলে বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী, সুখের জন্য তাহাকে আশ্রয় করিলে পরিণাম যে ভীষণ হয়, তাহা

প্রতিমুহূর্ত্তে সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে পড়িয়া সকলেই জানিতে বাধ্য হইয়া থাকে। সুতরাং অনন্ত সুখলাভ করিতে হইলে, শাশ্বত শান্তি পাইতে হইলে, অল্পকে, ক্ষুদ্রকে ছাড়িতে হইবে, মহান্‌কে বিভূকে, ভূমাকে ধরিতে হইবে। ইহা কে না বুঝে? কিন্তু বুঝিয়াই বা লাভ কি? ভূমা যে ধরা দেয় না, মহান্ যে স্বানুভবের গোচর হয় না, বিরাট্‌কে যে ধরিবার সম্ভাবনা নাই।

উপাসক সমবুদ্ধি ভক্ত

মুক্তিশাস্ত্রের এই জটিল সমস্যার সমাধান করিবার জন্য, ভারতে এ পর্য্যন্ত কতপ্রকার দর্শনশাস্ত্র কল্পিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। মোট কথা এই যে, কোনও দর্শনশাস্ত্রে এই কঠোর সমস্যার যে সমাধান হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এ সমস্যার সমাধান কিন্তু যাহার দ্বারা হইয়া থাকে, তাহারই নাম ভক্তি বা প্রেম। তাই গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মা তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই—ব্রহ্মভূত, প্রসন্নচিত্ত কিছুতেই শোকগ্রস্ত হয় না বা কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে না। সে সর্ব্বভূতে সমতা-সম্পন্ন হয় এবং আমাতে পরম বা চরম ভক্তি লাভ করিয়া থাকে এবং সেই ভক্তির প্রভাবে আমি কে ও আমি কত মহান্, তাহা সে বুঝিতে সমর্থ হয় এবং বুঝিয়া আমাতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

সমস্ত গীতাশাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য এই দুইটি শ্লোকের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। এত সংক্ষিপ্ত ভাবে ভগবদ্‌ভক্তির স্বরূপ আর কোথাও বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একমাত্র ভক্তি দ্বারা ভগবানের স্বরূপ ও ইয়ত্তা মানব বুঝিতে সমর্থ হয়।

ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বকাম, পরিপূর্ণ ও আপ্তকাম হইয়াও ভক্তের ইচ্ছানুসারে এ সংসারে ভক্তের কাছে ধরা দিয়া থাকেন, পরতন্ত্রও হইয়া থাকেন, ইহাই তাঁহার স্বভাব বা লীলা।

(১২)

মুক্ত পুরুষেরও ভজনে প্রয়োজন

গীতার উক্ত দুইটি শ্লোকে ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি প্রণিধানযোগ্য। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, মুক্তাবস্থা ও ভক্তাবস্থা অথবা মুক্তি বা ভক্তি, এই দুইটির মধ্যে একপ্রকার সাধ্যসাধন-ভাব বা পূর্ব্বাপর-ভাব বিদ্যমান আছে। কারণ, ব্রহ্মভূত হইয়া শোক ও আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন করিয়া সাধক মানব প্রসন্নাত্মা হয়, অর্থাৎ চিত্তপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থাতেই সাধক সর্ব্বভূতে সমতা-দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া থাকে। বেদান্ত-দর্শনে ইহাকেই জীবন্মুক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। ভগবদ্গীতারও বহুস্থলে এইরূপ অবস্থায় উপনীত ব্যক্তিকে স্থিতধী, স্থিতপ্রজ্ঞ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে। ভাষ্যকার ইহা বলিয়াছেন যে, মুক্তাবস্থার পরও ভগবদ্ভক্তিসম্পন্ন হইয়া ভগবৎসেবার অনুকূল সিদ্ধদেহ পরিগ্রহপূর্ব্বক মুক্ত পুরুষগণ ভগবদ্ভজন করিয়া থাকেন, যথা :—

"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।"

আবার সৌপর্ণশ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—"মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসতে।" অর্থাৎ "মুক্ত পুরুষগণও এই ভগবানের উপাসনা করেন।" গীতার "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" ইত্যাদি শ্লোকে ব্রহ্মভূত শব্দের কি অর্থ, তাহাও প্রণিধানযোগ্য। ব্রহ্মভূত শব্দের যথাশ্রুত অর্থ ব্রহ্মস্বরূপ, অর্থাৎ ব্রহ্মের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিতে করিতে যে ভাগ্যবান্ মানব দেহাত্মভাব দূর করিয়া স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মাত্মভাবকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, সেই ব্রহ্মভূত হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদীর মতে ইহাই তুরীয় বা মোক্ষ অবস্থা, ইহার পরে অন্য কোন প্রকার পুরুষার্থ যে থাকিতে পারে এবং মুক্তপুরুষের পক্ষে তাহাও যে স্পৃহণীয় হইতে পারে—তাহা অদ্বৈতসিদ্ধান্তের কোন আচার্য্যই অঙ্গীকার করেন না। কিন্তু গীতায় শ্রীভগবান্ স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, ব্রহ্মভূত বা মুক্ত হইবার পরে মানব পরা ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া থাকে, অর্থাৎ মুক্তি জীবের চরম বা পরম অবস্থা নহে, ভক্তিই জীবের চরম বা পরম অবস্থা। এই ভক্তি কিন্তু শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপ সাধন ভক্তি নহে; সাধ্য বা পঞ্চমপুরুষার্থরূপা ভক্তি। ইহাকেই ভক্তিশাস্ত্রের আচার্য্যগণ প্রীতি বা প্রেমরূপা ভক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

ভক্তিহীন জ্ঞানে পতন সম্ভাবনা

কেবল গীতাতেই যে উক্ত হইয়াছে, তাহা নহে, শ্রীমদ্ভাগবতেও বহুস্থলে এই কথাই স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ঃ—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন স্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ, পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্য, "হে অরবিন্দনেত্র! যাহারা তোমার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন নহে এবং কেবল অদ্বৈতজ্ঞানের প্রভাবে যাঁহারা আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারা বহু ক্লেশে পরমপদ লাভ করিয়াও আবার এই সংসার-দুঃখে পতিত হইয়া থাকে; তাহাদিগের এই প্রকার অধঃপতনের কারণ এই যে, তাহারা তোমার চরণারবিন্দকে আশ্রয় করে না, সুতরাং তাহাদিগের চিত্ত সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ হইতে পারে না।" অর্থাৎ ভক্তিহীন জ্ঞান সংসার-দুঃখ-নিবৃত্তির আত্যন্তিক কারণ কখনই হইতে পারে না, কিয়ৎকালের জন্য তাহা সাধক-হৃদয়ে আভিমানিক মুক্তি আনয়ন করে; পুনরাবৃত্তিরহিত মুক্তি ভক্তিসহকৃত বা ভক্তিরূপে পরিণত জ্ঞানের দ্বারাই হইয়া থাকে, ভক্তিহীন জ্ঞানের দ্বারা হইতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে আর একস্থানে উক্ত হইয়াছে ঃ—

"শ্রেয়ঃ স্মৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো, ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে, নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই—"হে বিভো! সকল প্রকার শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির উপায় যে তোমার প্রতি ভক্তি, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া যাহারা কেবল অদ্বয়বোধ লাভ করিবার জন্য বহুবিধ ক্লেশ অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহাদিগের সেই সকল প্রযত্ন শস্যহীন তুষনিকরের অবঘাতকারীদিগের প্রযত্নের ন্যায় নিরর্থক ক্লেশকর হইয়া থাকে, অভীপ্সিত ফলদানে সমর্থ হয় না।"

জ্ঞান ভক্তির সাধন

অদ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ ভক্তিকে জ্ঞানের সাধন বলিয়া থাকেন। ভক্তিসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ কিন্তু জ্ঞানকে ভক্তির সাধন বলিয়া থাকেন। মোক্ষবাদীর মতে জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই মুক্তির সাধন হয়, কেহ সাক্ষাৎ বা কেহ পরম্পরায়।

ভক্তিবাদীর মতে মুক্তি জ্ঞানের সাধ্য হইলেও ভক্তির তাহা পূর্ব্বাবস্থা।

চরম সাধ্যরূপ যে প্রেমভক্তি, তাহা বদ্ধাবস্থায় জীবের সম্ভবপর নহে, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত জীবের দেহাভিমান থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহার ভগবৎপ্রেমরূপ ভক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। ভক্তিশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" ইত্যাদি শ্লোকে গীতায় স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি" এই দুইটি কথার দ্বারা স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, ভক্তির আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বেই শোক ও আকাঙ্ক্ষা দুই মিটিয়া যায়। মানবের দেহে আত্মবোধ বা আত্মীয়ত্ব-বোধ থাকিতে শোকের বা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি যখন সম্ভবপর নহে, তখন শোকের বা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইয়াছে, এরূপ উক্তির দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে, সেই ব্যক্তির দেহাত্মাভিমান একেবারে নিবৃত্ত হইয়াছে। দেহাত্মাভিমান যাহার নিবৃত্ত হইয়াছে, অধ্যাত্মশাস্ত্রে তাহাকে মুক্ত বা জীবন্মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করে। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, গীতার নির্দ্দেশানুসারে জীবন্মুক্ত অবস্থার পর প্রেম বা ভক্তির অভ্যুদয় হইয়া থাকে। এস্থলে গীতাতে আর একটি যে বিশেষণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

সমতাদর্শন অর্থে সর্ব্বজীবের আভিমানিক কর্ত্তৃত্ববোধ

"সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু" অর্থাৎ "সর্ব্বভূতে সম"। ভূত শব্দের অর্থ এস্থলে প্রাণিমাত্র অর্থাৎ দেহাত্মাভিমান-নিবৃত্তির পর সকল প্রাণীতেই সমতাদৃষ্টি উদিত হয় এবং তাহার পর জীব পরা ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া থাকে। সমতাদর্শন শব্দের অর্থ কি? ভক্তিসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, দেহাত্মাভিমান-নিবৃত্তির পর সাধকের আত্মস্বরূপ নির্ণয় যেরূপে হয়, সেইরূপেই সকল জীবের যে স্বরূপ-নির্ণয়, তাহাই হইল সর্ব্বভূতে সমতাজ্ঞান, অর্থাৎ আমার যেমন ভগবান্ হইতে পৃথক্‌ভাবে থাকিবার সামর্থ্য নাই, কোন কর্ত্তৃত্ব বা তন্মূলক স্বতন্ত্র ইচ্ছা প্রভৃতি নাই, সেইরূপ কীটপতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুন্নততম স্তরের যে কোন জীবই হউক না কেন, তাহাদের মধ্যে কাহারও কোনপ্রকার স্বাতন্ত্র্য বা তন্মূলক কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতির কিছুই বাস্তব নহে। নিজে কর্ত্তা না হইয়াও, কর্ত্তৃত্বাভিমানযুক্ত হইলে মানবের যেমন প্রতিপদে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়, সেইরূপ আকীট আপতঙ্গ চতুরানন ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকল চেতনেই এই কর্ত্তৃত্বাভিমানমূলক বিড়ম্বনা ও তন্নিবন্ধন নানাবিধ সংসার-দুঃখভোগ সর্ব্বদা সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে—এইপ্রকার যে জ্ঞান, তাহাই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বভূতে সমতাজ্ঞান।

সর্ব্বজীবের আর্ত্তি-গ্রহণ

সকল বদ্ধজীবে এই জাতীয় সমতাবুদ্ধি উৎপন্ন হইলেই মুক্ত মানবের হৃদয় স্বতঃই জীবদয়ায় আপ্লুত হইয়া উঠে, তখন তাহার মনে অভিলাষ হয় যে, এই সকল অবিদ্যাপথে পতিত জীবের নিজ ভ্রান্তিকল্পিত দুঃখনিবহের নিবর্ত্তন কি প্রকারে করা যাইতে পারা যায়। ইহারই জন্য সে সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের নিকট কাতরভাবে এইরূপ নিবেদন করিয়া থাকে :—

"ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরাম্ অষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজাম্ অন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই—"আমি পরমেশ্বরের নিকট অণিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ ঋদ্ধি বা ঐশ্বর্য্যযুক্ত যে পরম গতি, তাহা চাহি না; আমি নিজের আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ যে মুক্তি, তাহাও চাহি না, আমি চাই, সকল জীবের অন্তঃকরণের নিভৃততম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের মনের মধ্যে যতপ্রকার মানসিক পীড়া আছে, তাহা সকলই আমি নিজে অঙ্গীকার করিয়া তাহাদিগকে দুঃখ-নির্ম্মুক্ত করি।"

সকল জীবের সর্ব্ববিধ দুঃখ-নিবারণের জন্য এই যে অভিলাষ, ইহাই হইল ভগবদ্ভক্তির পূর্ব্বরূপ। ভগবদ্গীতায় জীবন্মুক্তির পরিচয়প্রসঙ্গেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায় :—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই—"সর্ব্বভূতের অদ্বেষ্টা, মিত্রভাবাপন্ন, কৃপালু, মমত্বহীন, নিরহঙ্কার, সুখ ও দুঃখে সমতাজ্ঞানবিশিষ্ট, ক্ষমাশীল, সতত সন্তুষ্ট, যোগী, সংযতচিত্ত, দৃঢ়নিশ্চয়যুক্ত, আমাতে অর্পিত-মনোবুদ্ধি যে মদ্ভক্ত, সেই আমার প্রিয়।"

ভক্তিতে দ্বৈত জ্ঞান

এই যে জীবন্মুক্তির অবস্থা শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় বর্ণিত হইয়াছে, ইহা জীব ও ব্রহ্মের আত্যন্তিক অভেদজ্ঞানের যে পরিণতি, তাহা বলা যাইতে পারে না। কারণ, অদ্বৈতজ্ঞান সকল প্রকার দ্বৈতজ্ঞান ও তন্মূলক ব্যবহারের

যে একান্ত বিরোধী, তাহা সকল অদ্বৈতাচার্য্যগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। করুণা, মৈত্রী ও ভক্তি প্রভৃতি মনোবৃত্তিগুলি দ্বৈতজ্ঞান না থাকিলে উৎপন্ন হয় না; এখানে কিন্তু জীবন্মুক্তের বা স্থিতপ্রজ্ঞের মানসিক অবস্থার বর্ণন করিতে যাইয়া শ্রীভগবান্ এই সকল দ্বৈতজ্ঞানমূলক মনোবৃত্তি নিচয়ের উল্লেখ করিতেছেন। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে অদ্বৈতবাদ-সম্মত জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান ভক্তির অনুকূল হইতে পারে না; ইহা ভগবানের শ্রীমুখের উক্তির দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভক্তি প্রীতিরূপা. সেই প্রীতির অবলম্বন শ্রীভগবান্, ইহার আশ্রয় ভক্ত। এই প্রীতিরূপা ভক্তি মোক্ষের সাধন নহে, প্রত্যুত ইহা মোক্ষের বিরোধিনী। ভগবান্‌কে দেখিয়া তাঁহার স্বরূপ কি তাহা বুঝিয়া সেবার দ্বারা তাঁহাকে সুখী করিবার ঐকান্তিক অভিলাষই এই প্রীতিরূপা ভক্তির উপাদান। বিনশ্বর ও অপবিত্র দেহের উপর অহং-মমতাভিমান দূরীভূত না হইলে, সেবার দ্বারা ভগবান্‌কে সুখী করিবার অভিলাষ মানবহৃদয়ে কিছুতেই উৎপন্ন হইতে পারে না।

পরতত্ত্বের তিন স্বরূপ

দার্শনিকগণ হয় ত বলিলেন, এ আবার কি কথা। ভগবানকে সেবার দ্বারা সুখী করিবার অভিলাষ কিরূপে সম্ভবপর? যিনি স্বয়ং সুখস্বরূপ, শ্রুতি যাঁহাকে সাক্ষাৎ আনন্দস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে, যাঁহার আনন্দের ছিটা-ফোঁটা লইয়া এ সংসারে সকল জীবই আপনাকে আনন্দযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে, যিনি আত্মারাম, যিনি আপ্তকাম এবং যিনি সর্ব্বদা আত্মতৃপ্ত, আমরা তাহার সেবা করিয়া তাঁহাকে সুখী করিব, ইহা কি কখনও সম্ভবপর হয়? দার্শনিকগণের এই প্রশ্নের সমাধান করিতে যাইয়া ভক্তি-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের অনুবর্ত্তী হইয়া যে কয়টি কথা বলিয়া থাকেন—এক্ষণে তাহারই অবতারণা করা যাইতেছে।

তাঁহারা বলেন, শ্রুতির তাৎপর্য্যানুসারে ভগবৎতত্ত্ব বুঝিতে হইলে, তাঁহাকে কেবল নিরাকার, নির্গুণ, নির্ব্বিকার ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বলিয়াই বুঝিলে চলিবে না। ভাগবতকার স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

"ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।"

অর্থাৎ তিনি জ্ঞানীর নিকট ব্রহ্ম, যোগীর নিকট পরমাত্মা ও ভক্তের নিকট

ভগবান্ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকেন, জ্ঞানীর নিকট যাহা অদ্বয় অখণ্ড চৈতন্য-স্বরূপ, সমাহিতচেতা যোগীর নিকট আবার তাহাই সর্ব্বভূত গুহাশয় অন্তর্যামী পরমাত্মা রূপে স্ফুরিত হয় ; আবার প্রেমিক অনন্যশরণ ভক্তের নিকট সেই অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বই ভগবান্ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে।

সর্ব্ববিরোধের সমন্বয় ভূমি

একই বস্তু সর্ব্বশক্তির আধার বলিয়া নির্গুণ এবং সগুণ, নিরাকার ও সাকার, পরিপূর্ণকাম হইয়াও ভক্তের ভালবাসা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকেন। তিনি যে সর্ব্বাশ্চর্য্যময়। যাঁহা হইতে জল উৎপন্ন হয়, আবার অগ্নিও হইয়া থাকে, অমৃত ও বিষ যাঁহা হইতে আবির্ভূত হয়, নিজে অবিকৃত থাকিয়া যিনি সকল বিকারের উপাদান হইয়া থাকেন, অনন্ত-শক্তিশালী সর্ব্ব-বিরোধের সমন্বয়ভূমি সেই ভগবানের স্বরূপ যাঁহারা কল্পনার দ্বারা নির্ণয় করিতে চাহেন, সেই সকল তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী দার্শনিকগণের নিকট এই সিদ্ধান্ত পরিস্ফুট ভাবে হৃদয়ঙ্গম না হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা ভোক্তৃত্বের সকল অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্ব্বক প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে তাঁহারই শরণ লইয়া তাঁহার জন্য জীবনের সকল বস্তু ত্যাগ করিতে উদ্যত, তাঁহাদের নিকট ভগবান্ পরিপূর্ণকাম হইলেও ভক্তের সেবা পাইবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত। তাই ভাগবত বলিতেছেন—

> "নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
> যদ্‌যদ্‌জনো ভগবতে বিদধীত মানং তচ্চাত্মনি প্রতিমুখস্য যথা মুখে শ্রীঃ ॥"

পূর্ণেরও পূজার অপেক্ষা

ইহার তাৎপর্য্য—"এই ভগবান্ কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া নিখিল সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন।

তিনি সর্ব্বদা নিজ লাভে পরিপূর্ণ, অজ্ঞ মানব কোন প্রকার পূজা প্রভৃতি সম্মান করিলে তাহার দ্বারা কিছু লাভ হইবে, এই বিবেচনায় কাহারও নিকট হইতে তিনি পূজা, সম্মান প্রভৃতি কামনা করেন না। কিন্তু যেহেতু তিনি করুণাময়, এই কারণে ভক্তের অভিপ্রায়ানুসারে তিনি সেই পূজা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া থাকেন। লোকে যে তাঁহাকে পূজা, মান, সৎকার প্রভৃতি করিয়া থাকে, সেই

সকল পূজা, মান, সংকার প্রভৃতির দ্বারা পূজকের আত্মপূজাই হইয়া থাকে, কারণ, ভগবানের সত্তা ব্যতিরেকে যখন জীবের পৃথক্ সত্তাই নাই, এই কারণে আত্মপূজা বা আত্মসম্মান করিতে হইলে ভগবানেরই পূজা বা সম্মান করা একান্ত আবশ্যক। যেমন দর্পণের মধ্যে প্রতিভাত প্রতিবিম্ব স্বরূপ যে মুখ, তাহাকে শোভিত করিতে হইলে দর্পণের বাহিরে অবস্থিত যে বিম্বভূত মুখ তাহাতেই তিলক-রচনা প্রভৃতি করিতে হয় এবং তাহা হইলে দর্পণগত প্রতিবিম্ব স্বরূপ মুখ আপনা হইতেই শোভিত হয়, সেইরূপ ভগবানের পূজা করিলে সেই পূজায় ভগবৎপ্রতিবিম্ব স্বরূপ জীবেরও পূজা হইয়া থাকে।"

এই শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবান্ আপ্তকাম ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়াও ভক্তের অভিলাষানুসারে ভক্ত-প্রদত্ত পূজা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া থাকেন। আত্মারামের, আত্মতৃপ্তের, পূর্ণেশ্বরের এই ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য যে সর্ব্বদা তৎপরতা, তাহাই হইল ভগবানের ভক্তের প্রতি করুণা। এ করুণা ভগবানের শক্তি-বিশেষ, ভক্তগণ ইহাকেই হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি-বিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই হ্লাদিনী শক্তির স্বরূপ কি, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে প্রীতিরূপা ভক্তির প্রকৃত তথ্য বুঝা যায় না, এই কারণে এক্ষণে সেই হ্লাদিনীর স্বরূপ আলোচিত হইতেছে।

শ্রীভগবানের ত্রিবিধ স্বরূপ-শক্তি

শ্রীভগবানের শক্তি-বিষয়ে বিচার-প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥"

ইহার অর্থ এই—"ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপভূত যে শক্তি তাহার নাম পরাশক্তি, জীবরূপিণী যে তদীয়া শক্তি, তাহাকে শাস্ত্রে ভোক্তৃশক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, তাহা তাঁহার অপরা শক্তি। তাঁহার আর একটি তৃতীয় শক্তি আছে, যাহার নাম অবিদ্যা শক্তি। যাহাকে কর্ম্মশক্তি বা ভোগ্যশক্তি বলিয়াও পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।" এই ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে পরা যে বিষ্ণুশক্তি অর্থাৎ স্বরূপভূতশক্তি তাহারই পরিচয় দিতে যাইয়া বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছে—

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥"

ইহার অর্থ—"হে ভগবন্, সকলের আশ্রয়স্বরূপ তোমাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ নামে অপ্রাকৃত স্বরূপভূত ত্রিবিধ শক্তি বিদ্যমান আছে। তুমি রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি প্রাকৃত-গুণবর্জ্জিত বলিয়া তোমাতে মায়িক হ্লাদকরী, তাপকরী ও হ্লাদতাপকরী মিশ্র শক্তি বিদ্যমান নাই।" উপনিষদ্ বলিতেছেন—"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" অর্থাৎ আনন্দকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিবে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম" অর্থাৎ ব্রহ্ম অবিনাশী, সত্য ও জ্ঞান-স্বরূপ।

সন্ধিনী ও সংবিৎ

এই উপনিষদ্ অনুসারে ব্রহ্ম সৎ, আনন্দ ও জ্ঞান-স্বরূপ। বিষ্ণুপুরাণে বলিতেছে, এই যে সৎ, আনন্দ ও জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম, ইহাতে ত্রিবিধ শক্তি বিদ্যমান আছে। সেই শক্তি ব্রহ্মের স্বরূপভূত শক্তি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শক্তি ও শক্তিমানের যে পরস্পর কি সম্বন্ধ আছে—তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ নিরূপণ করিতে পারে নাই, কারণ, শক্তি শক্তিমান্ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, ইহা বলা যায় না বা অত্যন্ত অভিন্ন, তাহাও বলা যায় না, অথচ ভিন্ন এবং অভিন্ন উভয়ই বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই কারণে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণ এই শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ অচিন্ত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং এতন্মূলক যে ভক্তিবাদ, তাহা লোকে অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ যে ভগবান্, তাঁহার স্বরূপভূত যে ত্রিবিধ শক্তি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সেই শক্তিত্রয়ের স্বরূপ কি, এক্ষণে তাহা বুঝা যাউক। ভগবান্ স্বয়ং একমাত্র সৎ হইয়াও যে শক্তির দ্বারা অপর বস্তুনিচয়কে সত্তাযুক্ত করিয়া থাকেন, সেই শক্তির নাম সন্ধিনী বলা যায়। তিনি স্বয়ং জ্ঞান-স্বরূপ হইয়া যে শক্তির দ্বারা অপর বস্তুনিচয়কে অর্থাৎ জীব সমূহকে জ্ঞানযুক্ত করিয়া থাকেন, সেই শক্তির নাম ভগবানের সংবিৎ শক্তি। এইরূপ তিনি স্বয়ং আনন্দ স্বরূপ হইয়াও যে শক্তি বশতঃ আত্মস্বরূপ আনন্দের অনুভব করেন আর অপরকে সেই আনন্দ অনুভব করাইয়া থাকেন, সেই শক্তির নাম হ্লাদিনী শক্তি। কার্য্য থাকিলে তাহার কারণ আছে আর কারণ থাকিলেই উহাতে সেই কার্য্যের অনুকূল শক্তি বিদ্যমান আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এ সংসারে আমরা দেখিতে পাই, কত কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে, উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহারা ছিল না, বা সৎ বলিয়া পরিগৃহীত হইত না। তাহারা উৎপত্তির পর যে সৎ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে এবং সেই সত্তা তাহাদের যখন সর্ব্বদা প্রতীত

হয় না, তখন সেই সত্তা তাহাদিগের যে শক্তি হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে, তাহাকে কে অস্বীকার করিতে পারে? এই যে অনন্ত প্রাপঞ্চিক কার্য্য নিবহের সত্তা-বিধায়িনী শক্তি ইহারই নাম শ্রীভগবানের সন্ধিনী শক্তি। এইরূপ জীব-নিবহের স্বতঃ চৈতন্যরূপতা থাকিলেও সেই চৈতন্যের দ্বারা সর্ব্বদা সকল বিষয়ের যে প্রকাশ হয়, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু কদাচিৎ কোন বিষয়ের প্রকাশ হয়, এই রূপই দেখিতে পাওয়া যায়। এই যে জীব-চৈতন্যের দ্বারা কোন কোন সময়ে কোন কোন বিষয়ের প্রকাশ বা জ্ঞান হইয়া থাকে, এই প্রকাশ বা জ্ঞানের কারণ যে ভগবান্ (কারণ, তিনি সর্ব্ব সংশ্রয়, সকল প্রকার কার্য্যের কারণ, এই প্রকাশও একটি কার্য্য, সুতরাং তিনি এই প্রকাশের কারণ) তাহাতে এই যে জীবগত আকস্মিক প্রকাশরূপ কার্য্যের অনুকূল শক্তি বিদ্যমান আছে, আপনাকে আপনার নিকট প্রকাশ করা এবং আপনার শক্তি হইতে সমুদ্ভূত প্রাপঞ্চিক সকল বস্তুকে জীবের নিকট প্রকাশ করা—এই শক্তিরই কার্য্য। ভগবানের এই স্বরূপ শক্তিটি সংবিৎ শক্তি নামে বিষ্ণুপুরাণে অভিহিত হইয়াছে। এইবার হ্লাদিনীর কথা বলিব।

(১৩)

হ্লাদিনী শক্তি আনন্দাস্বাদকারয়িত্রী

হ্লাদিনীর কথা বলিতেছি। শ্রীভগবান্ নিজে সুন্দর, যেমন তেমন সুন্দর নহেন—প্রাকৃতিক সকল সৌন্দর্য্যের যাহা সার, সেই অপ্রাকৃত সারভূত সৌন্দর্য্যের একমাত্র আধার। শ্রীভগবান্ যে শক্তির প্রভাবে আত্মানন্দের অনুভব করিয়া থাকেন এবং অপর সকলকে সেই আনন্দের অংশ অনুভব করাইয়া থাকেন, সেই শক্তির নামই ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কথাটা একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। এ সংসারে আমরা যাহাকে সুন্দর বলিয়া থাকি, তাহা যদি অপরের আনন্দানুভূতির কারণ না হয়, তবে তাহা কি কখনও সুন্দর বলিয়া অঙ্গীকৃত হইতে পারে? এ সংসারে সৌন্দর্য্য বলিয়া বাঁধাবাঁধি একটা কোন বস্তুই নাই। যে বস্তু যাহার আনন্দানুভূতির কারণ হয়, সেই বস্তু সেই ব্যক্তির নিকট সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। সুখভোগের সাধনতাই বস্তু-সৌন্দর্য্য। ইহাই যদি হইল সৌন্দর্য্যের স্বভাব, তাহা হইলে ভগবৎসৌন্দর্য্যেরও এইরূপ স্বভাবই অঙ্গীকার্য

করিতে হইবে, অর্থাৎ তাঁহার সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া যদি কাহারও সুখ না হয়, তবে তাহা কখনই সৌন্দর্য্য বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। এই কারণে ভগবানের আনন্দময় সৌন্দর্য্য আছে, তাহা অনুভব করাইবার জন্য যে শক্তি তাঁহার নিত্যসিদ্ধ, তাহারই নাম হ্লাদিনী শক্তি।

এই শক্তি তাঁহার স্বরূপ শক্তি বলিয়া অধ্যাত্মশাস্ত্রে পরিগণিত হইয়া থাকে। আনন্দ অনুভব করিতে হইলে অন্তঃকরণের যে অবস্থা বিশেষ একান্ত আবশ্যক, তাহা মানব হৃদয়ে যদি না থাকে, তাহা হইলে আনন্দানুভূতির অন্যান্য কারণ উপস্থিত থাকিলেও মানব আনন্দানুভব করিতে পারে না। এক কথায় বলিতে গেলে এই অবস্থা বিশেষকেই ভক্তিশাস্ত্রে প্রীতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, এই প্রীতি দুই ভাগে বিভক্ত, অর্থাৎ অভিলাষ বা আকাঙ্ক্ষা এবং অনুকূলতা। কথাটা এই হইতেছে যে, মানব যদি সুখাস্বাদের প্রতি অভিলাষী না হয় এবং সেই সুখের প্রতি তাহার চিত্তের আনুকূল্য বা প্রবণতা না থাকে, তাহা হইলে সে কখনই সুখের সৌন্দর্য্যময় যে স্বরূপ, তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। এই নিয়ম অনুসারে হ্লাদিনী শক্তিও জীব-হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের প্রতি আনুকূল্য ও সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার অভিলাষ রূপ যে মনোবৃত্তিদ্বয়, তাহা উৎপাদন করিয়াই জীবকে ভগবৎ-সৌন্দর্য্য অনুভব করাইয়া থাকে, ইহা বাধ্য হইয়া সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এ সংসারে এমন কোন জীব নাই যে সুখের আস্বাদন করে নাই বা সুখের আস্বাদ করিতে বিমুখ হইয়া থাকে।

আনন্দস্বভাব জীবের দুঃখ কেন

শ্রুতি বলিতেছেন ;—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি।"

অর্থাৎ প্রাণিসমূহ আনন্দ হইতেই আবির্ভূত হইয়া থাকে এবং এই সংসার ছাড়িয়া আবার সেই আনন্দেই মিশিয়া যায়।

এ সংসারে সকল জীবের জীবন এই শ্রুতিনির্দ্দেশ অনুসারে আনন্দময় হইবার কথা। আনন্দময় পরমাত্মাকে ছাড়িয়া দিলে, যখন কোন বস্তুরই সত্তা থাকে না, তখন প্রত্যেক বস্তুতেই যে সেই আনন্দময় পরমাত্মা সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমরা সংসারী জীব, কৈ, তাহা ত বুঝি

না? আমরা দেখি, চারিদিকে দুঃখের—শোকের অপার সমুদ্র, যে সমুদ্রে আকাঙ্ক্ষা, উৎকণ্ঠা, আবেগ, বিষাদ ও অবসাদের প্রত্যেক তরঙ্গে তরঙ্গে, ঘাত-প্রতিঘাতে নিরন্তর ভীতির যন্ত্রণাময় ব্যাকুলতা। সচ্চিদানন্দের নিত্য-লীলানিকেতন সুখের সংসারে এ অপার অনন্ত দুঃখসমুদ্র আসিল কোথা হইতে? এ প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য, এই দুঃখসমুদ্র শুষ্ক করিবার জন্য, বড বড় দার্শনিকগণ কত চেষ্টাই করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোন চেষ্টাই সংসারী জীবের দুঃখব্যাকুল হৃদয়ে সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত শান্তি আনয়ন করিতে সমর্থ হয় নাই।

দুঃখের মূল অবিদ্যা বা ভেদজ্ঞান

জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন, জীব নিজের অজ্ঞানের ফলে দুঃখভোগ করে। সে যদি নিজে ধ্যান, ধারণা ও সমাধি প্রভৃতির বলে চিত্ত স্থির করিয়া আত্মস্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেই তাহার অজ্ঞান দূর হয় এবং সেই অজ্ঞানমূলক সকল দুঃখও মিটিয়া যায়। কথাগুলি শুনিতে বেশ, কিন্তু তলাইয়া বুঝিতে গেলে ভিতরে কোন সারই দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি যদি ব্রহ্মস্বরূপ হই, তবে আমাতে সকল দুঃখের মূল অজ্ঞান প্রথমে আসিল কিরূপে? ইচ্ছা করিয়া এই সকল অনর্থের মূল অজ্ঞানকে আমি বরণ করিয়া লইয়াছি, ইহা ত কখনই সম্ভবপর নহে। আমি ভিন্ন আর কেহ যদি আমার দুঃখের কারণ হয়, তাহা হইলে আমি ধ্যান, ধারণা ও সমাধি প্রভৃতি করিয়া এ দুঃখ নাশ করিলেই বা কি হইবে? আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার স্কন্ধে দুঃখ চাপাইবার সামর্থ্য যাঁহার আছে, তিনি যদি ঐ সব দুঃখ আবার আমাকে দেন, তখন আমি করিব কি? জ্ঞানী হয়ত বলিবেন, দুঃখ বলিয়া একটা কোন বস্তুই যখন নাই, একমাত্র ব্রহ্মই যখন সৎ এবং আর সকলই অসৎ, তখন অসতের জন্য এত ভাবিয়া আকুল হও কেন? অসৎকে অসৎ ভাবিয়া উড়াইয়া দিলেই ত সব আপদ্—সব কষ্ট দূর হয়। সাংসারিক জীব ইহার উত্তরে বলিবে, অসৎকে অসৎ বলিয়া বুঝিবার সামর্থ্য আমার কোথায়? যেদিন হইতে সংসারে আসিয়াছি, সেইদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত কত যুগ চলিয়া গেল, তাহার ইয়ত্তা নাই, এই অসৎ বস্তুনিচয়কে আমি সৎ বলিয়াই বুঝিয়া আসিতেছি। শুধু কি আমিই বুঝি? তুমি তত্ত্বোপদেশকারী জ্ঞানী, তুমিও কি ইহা বুঝ না? এই সকল বস্তুকে

সত্য সত্যই অসৎ বলিয়া যদি তুমি বুঝিতে, তাহা হইলে এ ব্যবহারের রাজ্যে তুমি কেন থাকিবে? তুমিই বলিয়া থাক, ভেদজ্ঞান সকল ব্যবহারের মূল; এই ভেদজ্ঞান যাহার নাই, সে সকল প্রকার ব্যবহারের অতীত।

ভেদজ্ঞানেই করুণা সম্ভব

ভেদ-জ্ঞানই ত মিথ্যা-জ্ঞান অর্থাৎ অসত্য বস্তুকে সত্য বলিয়া বুঝা। এ মিথ্যা-জ্ঞান না থাকিলে গুরুশিষ্যভাব থাকে না; তাই যদি না থাকিল, তবে তুমি তত্ত্বোপদেশক হইয়া গুরুর পদে বসিয়াছ কেন? ইহা কি মিথ্যা ব্যবহার নহে? তুমি তত্ত্বজ্ঞানী, হয়ত ইহার উত্তরে বলিবে যে, মোহসমুদ্রের আবর্ত্তে নিপতিত দুঃখভারক্লিষ্ট সাংসারিক জীবনিচয়কে দেখিয়া তোমার হৃদয়ে করুণার উদয় হইয়াছে; সেই করুণার বশবর্ত্তী হইয়াই দুঃখনিমগ্ন জীব-নিবহের উদ্ধারের জন্য তুমি তত্ত্বোপদেশক হইয়াছ। এ উত্তরও কিন্তু অসার, কারণ, ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত সকল বস্তুই যাহার নিকট মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইয়াছে, তাহার হৃদয়ে করুণা আসিবে কোথা হইতে? ভেদ-জ্ঞান না থাকিলে জীবহৃদয়ে করুণার উদয় হয় না, ইহা কি তুমি অস্বীকার করিবে? যেখানে করুণা আছে, তোমার মতে সেখানে ভেদ-জ্ঞান ও তাহার মূলভূত অজ্ঞানও আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিবে। সুতরাং তোমার মতে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ কখনই করুণাময় হইতে পারে না।

সতের আশ্রয়ে সকলই সৎ

এই সকল তর্কের দ্বারা ব্যাকুলমতি জীবনিবহের উদ্ধারের জন্য যাহা প্রকৃত সাধন, তাহা অদ্বৈতবাদীর উপদিষ্ট হইতে পারে না। ভক্তিসিদ্ধান্ত অনুসারে এই সকল তর্ক নিরাসপূর্ব্বক সংসারতাপদগ্ধ জীবের হৃদয়ে শান্তি দিবার যাহা সাধন বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাহাকে হ্লাদিনী শক্তির পরিণতি বা ভগবৎপ্রীতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, এ সংসারে কোন বস্তুই অসৎ বা মিথ্যা নহে। আনন্দস্বরূপ ভগবান্ আত্মানন্দ স্বয়ং অনুভব করিবার জন্য এবং সেই সঙ্গে জীবসমূহকে সেই আনন্দ অনুভব করাইবার জন্য সর্ব্বদা নিজ স্বরূপভূত হ্লাদিনী শক্তির প্রেরণা করিয়া থাকেন। এ প্রেরণাও আবার সেই হ্লাদিনীরই পরিণতিবিশেষ। তিনি যখন সর্ব্বাশ্রয়, নিখিল প্রপঞ্চ যখন তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে, তখন সৎ ও অসতের পরস্পর সম্বন্ধ হইতে

পারে না বলিয়াই এ সংসারে কোন বস্তুই একেবারে কল্পিত বা অসৎ হইতে পারে না। দুঃখের অনুভব যাহার নাই, সুখ বা শান্তি তাহার প্রিয় হইতে পারে না। যাহার নিকট দুঃখ একেবারে অসৎ বলিয়া প্রতীত হয়, সুখও তাহার নিকট পরমার্থ সৎ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

সর্ব্বস্বরূপ পরমাত্মা

শ্রীভগবান্ এ সংসারে সকল বস্তুরই উৎপাদয়িতা, পালয়িতা ও সংহারকর্ত্তা, ইহা ত সকল শাস্ত্রই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকে। তিনি গুণনিচয়েরই সৃষ্টি করেন, দোষসমূহ তাঁহার সৃষ্টি নহে, এ প্রকার সিদ্ধান্ত কখনই শ্রুতিসম্মত হইতে পারে না। কারণ শ্রুতি নিঃসন্দিগ্ধভাবে বুঝাইতেছে ;—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি,
যৎ প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব।"

এই শ্রুতিবাক্যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম সকল বস্তুই ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন, ঈশ্বরে অবস্থিত এবং শেষে আবার ঈশ্বরেই প্রলীন হয়, ইহা স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিতেছে। বৃহদারণ্যক শ্রুতি আরও স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিতেছে ;—

"স বিশ্বকৃৎ সহি সর্ব্বস্য কর্ত্তা তস্য লোকঃ স উ লোক এব॥"

অর্থাৎ তিনি বিশ্ব-নির্ম্মাতা, তিনিই সকল বস্তুর কর্ত্তা, এই সকল লোক তাঁহারই, আবার তিনিই এই সকল লোকস্বরূপ। কৈবল্যোপনিষদ্ বলিতেছে ;—

"স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্।
জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে॥"

অর্থাৎ সেই পরমাত্মাই সর্ব্বস্বরূপ, যাহা অতীত বা যাহা ভবিষ্যৎ, তাহা সকলই সেই নিত্য পরমাত্মার স্বরূপ ; সেই পরমাত্মাকে জানিয়াই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে, তাহা ছাড়া বিমুক্তির আর কোন পথ নাই।

এই সকল শ্রুতির দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, এ সংসারে এমন কোন বস্তুই নাই, যাহা পরমাত্মা হইতে পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে। সুতরাং এ জগৎ মায়িক, ইহা কল্পনাপ্রসূত মিথ্যা, পরমাত্মার সহিত ইহার কোনপ্রকার সম্বন্ধই নাই—এইপ্রকার অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভক্তিসিদ্ধান্তের অনুকূল নহে এবং বেদার্থ জ্ঞানের প্রকৃষ্ট সাধন পুরাণশাস্ত্রেরও সম্মত নহে। পুরাণশাস্ত্র স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে যে, এ সংসারে সৎ বা অসৎ বলিয়া যাহা কিছু প্রসিদ্ধ আছে, তাহা সকলই সেই পরমাত্মা

হইতে অভিন্ন, তাঁহার স্বরূপশক্তির পরিণতি ; সুতরাং সেই সকল বস্তুর মধ্যে কোনটি অজ্ঞানকল্পিত অর্থাৎ শুক্তিতে কল্পিত রজতাদির ন্যায় মিথ্যা নহে। মার্কণ্ডেয় পুরাণও তাই বলিতেছে ;—

"যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা ॥"

অর্থাৎ হে সর্ব্বস্বরূপে ! এই সংসারে যে কোন স্থানে সৎ বা অসৎ বলিয়া যে কোন বস্তু প্রসিদ্ধ আছে, সেই সকল বস্তুর উৎপত্তি যে শক্তি হইতে হয়, তুমিই সেই শক্তি। এই প্রকার অনন্ত অসীম শক্তি যাহার স্বরূপ, সেই তোমাকে আমি কি বলিয়া স্তুতি করিব ?

সর্ব্বকর্ম্মের প্রেরয়িতা

এইপ্রকার বহু প্রমাণ উদ্ধৃত হইতে পারে, বিস্তারভয়ে তাহা করা গেল না। এই সকল শ্রুতি ও পুরাণ প্রভৃতির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, এই সংসারে যাহা কিছু হয়, তাহা সকলই সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই হয় এবং তাঁহারই ইচ্ছানুসারে সেই সকল বস্তুই বিলয়প্রাপ্ত হয়। তাহাই যদি হইল, তবে ইহাও স্থির যে, এ সংসারে ভ্রান্ত জীবগণ যে নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে, তাহাও ভগবদিচ্ছানুসারেই হইয়া থাকে। উপনিষদ্‌ও অতি স্পষ্ট ভাষায় তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছে ;—

"এষ এব তং সাধু কর্ম্ম কারয়তি, যমুত্তমং লোকং নিনীষতি।
এষ এব তমসাধু কর্ম্ম কারয়তি যমধো নিনীষতি ॥"

অর্থাৎ সেই পরমাত্মাই তাহাকে সাধুকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন—যাহাকে তিনি উত্তমলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন ; আবার তিনি যাহাকে অধোগামী করিতে চাহেন, তাহাকে অসাধুকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন।

অধ্যাত্মশাস্ত্রের সারভূত গ্রন্থ ভগবদ্‌গীতাও বলিতেছে ;—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥"

অর্থাৎ সকল জীবের হৃদয়প্রদেশে অন্তর্যামিস্বরূপ শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই বিরাজমান রহিয়াছেন ; তিনি নিজ মায়াশক্তিপ্রভাবে কর্ত্তৃত্বাভিমানরূপ যন্ত্রে আরূঢ় করাইয়া সকল প্রাণীকেই এই সংসারচক্রে পরিভ্রান্ত করিতেছেন।

ঈশ্বরবাদের সিদ্ধান্ত

ইহাই হইল ঈশ্বরবাদের চরমসিদ্ধান্ত। এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড-পরিপূরিত অপার অনন্ত সংসারে প্রত্যেক পরমাণুর স্পন্দন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ, নক্ষত্র ও ব্রহ্মাণ্ডের গতি, স্থিতি ও বিলয়ের প্রত্যেক ব্যাপার তাঁহারই ইচ্ছানুসারে সংঘটিত হইয়া থাকে। তাঁহার ইচ্ছা না হইলে একটি পরমাণুকেও স্থানভ্রষ্ট করিতে পারে, এরূপ শক্তি কোন জড়বস্তু বা চেতনে সম্ভবপর নহে। এই বিশাল কার্য্যকারণভাবের অনাদি শৃঙ্খলে নিয়মিত প্রত্যেক বস্তুই সেই কারণত্রয়হেতু মহেশ্বরেব অনাদি ও অনন্ত বিচিত্র মহিমময় লীলার ইচ্ছাকল্পিত উপকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনিই জীবের অন্তঃকরণে কর্ত্তৃত্বের অভিমান জাগাইয়া ভোগাভিলাষের চরিতার্থতাবিধান করেন এবং তিনিই ত্রিতাপতাপিত জীবহৃদয়ে বৈরাগ্যের শান্তিময় প্রস্রবণ সৃষ্টি করিয়া নিজ প্রেমানন্দময়ী অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া থাকেন। তিনি ছাড়া এ সংসারে আর কেহ কর্ত্তা, ভোক্তা বা জ্ঞাতা কখনও ছিল না, এখনও নাই, কখনও হইবে না। তাই প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে আত্মলীলার বিচিত্র বৈভব বুঝাইতে উদ্যত হইয়া শ্রীভগবান্ গীতায় স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ;—

> "উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
> পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥"
> "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
> প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥"

অর্থাৎ সেই পরমপুরুষই জীবের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া সকল বস্তুই দেখিয়া থাকেন, জীবের প্রত্যেক কার্য্যে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির অনুমতি তিনিই দিয়া থাকেন, তিনিই সকল বস্তুকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, আবার তিনিই সকলের পরিপোষণ করিয়া থাকেন। কেবল ঈশ্বররূপে রক্ষা বা পোষণ করেন, তাহা নহে। তিনিই আবার জীবরূপে সকল দেহে সুখ-দুঃখ ভোগও করিয়া থাকেন, অথচ তিনিই মহেশ্বর, এই দেহের মধ্যে তিনিই পরমাত্মা বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়া থাকেন। তিনিই অন্তর্যামিরূপে সকলের সৎ বা অসৎ কর্ম্মের সাক্ষী হইয়া থাকেন, তাঁহাতেই সকল বস্তু অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, তিনি সকলের রক্ষাকারী, কারণ তিনি সকলের সুহৃৎ ; তিনিই সকল বস্তুর

উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ করিয়া থাকেন, কারণ, তিনিই এই সংসাররূপ অপরিমেয় বৃক্ষের একমাত্র অবিনাশী বীজ।

মায়াশক্তি ও হ্লাদিনীর ক্রিয়া

তাঁহার এই বিচিত্র লীলাময় বিশ্বসৃষ্টির মূলে যে শক্তির প্রেরণায় তিনি আনন্দময়, আনন্দঘন ও রসময় পুরুষ হইয়াও, এই সংসারে নিজাংশ জীবরূপে প্রবিষ্ট হইয়া ইচ্ছা করিয়া দেহাত্মাভিমানের দাবাগ্নি সৃষ্টি করিয়া অনন্ত দুর্ব্বিষহ দুঃখ ভোগ করিতেছেন, সেই মহামহিমময়ী বিশ্ব-কল্যাণকারিণী তাঁহার স্বরূপশক্তিরই নাম হ্লাদিনীশক্তি। ইহাই ত হ্লাদিনী শক্তির স্বভাব যে, তাহা নিজেই বহিরঙ্গ মায়াশক্তির প্রেরণা দ্বারা দুঃখ সৃষ্টি করিয়া, দুঃখের দারুণ সন্তাপজ্বালাময় ভীষণ অগ্নিতে আত্মভূত জীবের দুরভিমান-কঠোর নীরস হৃদয়কে দ্রবীভূত করিয়া বিশুদ্ধ করিয়া দেয়, আর সেই বিশুদ্ধ হেমসম দ্রুত হৃদয়ে স্বীয় চরম পরিণতিস্বরূপ প্রেমমুদ্রা গাঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া অনাবিল সুখশান্তি ও প্রসাদের অবিনাশিভাবে জীবনিবহকে চিরসমাবিষ্ট করিয়া রাখে, ইহাই ত হইল হ্লাদিনীর অসাধারণ স্বভাব। এই হ্লাদিনীর দুরবগাহ গম্ভীর স্বভাব বুঝাইতে যাইয়া ভক্তকুলধুরন্ধর গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কিরূপ প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্য অবলম্বন করিয়াছেন, এইবার তাহাই অবতারিত হইতেছে।

(১৪)

সন্ধিনীর সার সংবিৎ

ভাগবতসন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামী হ্লাদিনীর পরিচয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"তথা হ্লাদরূপোঽপি যয়া সংবিদুৎকর্ষরূপয়া তং হ্লাদং সম্বেত্তি সম্বেদয়তি চ সা হ্লাদিনীতি বিবেচনীয়ম্।" অর্থাৎ "সেইরূপ ভগবান্ আনন্দস্বরূপ হইয়াও পূর্ব্বকথিত সংবিৎ নামক স্বরূপশক্তির উৎকর্ষরূপ যে শক্তির দ্বারা সেই আত্মানন্দকে স্বয়ং অনুভব করেন এবং অপরকে অনুভব করাইয়া থাকেন, সেই শক্তি হ্লাদিনী বলিয়া কথিত হয়।" এই উক্তির দ্বারা বুঝা যায় যে, হ্লাদিনীকে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সংবিৎ শক্তির উৎকর্ষ বলিয়া বিবেচনা করেন। অর্থাৎ ভগবানের যে ত্রিবিধ শক্তির

কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যথা সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী, তাহাদিগের মধ্যে সন্ধিনীর সারাংশকে যেমন সংবিৎ বলা হয়, সেইরূপ সংবিৎ-এর সারাংশকেও হ্লাদিনী বলা যাইতে পারে। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের এই প্রকার উক্তির মূলে যে রহস্য নিহিত রহিয়াছে, তাহাই অগ্রে বুঝিতে হইবে। ভগবান্ স্বয়ং পূর্ণ সৎ হইয়াও মায়াকল্পিত বস্তুনিচয়কে যে শক্তির দ্বারা সত্তাযুক্ত করিয়া থাকেন, তাহাই সন্ধিনী শক্তি, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সংবিৎ শক্তি এই সন্ধিনী শক্তির সার বা উৎকর্ষ। কারণ, সংবিৎ শক্তির যাহা অসাধারণ কার্য্য অর্থাৎ প্রকাশ, তাহার সহিত যদি পারমার্থিক বা ব্যবহারিক সদ্বস্তুর সম্বন্ধ না হয়, অর্থাৎ সদ্বস্তু যদি কাহারও নিকট প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে ফলতঃ তাহা শূন্য বা অলীক হইয়া পড়ে। সর্ব্বথা অপ্রকাশিত বস্তু কিছুতেই সৎ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না; সুতরাং যে সন্ধিনী শক্তির প্রভাবে বস্তু সত্তার আশ্রয় হইয়া থাকে, সেই সন্ধিনীই নিজের কার্য্যকে সিদ্ধ করিবার জন্য যে শক্তির আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়, তাহাই সন্ধিনীর সার বা উৎকর্ষ ছাড়া আর কি হইতে পারে?

সংবিত্তের সার হ্লাদিনী

একই ভগবান্ শক্তিত্রিতয়াত্মক, সুতরাং তাঁহাতে শক্তিত্রয়ের যে পরস্পর ভেদ, তাহাও তাঁহার স্বকীয় উৎকর্ষের অভিব্যক্তি—তারতম্য ব্যতিরিক্ত আর কিছুই হইতে পারে না। এই ভাবে ভগবানের প্রকাশানুকূল যে সংবিৎ শক্তি আছে, সে শক্তিও যদি নিজ প্রকাশরূপ কার্য্যকে আনন্দময় করিয়া না তুলিতে পারে, তাহা হইলে সে প্রকাশও নিষ্ফল বা অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠে। যাহা সৎ, তাহা যেমন প্রকাশিত না হইলে প্রকৃতপক্ষে সৎই হইতে পারে না, সেইরূপ যাহা প্রকাশ তাহা যদি আনন্দময় না হয়, তাহা হইলে সে প্রকাশও অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।" অর্থাৎ "প্রাণিসমূহ আনন্দ হইতেই আবির্ভূত হইয়া থাকে, আনন্দের দ্বারাই জীবিত থাকে এবং এ সংসার ছাড়িয়া আবার সেই প্রকাশময় আনন্দেই মিশিয়া যায়।"

আত্মানন্দের আস্বাদে তিনি রসস্বরূপ

এই আনন্দময় প্রকাশের জন্যই এ সংসার সৃষ্ট হইয়াছে, আনন্দ ইঁহার

আদিতে, আনন্দ ইহার মধ্যে এবং আনন্দই ইহার অন্তে। সুতরাং এই আনন্দানুভব করাইবার জন্যই ভগবানের যে শক্তি সর্ব্বদা ব্যাপৃত রহিয়াছে, তাহাই হ্লাদিনী এবং তাহাকেই সংবিৎ শক্তির উৎকর্ষ বলিয়া শ্রীজীব গোস্বামী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আনন্দময় পরমাত্মা আপনারই অংশস্বরূপ জীবনিচয়কে আত্মানন্দ অনুভব করাইয়া স্বয়ং তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং সেই তৃপ্তি-লাভের অনুকূল যে শক্তি তাঁহার স্বরূপভূত এবং অন্যান্য সকল শক্তি অপেক্ষা যাহা উৎকৃষ্ট, সেই শক্তির নাম হ্লাদিনী। এই হ্লাদিনী শক্তি তাঁহাতে আছে বলিয়াই শ্রুতিতে তিনি রস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। রস কাহাকে বলে? আস্বাদ্যমান আনন্দকেই শাস্ত্র রস বলিয়া নির্দ্দেশ করে। মানব যখন এ আনন্দের আস্বাদন করে, তখন তাহার অন্তঃকরণে যে সকল অনুকূল বৃত্তি বা ভাব সমুদিত হইয়া থাকে, সেই সকল ভাব বা মনোবৃত্তিনিচয়ও হ্লাদিনীর কার্য্য, ইহা বুঝিতে হইবে। তাই ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এষ নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতং, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

অর্থাৎ "সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি, অখিলের অর্থাৎ জীবের আত্মভূত হইয়াও যিনি সর্ব্বদা গোলোকেই বাস করিয়া থাকেন এবং আত্মস্বরূপ অর্থাৎ আনন্দময় ও চিন্ময় যে রস, তাহার দ্বারা পরিভাবিত এবং আপনারই রূপে উদ্ভাসিত যে কলাসমূহ, তাহার দ্বারা যিনি সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত, সেই আনন্দময় রসরূপ দেবতাই গোবিন্দ, তিনিই আদিপুরুষ, তাঁহাকেই আমি ভজনা করি।"

সর্ব্বজীবের আত্মভূত

ব্রহ্মসংহিতার এই শ্লোকটির তাৎপর্য্যার্থ অতি গভীর; নিরাকার, চিন্ময় ও আনন্দময় পুরুষকে রসরূপে আস্বাদন করিতে হইলে তাঁহাকে আকারবান্ ও রূপবান্ করিয়া লইতে হয়, নাহলে তাঁহাতে রসরূপতাই যে আসিতে পারে না, তাহাই এই শ্লোকটিতে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আনন্দ নিজ কলাসমূহের দ্বারা বেষ্টিত, আবার সেই সব কলা বা অংশ সেই চিন্ময় রসময় আনন্দের দ্বারা পরিভাবিত বা সমুজ্জীবিত হইয়াছে, একরূপ আনন্দ বহুরূপযুক্ত হইয়া গোলোকে অর্থাৎ প্রকাশময় লোকে বিরাজমান, অথচ তিনি সকল জীবের আত্মভূত হইয়াই সর্ব্বদা বিরাজমান রহিয়াছেন। এই যে

ভগবত্তত্ত্ব, ইহাই হইল রস, এই রসের পরিচয় দিতে যাইয়া উপনিষদ্ বলিতেছেন—

"রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দীভবতি।
কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদ্যেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ॥"

অর্থাৎ তিনিই রস, এই সংসারের তাপদগ্ধ জীব তাঁহাকে যখনই পায়, তখনই সে আনন্দময় হয়। আকাশের ন্যায় ভূমা এই আনন্দই রস, যদি এই রস না থাকিত, তাহা হইলে এ সংসারে কে স্পন্দিত হইত? কেই বা জীবিত থাকিতে পারিত?

রসানুভূতিতে একাত্মতা

এই আনন্দময় রস যখন প্রেম-সূর্য্যের নবোদিত কিরণে বিকশিত ভক্তের হৃদয়কমলে আবির্ভূত হয়, তখন অদর্শনের আবেগ, দর্শনের জড়তা, বিরহের উৎকণ্ঠা, মিলনের তৃপ্তি, ভয়ের ব্যাকুলতা, চিন্তার অবসাদ, আশার প্রফুল্লতা প্রভৃতি রসময় ভাবগুলি আরতি-প্রদীপের মত শত শত ভাবে দীপ জ্বালাইয়া তাঁহার আরতি করিতে থাকে। এই আত্মানন্দময় রসের আস্বাদনের সময় 'তুমি' 'আমি' এ ভেদবুদ্ধি থাকে না। অথচ অলৌকিক আস্বাদন থাকে। এই অবস্থার বর্ণন-প্রসঙ্গে ভগবান্ চৈতন্যদেবের প্রিয়পার্ষদ রামানন্দ রায় বলিয়াছেন—

"অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূৎ।
মনোবৃত্তির্লুপ্তা ত্বমহমিতি নৌ ধীরপি তথা।
ভবান্ ভর্ত্তা ভার্য্যাহমিতি যদিদানীং ব্যবসিতিঃ
তথাপি প্রাণানাং স্থিতিরিতিবিচিত্রং কিমপরম্॥"

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ—"এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন আমি কান্তা, তুমি আমার কান্ত, এই প্রকার নিশ্চয় অন্তর্হিত হইয়াছিল, অন্তঃকরণ বৃত্তিরহিত হইয়াছিল, তুমি বা আমি এ প্রকার জ্ঞানও লুপ্ত হইয়াছিল, আর এখন তুমি স্বামী, আমি ভার্য্যা, এইরূপ নিশ্চয় দৃঢ় হইয়াছে, এমন হওয়ার পরও যে এ দেহে প্রাণ রহিয়াছে, ইহা অপেক্ষা বিস্ময়জনক ব্যাপার আর কি হইতে পারে?"

হ্লাদিনীর পরাকাষ্ঠা শ্রীরাধা

এই যে রসরূপ পুরুষের অপূর্ব্ব আস্বাদন, ইহাই হইল ভক্তির চরম অবস্থা

বা হ্লাদিনীর পূর্ণ বিকাশ। বৈষ্ণব কবি কবিরাজ গোস্বামী ইহারই পরিচয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম সার ভাব।
ভাবের পরম কাষ্ঠা হয় মহাভাব ॥
মহাভাবরূপা হন রাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণমণি কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি ॥"

প্রেম অর্থাৎ প্রিয়তমের প্রতি হৃদয়ের দ্রবীভাবময় অনুকূলতা, ইহাই হইল হ্লাদিনীর সার। সৌন্দর্য্যের অনুভব একবার করিতে পারিলে তাহার প্রতি অন্তঃকরণের যে ঐকান্তিক অনুকূলতা, তাহাই প্রেম বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহা হ্লাদিনীরই বৃত্তি বা পরিণতি। মানবের মনে এ প্রেম আবির্ভূত হয়, কিন্তু উৎপন্ন হয় না, কারণ, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রেম নিত্য স্ফুরণ; জীব-হৃদয়ে সুন্দর বস্তুকে উপভোগ করিবার যে অভিলাষ, তাহা এই প্রেমের অভিব্যক্তির পূর্ব্বাভাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। বেদান্তদর্শনের জ্ঞান নিত্য হইলেও তাহার অভিব্যঞ্জক মনোবৃত্তি উৎপন্ন হয় বলিয়া জ্ঞানকেও উৎপন্ন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়; সেইরূপ ভক্তিশাস্ত্রে হ্লাদিনীর বৃত্তিস্বরূপ প্রেম নিত্য হইলেও তাহার অভিব্যঞ্জক জীবের অভিলাষ বা কাম সময়ে সময়ে উৎপন্ন হয় বলিয়া সেই প্রেমকেও উৎপন্ন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। প্রেম জীব-হৃদয়ে অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে কাম বা অভিলাষের মূর্ত্তিতেই প্রথমে প্রকাশ পায় বলিয়া প্রাকৃত জনগণ প্রেম ও কামকে একই বলিয়া ধরিয়া লয়—কিন্তু বাস্তবিক ইহাদিগের মধ্যে অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রীতিসন্দর্ভে প্রেম ও কামের প্রভেদ

ভাগবত-সন্দর্ভরচয়িতা বৈষ্ণবপরমাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী প্রেম ও কামের স্বরূপ ও পরস্পর বৈলক্ষণ্য অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

"অথ কান্তোঽয়মিতি প্রীতিঃ কান্তভাবঃ। এষ এব প্রিয়তাশব্দেন শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ পরিভাষিতঃ।......লৌকিকরসিকৈরত্রৈব রতিসংজ্ঞা স্বীক্রিয়তে। এষ এব কামতুল্যত্বাৎ শ্রীগোপিকাসু কামাদিশব্দেনাপ্যভিহিতঃ। স্মরাখ্যকাম-বিশেষস্ত্বন্যঃ, বৈলক্ষণ্যাৎ। কামসামান্যং খলু স্পৃহাসামান্যাত্মকম্। প্রীতি-সামান্যন্তু বিষয়ানুকূল্যাত্মকস্তদনুগতবিষয়স্পৃহাদিময়ো জ্ঞানবিশেষ ইতি লক্ষিতম্। ততো দ্বয়োঃ সমানপ্রায়চেষ্টত্বেঽপি কামসামান্যস্য চেষ্টা স্বীয়ানুকূল্য-

তাৎপর্য্যা। তত্র কুত্রচিদ্বিষয়ানুকূল্যঞ্চ স্বসুখকার্য্যভূতমেবেতি তত্র গৌণবৃত্তিরেব প্রীতিশব্দঃ। শুদ্ধপ্রীতিমাত্রস্য চেষ্টা তু প্রিয়ানুকূল্যতাৎপর্য্যৈব। তত্র তদনুগতমেব চাত্মসুখমিতি মুখ্যবৃত্তিরেব প্রীতি শব্দঃ।"—প্রীতিসন্দর্ভ।

তাৎপর্য্য—"ইনি কান্ত, এই কারণে ইঁহার প্রতি যে প্রীতি, তাহাই কান্তভাব। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু নামক গ্রন্থে এই প্রীতি প্রিয়তা শব্দের দ্বারা পরিভাষিত হইয়াছে।............লৌকিক রসিকগণও ইহাকেই রতি বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। কামের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে বলিয়া শ্রীগোপিকাগণের এই প্রীতিই কাম প্রভৃতি শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। স্মরনামে প্রসিদ্ধ যে কাম, তাহা কিন্তু এই প্রীতি হইতে ভিন্ন, কারণ, তাহা ইহা হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ। কামের সামান্যতঃ স্বরূপ হইতেছে এই যে, উহা স্পৃহাত্মক। প্রীতির সামান্যতঃ স্বরূপ এই যে, উহা বিষয়ের প্রতি অনুকূলভাব, শুধু তাহাই নহে, সেই বিষয়ের সহিত যাহার যাহার সম্বন্ধ আছে, সেই সকল বস্তুর প্রতি স্পৃহাও এই আনুকূল্যের মধ্যে প্রবিষ্ট, ইহা যে কেবল বিষয়ের প্রতি আনুকূল্য, তাহাই নহে, পরন্তু ইহা যে স্ফূর্ত্তি বা প্রকাশময়, তাহাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাহাই যদি হইল, তবে কামের ও প্রীতির চেষ্টা প্রায় সমান হইলেও আত্মার অর্থাৎ নিজের সুখ হউক, এই উদ্দেশ্যে যে চেষ্টা হইয়া থাকে, তাহাই কামের চেষ্টা। কোন স্থলে কামের চেষ্টা যদিও বিষয়ের প্রতি আনুকূল্যের কারণ হয়, তথাপি উহা তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, আত্মার সুখ বা তৃপ্তিই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইয়া যায় এই মাত্র, সুতরাং কামের যে বিষয়, তাহার সুখ বা আনুকূল্য, কাম-চেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য হয় না, কিন্তু তাহা তাহার গৌণ উদ্দেশ্য হইতে পারে। এই কারণে সেই কামকে বুঝাইবার জন্য যদি প্রীতি শব্দের প্রয়োগ হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, ঐ স্থলে প্রীতি মুখ্য অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, কিন্তু গৌণ অর্থকে বুঝাইবার জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহা কিন্তু বিশুদ্ধ প্রীতি বা প্রেম, তাহার যে চেষ্টা, তাহার উদ্দেশ্য একমাত্র প্রিয়তমেরই আনুকূল্য বা সুখ, সেই সুখ হইলেই স্বতঃসিদ্ধ নিয়মবশে তাহার নিজ সুখ উদিত হয় এই মাত্র। তাই বলিয়া নিজ সুখ কখনও তাহার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হয় না; এই কারণে এইরূপ স্থলেই প্রীতি শব্দটি মুখ্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।"

কামের প্রেমপরিণতি হ্লাদিনীর কার্য্য

প্রীতিসন্দর্ভে কাম ও প্রীতির যেরূপ লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই চরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামী অতিবিশদভাবে এই কাম ও প্রীতির বৈলক্ষণ্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

"কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম।
আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম॥"
"প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাঁহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ॥"

এই প্রেম বা প্রীতিই হ্লাদিনীর সার বৃত্তি। নিত্য সুন্দর—লাবণ্যের সার—মাধুর্য্যের পার—চিদানন্দময় ভগবদ্‌বিগ্রহকে ভক্তহৃদয়ে প্রকাশিত করা যেমন হ্লাদিনীর কার্য্য, সেইরূপ সেই বিগ্রহের প্রতি ভক্তহৃদয়ে প্রীতি বা প্রেমের আবির্ভাব করানও হ্লাদিনীর কার্য্য, কারণ, তাহা না হইলে হ্লাদিনীর প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না ; ভগবান্ নিরবধি আনন্দস্বরূপ হইলেও সেই আত্মানন্দ অনুভব করাইয়া জীবের জীবন সার্থক করিবার জন্য সর্ব্বদা যে শক্তির পরিচালনা করিতেছেন, সেই স্বরূপশক্তিরই নাম হ্লাদিনী, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং ভগবদানন্দ জীবকে অনুভূত করাইবার জন্য, হ্লাদিনী জীব-হৃদয়ে যে অনুকূল অবস্থা উৎপাদন করিবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কাম বা স্বার্থপরতা যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে অবস্থান করে, সে পর্য্যন্ত চিত্ত মলিনই থাকে, মলিনচিত্তে ভগবদানন্দ অনুভূত হইতে পারে না, তাই হ্লাদিনী জীব-হৃদয়ে কামকে প্রেমরূপে পরিণত করিয়া ভগবদানন্দ অনুভব করাইবার জন্য সর্ব্বদা সমুদ্যত রহিয়াছে, সেই প্রেম হ্লাদিনীর সার অংশ, সুতরাং তাহা নিত্য, এই কারণে সেই প্রেম উৎপন্ন হইতে পারে না, কিন্তু জীবহৃদয়ে অনুকূল মনোবৃত্তি-নিচয়ের সাহায্যে তাহা অভিব্যক্ত বা আবির্ভূত হইয়া থাকে। চরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামীও এই কথাই বুঝাইতে যাইয়া বলিয়াছেন—"হ্লাদিনীর সার প্রেম।" ইহার পরই তিনি বলিয়াছেন—"প্রেম-সার ভাব।" এক্ষণে ভাব কাহাকে বলে এবং কেনই বা তাহা প্রেমের সার বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

পঞ্চভাবে প্রীতির নিবিড় প্রকাশ

অভিলাষময় উল্লাসময় সৌন্দর্যের অনুভূতির সহিত যদি সুন্দরের প্রতি

আনুকূল্য বা চিত্তপ্রবণতা আসিয়া মিশিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকেই প্রীতি বা প্রেম বা ভালবাসা বলা যায়, ইহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। এই আনুকূল্যময় প্রীতি বা প্রেম কোন একটি ভাব বা প্রধান মনোবৃত্তির সহিত মিলিত না হইলে জীবের ভগবৎসেবা ঘটিয়া উঠে না বা সেই সেবা সফল হইতে পারে না, ইহা যে কেবল শাস্ত্রেই কথিত হইয়াছে, তাহা নহে, লৌকিক ব্যবহারক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রীতি মানবকে প্রীতিপাত্রের সেবার অধিকার প্রদান করে, ইহা সকলেই বুঝিয়া থাকে; প্রীতিহীন সেবা সেবা-ব্যপদেশ মাত্র, সে সেবা দ্বারা সেব্যও সুখী হয় না এবং সেবকও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না; কিন্তু এই প্রীতি কোন একটি প্রধান ভাবের সহিত মিলিত না হইলে প্রিয়তমের সেবার সাধনও হইতে পারে না। পিতা বা মাতার পুত্রের প্রতি যে প্রীতি, তাহা তাঁহাদের বাৎসল্যরূপ ভাবের সহিত মিলিত না হইলে পুত্রের সেবা-কার্য্যের অনুকূল হয় না; প্রভুর প্রতি ভৃত্যের অনুরাগও যদি ভৃত্যের আত্মগত দাস্যভাবের সহিত মিলিত না হয়, তাহা হইলে প্রভুর মনোমত সেবা ভৃত্যের দ্বারা হইয়া উঠে না; সখার প্রতি সখার যে প্রীতি, তাহা যদি সখ্যভাবের সহিত মিলিত না হয়, তবে তাহা দ্বারা সখার কর্ত্তব্য সেবার পদে পদে ত্রুটি হইয়া থাকে; এইরূপ রমণীর প্রিয়তম কান্তের প্রতি যে প্রীতি, তাহাও যদি স্ত্রীস্বভাবোচিত কান্ত বা মধুর ভাবে অনুপ্রাণিত না হয়, তাহা হইলে তাহার পতির প্রতি প্রীতি থাকিলেও তাহা দ্বারা প্রিয়তমের অনুকূল সেবা পূর্ণভাবে হইতে পারে না, ইহা লোকচরিত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই সুবিদিত আছে। এইরূপই প্রীতিরূপা যে ভক্তি, তাহা যদি দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা কান্তভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হয়, তবে তাহা দ্বারা ভক্তের ভগবৎসেবা পরিপূর্ণভাবকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

শান্ত ভক্তির পরম পরিণতি

ভগবৎপ্রীতিরূপা ভক্তি শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চভাগে বিভক্ত হইলেও, শান্তভক্তগণের ভগবৎপ্রীতি উক্ত অবশিষ্ট চারিপ্রকার ভাবের অর্থাৎ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের কোন একটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় না বলিয়া শান্তভক্তগণ ভক্তির সারসর্ব্বস্ব ভগবৎসেবানন্দে অধিকারী হইতে পারেন না। তাঁহারা ভগবানের বিশ্বোন্মাদন নিরুপম সৌন্দর্য্যের অনুভব করিতে সমর্থ, এই কারণে তাঁহাদের অন্তঃকরণ সামান্যতঃ ভগবৎপ্রীতিরূপ

ভক্তিরসে সর্ব্বদা আপ্লুত থাকিলেও সেবানন্দের অনুকূল ভাবচতুষ্টয়ের কোন একটি ভাব না থাকায়, তাঁহারা ভক্তির সারসর্ব্বস্ব সেবানন্দের অনধিকারী। সুতরাং উচ্চ শ্রেণীর ভক্তিরসের আস্বাদন তাঁহাদের ঘটিয়া উঠে না, কিন্তু করুণাময় ভগবানের ঐ সর্ব্বশক্তিময়ী হ্লাদিনী শক্তির প্রভাবে কদাচিৎ ঈদৃশ ভগবৎ-সৌন্দর্য্য-রস-সমুদ্রে নিমগ্ন স্থির, ধীর, শান্ত ভক্তগণও প্রীতিভক্তির পূর্ণতাকারী এই ভাব-চতুষ্টয়ের কোন না কোন একটি ভাবের আবর্ত্তে পতিত হইয়া ভগবৎসেবানন্দে অধিকার লাভ পূর্ব্বক ধন্য হইয়া থাকেন। তাই ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়—

"তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দকিঞ্জল্কমিশ্র-তুলসী-মকরন্দ-বায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥"

তাৎপর্য্য—অরবিন্দনেত্র সেই ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তগণ ভক্তিভরে যে মঞ্জরী-মিশ্রিত তুলসী অর্পণ করিয়া থাকেন, চরণপদ্মের সৌরভে সুবাসিত সেই তুলসী হইতে চ্যুত মকরন্দের সম্পর্কে সুবাসিত বায়ু সেই সকল শান্ত ভক্তগণের ইন্দ্রিয়বিবর দ্বারা অন্তঃকরণমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের চিত্ত ও দেহের বিক্ষোভ সম্পাদন করিয়াছিল, অর্থাৎ শান্ত ভক্তিরূপ নির্ব্বিশেষ সমাধির আনন্দ হইতে বিচ্যুত হইয়া সেই সকল শান্ত ভক্তগণ দাস্য প্রভৃতি ভাবরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পাইয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের হৃদয় দাস্যভাবে দ্রুত হইয়াছিল ও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছিল।

(১৫)

ভাব-ভক্তির উদয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য

সর্ব্বসুন্দর শ্রীভগবান্‌কে দেখিবার জন্য জীবের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষাই ভক্তির প্ররোহভূমি। এই ভূমি শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ সাধন-ভক্তির নির্ম্মল সলিলধারায় সর্ব্বদা সিক্ত হইলে ইহাতেই শ্রীভগবদ্দর্শন হয় এবং তাহার ফলে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ভাব-ভক্তির উদয় হইয়া থাকে।

কুন্তী দেবীর স্তবপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্‌ভাগবতেও ইহাই স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্॥"

যাহারা অবিরত তোমার লীলাচরিত শ্রবণ করে, গান করে, বর্ণন করে,

স্মরণ করে ও অভিনন্দন করে, তাহারা অচিরকালেই তোমার পাদপদ্মের দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হয়, সেই পাদপদ্মই এই দুঃখময় সংসার-নিবৃত্তির একমাত্র উপায়।

এই দর্শনাভিলাষ দর্শনীয় শ্রীভগবান্‌কে পাইয়া যখন ভাবরূপে পরিণত হয়, তখন আর সাধন-ভক্তির আবশ্যকতা থাকে না, এই ভাবাবস্থাকে আনয়ন করিয়া ভক্তকে কৃতার্থ করাই হ্লাদিনীশক্তির মুখ্য কার্য্য। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, শ্রীভগবানের জগৎসৃষ্টিরও ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

ভববন্ধন অনন্ত-শক্তি করুণাময়ের লীলা

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ রসস্বরূপ শ্রীভগবান্ স্বীয় অচিন্ত্য লীলাশক্তিপ্রভাবে আপনিই আপনা হইতে জীবনিচয়কে এই মায়াময় বিশ্বরাজ্যে প্রবেশ করাইয়াছেন কেন? ইহার উত্তর, জীবনিবহকে চরিতার্থ ও পরিপূর্ণ করা। সৃষ্টির পূর্ব্বে জীবের দেহাত্মাভিমান ছিল না, সুতরাং তাহার সাংসারিক কোন দুঃখই ছিল না, ইহা স্থির, তবে তাহাকে ভবপ্রপঞ্চে প্রবেশ করাইয়া অশেষ প্রকারের সংসার-দুঃখ ভোগ করাইবার আবশ্যকতা কি ছিল? এই দুরূহ প্রশ্নের উত্তর কোন দার্শনিকই যে ভাল করিয়া দিতে পারিয়াছেন, ইহা মনে হয় না, কারণ, ভারতের দার্শনিক আচার্য্যগণ সকলেই মুক্তিবাদী, তাঁহাদের সকলেরই চরম বা পরম লক্ষ্য মুক্তি। সৃষ্টির পূর্ব্বে কিন্তু সকল জীবই মুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হইতে নির্ম্মুক্ত ছিল, ইহাও তাহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহাই যখন তাঁহাদের সকলেরই সিদ্ধান্ত হইল, তাহা হইলে ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ভগবান্‌ই আমাদের, অর্থাৎ বদ্ধজীবনিবহের সকল প্রকার দুঃখভোগের একমাত্র কারণ। তিনি যদি নিজের ইচ্ছায় এই বৈষম্যময় সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে কেহই কোন প্রকার দুঃখভোগ করিত না, সুতরাং আমাদিগকে দুঃখের সংসারে প্রবেশ করাইয়া তিনি আমাদের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহারই করিয়াছেন। জ্ঞানবাদিগণ বলিবেন, জীবের প্রাক্তন কর্ম্মানুসারেই তাহার সংসার-দুঃখ-ভোগ হয়; ইহাতে শ্রীভগবানের কোন হাতই নাই। এ প্রকার উত্তর কিন্তু মনকে তুষ্ট করিতে পারে না। কারণ, এই প্রকার কল্পনা করিলে শ্রীভগবানের অপ্রতিহত স্বাতন্ত্র্য ও কারুণ্যের ব্যাঘাত হয়। শ্রুতি কিন্তু তাঁহার পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য নিঃসন্দিগ্ধভাবে উদ্ঘোষিত করিতেছেন—

"সর্ব্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ।
অনন্তশক্তিশ্চ বিভোর্বিধিজ্ঞাঃ ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য।"

যাঁহারা বেদতাৎপর্য্য বুঝেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, সেই সর্ব্বত্র অবস্থিত মহেশ্বরের ছয়টি নিত্য-সিদ্ধ গুণ আছে, যথা—সর্ব্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, অনাদিবোধ, স্বতন্ত্রতা, অলুপ্ত শক্তি ও অনন্ত শক্তি। শুধু ইহাই নহে—শ্রুতি আরও বলিয়া থাকেন—

"স এব তং সাধুকর্ম্ম কারয়তি যং উন্নিনীষতি, স বা এষ
তং অশুভং কর্ম্ম কারয়তি যমধো নিনীষতি।"

যাহাকে উন্নত করিতে ইচ্ছা করেন, সেই এই ভগবান্ তাহাকে পুণ্যকর্ম্ম করাইয়া থাকেন, আবার যাহাকে অবনত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তিনিই অশুভ কর্ম্ম করাইয়া থাকেন।

মিলনানন্দে বিরহের সার্থকতা

মুক্তিবাদী জ্ঞানী দার্শনিকের মতে এই প্রকার ভগবত্তত্ত্বের স্বরূপ সামঞ্জস্যের সহিত সিদ্ধ হয় না এবং ভক্তিসিদ্ধান্তেরও অনুকূল হয় না, এই কারণে শ্রীভগবানের শ্রীমুখনির্গত শ্রুতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভক্তিবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীভগবান্ স্বীয় অপ্রতিহত অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে জীবকে বিষম সংসারে প্রবেশ করাইয়া থাকেন এবং দুঃখভোগরূপ ভগবদ্বিরহের অনুভূতি যথাযথ না হইলে, রসরূপ নিরবধি আনন্দময় শ্রীভগবানের সহিত জীবের ভাবময় মধুর মিলনের অপার আনন্দ সাক্ষাৎকৃত হইতে পারে না। বিরহই মিলনের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া থাকে, বিরহের পূর্ণ অনুভূতি যাহার নাই, মিলনের বিমল আনন্দ তাহার পক্ষে গগন-কুসুমের ন্যায় অলীক, তাই নিত্য মিলনের নিরবধি সম্ভোগানন্দ অনুভব করাইয়া জীবনিবহকে আনন্দভুক্ করিবার জন্য করুণাময় শ্রীভগবান্ মায়াশক্তির দ্বারা এই বৈষম্যময় প্রপঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে জীবনিবহ অগ্নিতে বিস্ফুলিঙ্গ-সমূহের ন্যায় অবিভক্ত তাঁহাতে অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল, তৎকালে বিরহানুভূতি না থাকায়, জীব রসরূপ শ্রীভগবানের আস্বাদনানন্দ অনুভব করিতে সমর্থ ছিল না, সুতরাং আনন্দভুক্ও ছিল না—সেই জীবসমূহকে হ্লাদিনীর স্ফূর্ত্তি দ্বারা আত্মানন্দ অনুভব করাইবার জন্য এই সুখ-দুঃখময় প্রপঞ্চ, তিনি নিজ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াশক্তির দ্বারা রচনা করিয়াছেন, বাহিরের মায়িক সুখের আস্বাদনে

বহির্মুখী বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইলে, জীব দেহাধ্যাস বশতঃ ভগবদ্‌বৈমুখ্যকে প্রাপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে মায়িক দুঃখ, শোক ও বিপদের আবর্ত্তে পতিত হয় এবং নিত্য-প্রাপ্ত সুখরূপী ভগবানের আস্বাদনে বঞ্চিত হয়। এইরূপে তাহার সংসার-দুঃখভোগ করিতে করিতে সকল দুঃখের নিদান বলিয়া দেহ প্রভৃতিতে বৈরাগ্য লাভ করিবার অবসর হয়, সেই অবস্থায় করুণাময় শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর প্রভাবে তাহার ভগবদ্বিরহের তীব্র অনুভূতি জাগিয়া উঠে এবং তাঁহাকেই পাইবার জন্য প্রবল অভিলাষ উৎপন্ন হয়। ইহাই হইল জীবের শ্রীভগবানের প্রতি আসক্তির বা ভক্তির প্রথমাবস্থা, ইহাকেই বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভগবৎ-প্রেমের অঙ্কুরাবস্থা কহিয়া থাকেন। তীব্র দর্শনাভিলাষের নিরন্তর ঘৃতাহুতিতে জাজ্বল্যমান ভগবদ্‌-বিরহাগ্নির দারুণ তাপময়ী জ্বালায় চিত্ত তখন জ্বলিত হইয়া দ্রবীভাব প্রাপ্ত হয়। সেই দ্রুতচিত্ত অশ্রুধারারূপে পরিণত হয় এবং সেই অশ্রুধারা নয়নে বহিতে আরম্ভ করিলে, নয়নের মল বাহ্যরূপাসক্তি প্রক্ষালিত হইয়া যায়, এই ভাবে নয়ন বিশুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তাহা দ্বারা চির-আকাঙ্ক্ষিত সর্ব্বসুন্দর শ্যামসুন্দরের মনোহর সূক্ষ্মরূপ সাধকের দর্শনযোগ্য হইয়া থাকে।

কৃষ্ণরতিতে লোকবাহ্যভাব

তাই ভক্ত কবি গাহিয়াছেন—

"সর্ব্বত্র কৃষ্ণের মূর্ত্তি করে ঝলমল। সেই দেখে আঁখি যার হয় নিরমল॥
অন্ধীভূত নেত্র যার বিষয় ধূলিতে। কেমনে সে সূক্ষ্ম মূর্ত্তি পাইবে দেখিতে॥"

সাধনা-সিদ্ধির এই প্রথম সূচনারূপ অঙ্কুরাবস্থার বিশেষ পরিচয় শ্রীমদ্‌ভাগবতেও অতি সুন্দরভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥"

এই প্রকার ব্রতাবলম্বী সাধক নিজের ইষ্ট শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তাহাতেই অনুরক্ত হইয়া থাকে—সেই অনুরাগবশে তাহার চিত্ত বিগলিত হয়, তখন সে অকস্মাৎ হাসিয়া থাকে, আবার কখনও রোদন করে, কখনও উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে ডাকিয়া থাকে এবং গানও করে, তখন সে আর এ সংসারের লোক থাকে না, নিজ ভাবেই উন্মত্তের ন্যায় সে নৃত্যও করে।

কৃষ্ণময় অখিলে প্রণতি

এই লোকবাহ্য অবস্থায় উপনীত হইলে ভক্ত এ সংসারে যাহা কিছু দর্শন করে, সর্ব্বত্রই তাহার শ্রীভগবানের স্বরূপদৃষ্টি হইয়া থাকে, এ জগৎ সকলই তখন তাহার নিকট শ্রীকৃষ্ণময় হইয়া যায়। তখন—

"খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীং চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরম্ যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥"—(ভাগবত)

আকাশ, অনিল, অনল, সলিল, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কনিচয়, মনুষ্য, গো, মহিষ, ছাগ পভৃতি প্রাণিসমূহ—পূর্ব্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ ঊর্দ্ধ ও অধোদিক্‌চক্রবালে পরিদৃশ্যমান তরু, গুল্ম, লতা, বৃক্ষ প্রভৃতি স্থাবরনিবহ, নদী বা সমুদ্র—সকল প্রাপঞ্চিক বস্তুই তাহার নয়নে প্রাপঞ্চিক সত্তা হইতে বিচ্যুত হয়, সকল বস্তুই তাহার সম্মুখে সেই আনন্দময় শ্রীহরির জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া প্রতীত হয়—তাই সে যাহা কিছু দেখে, তাহাতেই শ্রীভগবানের চিদানন্দময় বিগ্রহের স্ফূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া থাকে।

বিষামৃতের আনন্দ-জ্বালা

এই প্রকার সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ভগবৎস্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে অনাদি-কালসঞ্চিত দেহাত্মভাবের প্রবল সংস্কার বশতঃ কদাচিৎ দ্বৈতস্ফূর্ত্তিরূপ ভগবদ্‌বিরহের তীব্র অনুভূতিই ভগবৎপ্রেমের ভাবময় বিবর্ত্ত। এই ভাবময় বিবর্ত্তের অপূর্ব্ব আস্বাদনই ভক্ত-জীবনে জীবন্মুক্তি, কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীচৈতন্যদেবই ইহার চরম বা পরম আদর্শ। নিজ মুখে আপনার এই অপ্রাকৃত ভক্তিদশার পরিচয়প্রসঙ্গে তিনি ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন—

"এই মত দিনে দিনে স্বরূপ রামানন্দ সনে
নিজ ভাব করেন বিদিত।
বাহ্যে বিষ-জ্বালা হয় ভিতরে আনন্দময়
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত॥
এই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন॥ —(চৈতন্য-চরিতামৃত)

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের এই ভাবোন্মাদময় ভগবৎপ্রেমের পূর্ণ-বিকাশ ব্রজধামেই

হইয়াছিল, তাই বৈষ্ণবকবিকুল-ধুরন্ধর শ্রীরূপ গোস্বামী বিদগ্ধমাধব-নামক কৃষ্ণলীলা-নাটকে ইহার পরিচয়প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"পীড়াভির্নবকালকূটকটুতা গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥

বিরহের দারুণ পীড়ানিবহে এই প্রেম নূতন কালকূটের তীব্রতামূলক গর্ব্বকে নির্ব্বাসিত করিয়া থাকে, আবার প্রিয়তমের নিত্য স্ফূর্ত্তিজনিত যে অপার আনন্দ অনুভূত হয়, সেই আনন্দের নিঃস্যন্দে সুধার ও মাধুর্য্যের অহঙ্কার সঙ্কুচিত হইয়া যায়, হে সুন্দরি! নন্দনন্দনের প্রতি এই প্রেম যাহার মনে উদিত হয়, সেই ব্যক্তিই ইহার বক্র অথচ মধুর বিক্রম অনুভব করিতে সমর্থ হয়।

নির্বাণ নিম্বফল

এই মধুররসাত্মক প্রেম-ভক্তির সহিত মুক্তির তুলনা হইতে পারে না, কারণ, ইহা অভাবময় নহে, পরন্তু সর্ব্বোচ্চ সর্ব্বদুঃখবিরোধী ভাবস্বরূপ মনোবৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশই এই ভক্তির স্বভাব। মোক্ষে মনোবৃত্তিনিচয়ের আত্যন্তিক ধ্বংসমাত্রই হইয়া থাকে, সে অবস্থায় আস্বাদয়িতা না থাকায় আস্বাদ্য কিছুই থাকে না,—এই কারণে সেই মোক্ষের প্রতি কাহারও প্রীতি হওয়া সঙ্গত নহে। যে নির্ব্বাণে সকল প্রকার কর্ত্তব্যের উচ্ছেদ হয়, যেখানে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই ত্রিপুটীভাব বিগলিত হয়, অহংসত্তার আত্যন্তিক উচ্ছেদ যাহার স্বরূপ, সেই নির্ব্বাণে রসতত্ত্ববিদ্ ভক্তের রুচি হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। কবিচূড়ামণি রসজ্ঞ কবি কবিকর্ণপূর তাই বলিয়াছেন,—

"নির্ব্বাণ-নিম্বফলমেব রসানভিজ্ঞাশ্চূষন্তু নাম রসতত্ত্ববিদো বয়ন্তু।
শ্যামামৃতং মদনমন্থরগোপরামা নেত্রাঞ্জলীচুলুকিতাবসিতং পিবামঃ॥"

—চৈতন্যচন্দ্রোদয় ৭ম অঙ্ক।

যাহারা রসতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, তাহারা নির্ব্বাণরূপ নিম্বফলের প্রতি অভিলাষযুক্ত হউক, আমরা কিন্তু রসতত্ত্বের আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছি, এই কারণে যে, কাম যাহাদের প্রেমে পরিণত হইয়া স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সকল গোপ-রমণীগণের নয়নৈকদেশ হইতে পীতশেষভাবে নির্গলিত শ্যামরসরূপ অমৃতই আমরা পান করিয়া থাকি

কৃষ্ণ-বৈমুখ্য দুঃখনিদান

সংসারে জীবমাত্রই আনন্দকামনা করে, আনন্দের জন্যই সকলে কার্য্যতৎপর, সেই আনন্দের আস্বাদ যাহাতে অসম্ভব, এরূপ নির্ব্বাণমুক্তি কোন্ বিবেকী ব্যক্তির স্পৃহণীয় হইতে পারে? জ্ঞানী বলিবেন, সংসার যখন দুঃখে ভরা, আমার আমিত্ব থাকিতে যখন আমার দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতির সম্ভাবনা নাই, তখন দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য আমার আমিত্বের উচ্ছেদও স্পৃহণীয় হইবে না কেন? ভক্ত বলেন, সংসার দুঃখময় কাহার দোষে? আনন্দময় লীলাপর শ্রীহরি সংসারকে আনন্দময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, দেহাভিমানী ইন্দ্রিয়-সুখলম্পট সংসারী জীব ভোগের তৃষায় ব্যাকুল হইয়া নিজ কর্ত্তব্য বুঝে না বা বুঝিয়াও করিতে চাহে না, নিজে শ্রীভগবানের নিত্যদাস হইয়াও তুচ্ছ কর্ত্তৃত্বাভিমানের বশে সে প্রভু হইতে চাহে, তাই তাহার পক্ষে স্বভাববশে সংসার দুঃখময় হইয়া দাঁড়ায়। এই সকল অনর্থের মূল হইতেছে তাহার ভাগবদ্‌বৈমুখ্য। সে যদি ভগবদ্‌বিমুখ না হইয়া আপনার স্বতঃসিদ্ধ ভগবদ্‌দাসভাবকে বুঝিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ইন্দ্রিয়-লৌল্য স্বতই নিবৃত্ত হয় এবং ভগবদ্‌ভজনে প্রবৃত্তিও জাগিয়া উঠে। সেই প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত জীবের দেহাত্মভ্রান্তি আপনিই সরিয়া পড়ে,—সর্ব্বজীবে ভগবৎসত্তার পরিপূর্ণ ভাব দেখিতে পাইয়া সর্ব্বাত্মভূত হরির সেবায় তখন সে অধিকার প্রাপ্ত হয়, এবং সাধনভক্তির প্রভাবে ভগবদ্‌ভজনানন্দে অধিকারী হইয়া থাকে।

নিরহং মুক্তি-পূর্ণাহং ভক্তি

সে আনন্দের আস্বাদন যাহার ভাগ্যে ঘটে, তাহার পক্ষে এ সংসারের কোন বস্তু বা কোন অবস্থাই দুঃখের কারণ হইতে পারে না, তাহার নিকটে সংসারের সকল বস্তুই সুখময় হইয়া উঠে। সে ভজনানন্দে আত্মপরভেদদর্শনে অসমর্থ হয় এবং প্রকৃত হরিসেবক হয়, সুতরাং তাহার পক্ষে জীবন দুঃখের হেতু নহে, অলৌকিক অপার আনন্দেরই হেতু হইয়া থাকে। তখন তাহার আমিত্ব দেহ, ইন্দ্রিয়, কলত্র-পুত্র প্রভৃতিতে সীমাবদ্ধ থাকে না—তাহার আত্মসত্তায় সংসার পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তাই শাস্ত্র বলিতেছে—

"নিরহং যত্র চিৎসত্তা সা তুর্য্যা মুক্তিরুচ্যতে।
পূর্ণাহন্তামযী ভক্তিস্তুর্য্যাতীতা নিগদ্যতে॥"

যে অবস্থায় চিৎসত্তা অহঙ্কারবর্জ্জিত হয়, তাহাকে তুরীয় মুক্তি বলা যায়,

আর অহংভাব যে অবস্থায় পরিপূর্ণতা লাভ করে, তাহাকেই ভক্তি কহে। এই ভক্তি তুরীয় অবস্থা হইতেও অতীত, এই ভক্তির উদয় হইলে মানব-আত্মা বিশ্বাত্মা হইয়া উঠে, মুক্তি এরূপ অবস্থায় স্বয়ং উপস্থিত হইলেও ভক্ত তাহার প্রতি উপেক্ষাই করিয়া থাকে। তাই শাস্ত্র বলিতেছে—

"সিদ্ধয়ঃ পরমাশ্চর্য্যা মুক্তয়ঃ পরমাদ্ভুতাঃ।
হরিভক্তিমহাদেব্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ॥"

বিচিত্র প্রকারের অণিমাদি সিদ্ধিনিচয় এবং পরমাদ্ভুতস্বরূপ মুক্তিসমূহ—হরিভক্তিরূপা মহাদেবীর পরিচারিকা দাসীর ন্যায় অনুসরণ করিয়া থাকে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মুক্তি ও ভক্তির স্বরূপনির্ণয়প্রসঙ্গে আমার যাহা বক্তব্য, তাহার উপসংহার এইখানেই করা গেল। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা নিতান্ত অল্প হইলেও পাঠকবর্গের ধৈর্য্যভঙ্গভয়ে বাধ্য হইয়া এইখানেই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। যাঁহারা এ বিষয়ে অধিক অনুসন্ধান করিতে চাহেন, তাঁহারা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও ভাগবত-সন্দর্ভ প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থনিবহের পর্য্যালোচনা করিবেন।

শ্যামের বাঁশী

(১)

ইতিহাসে নয়, অধ্যাত্ম অনুভূতিতে শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীবৃন্দাবনে রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের করকমলে বিরাজমান হইয়া, তাঁহারই অধরসুধায় স্নাত হইয়া বাঁশী এই শোকে তাপে ভরা ধরাধামে কি যে এক নিত্যনূতন ভাবময় সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার পরিচয় আমরা ইতিহাসে পাই না। কারণ, ঐতিহাসিক মহাপণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণাবতার ঐতিহাসিক যুগের ঘটনাই নহে, তাহা প্রাগৈতিহাসিক যুগের সত্য ঘটনাও হইতে পারে বা মহাকবি বেদব্যাস বা আর কাহারও কল্পনা-প্রসূতও হইতে পারে। যাক্ সে কথা, তাহা লইয়া একটা বাগাড়ম্বরপূর্ণ শুষ্ক বিচারের অবতারণা করিয়া রসিক পাঠকবর্গের অনাবশ্যক বিরক্তিভাজন হওয়া যে আমার এ ক্ষেত্রে একান্ত অনভিপ্রেত, তাহা প্রথমে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখাই ভাল।

বৃন্দাবনধামে কৃষ্ণলীলা ঐতিহাসিকই হউক বা পৌরাণিকই হউক অথবা নিছক কবিকল্পনা-প্রসূতই হউক, তাহাতে বড় একটা কিছু আসে বা যায় না। কৃষ্ণলীলার প্রভাব কিন্তু আস্তিক হিন্দু-সমাজের এমনভাবে অস্থিমজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে যে, কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিই তাহাকে উপেক্ষা করিয়া হিন্দু-সমাজের ভাবপ্রবণ আধ্যাত্মিকতার রহস্য অনুশীলন করিতে এক পদও অগ্রসর হইতে সাহসী হন না বা হইতে পারেন না, ইহা ধ্রুব সত্য।

ভাগবতে বাঁশী

সেই বৃন্দাবনধামের কৈশোর কৃষ্ণলীলার প্রধান উপকরণ হইতেছে এই শ্যামের বাঁশী। এই বাঁশীর সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় শ্রীমদ্‌ভাগবতের সাহায্যেই হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণে বা হরিবংশে এই বাঁশীর বর্ণন থাকিলেও তাহার যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা, তাহার স্পষ্ট সূচনা কিন্তু পৌরাণিক সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীমদভাগবতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাগবতে রাসলীলারম্ভের সূচনা এই বাঁশীর দ্বারাই হইয়াছিল, ইহার পূর্ব্বে শ্যামের সহিত বংশীর যে কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা বড় দেখিতে পাওয়া যায়

না। শারদী পূর্ণিমার প্রদোষে কালিন্দীর তরঙ্গসংস্পর্শ-শীতল মৃদু সমীরণসঞ্চারে স্নিগ্ধ লতাকুঞ্জরাজিবিরাজিত যমুনাসৈকত যখন পূর্ণচন্দ্রের বিমল চন্দ্রিকাস্নাত হইয়া উঠিল, তখন রাসলীলারম্ভের প্রথম উদ্বোধনগীতি এই বাঁশীরই সাহায্যে বংশীধারী করিয়াছিলেন। তাই ভাগবতে দেখিতে পাই—

"দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং রমাননাভং নবকুঙ্কুমাকণম্।
বনঞ্চ তৎকোমলগোভিরঞ্জিতং জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্॥"

সন্ধ্যার অরুণিমায় নবকুঙ্কুমের অরুণবর্ণ, বৈকুণ্ঠের অধীশ্বরী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মুখমণ্ডলের ন্যায় মনোহর, পরিপূর্ণমণ্ডল চন্দ্রকে উদিত হইতে দেখিয়া, এবং সেই শারদ পূর্ণচন্দ্রের সুকোমল চন্দ্রিকাজালে যমুনাতটস্থিত বনরাজিকে সুরঞ্জিত হইতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ (বেণুর দ্বারা) বামনয়নাগণের মনোহর অব্যক্ত মধুর গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন।

ঔৎসুক্যে ছলনা

এই শ্লোকে কিন্তু স্পষ্টভাবে বাঁশীর নাম দেখিতে পাওয়া যায় না, বামনয়নাগণের মনোহর অব্যক্তমধুর গানমাত্রই এখানে স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা বাঁশীর গানও হইতে পারে, আবার তাহা না হইয়া কণ্ঠসঙ্গীতও হইতে পারে। এখানে এই সন্দেহ মিটাইবার জন্য কোন প্রযত্ন শ্রীমদ্‌ভাগবত-রচয়িতা করেন নাই, ইহা সত্য; কিন্তু এই কলগীত যে শ্যামের বাঁশীরই গান, তাহা নিশ্চিত। কারণ, এই গান শুনিয়াই যখন ব্রজবনিতাগণ গৃহ, কুল, ধর্ম্ম, সমাজ, স্নেহ, মায়া ও মমতার দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলজাল অনায়াসে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া, কেহ কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া, কেহ কাহারও অপেক্ষা না করিয়া, দলে দলে যমুনাপুলিনে রাসস্থলীতে দুর্নিবার গতিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল এবং সেখানে চিরবাঞ্ছিত শ্যামসুন্দরের দর্শন পাইয়া আত্মসমর্পণের জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, শ্যামসুন্দর তাহাদের এই আত্মসমর্পণের আকুল আকাঙ্ক্ষার গভীরতা নিজে বুঝিবার জন্য, অথবা সন্দিগ্ধ জগৎকে বুঝাইবার জন্য উপেক্ষার হাসিতে তাহাদের এই আলোকসামান্য প্রণয়ের সর্ব্বস্বোপহার উপেক্ষা করিয়া প্রবীণ ধার্ম্মিকের ন্যায় তাহাদিগকে আবার গৃহে ফিরিবার উপদেশ অতি গম্ভীরভাবে দিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাহারা কি বলিয়াছিল? তাহারা বলিয়াছিল—

"কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীতসম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্" ॥

ওহে ধর্ম্মশিক্ষক! স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতলের মধ্যে বল দেখি এমন কোন্ রমণী আছে, যে তোমার ঐ অব্যক্তমধুর পদরাজিবিরাজিত সাক্ষাৎ অমৃতস্বরূপ বাঁশীর গানে সম্মোহিত হইয়া নিজ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারে? শুধু কি বাঁশীর এই গান? তাহারও উপর এই ত্রিলোকসৌন্দর্য্যের সার এই বিশ্বমোহন রূপ, এ রূপ দেখিয়া মানবী যে আত্মধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি আছে? এই বাঁশীর স্বরের আর ঐ বিশ্ববিমোহন রূপের অনুভূতিতে ঐ দেখ, বৃন্দাবনের গো, পক্ষী, তরু ও মৃগগণ পর্য্যন্তও পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রত্যেকের একান্তে অভিসার

ব্রজগোপীগণের এই উক্তিই ত স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছে যে, পরিণত শরতের পূর্ণিমা-রজনীতে রাসলীলারম্ভক্ষণে শ্যামসুন্দরের এই প্রথম আহ্বানে প্রাণস্পর্শী গীত বাঁশীরই গীত, তাহা কণ্ঠের সঙ্গীত নহে। এই বাঁশীর কল-গীত শুনিয়া ব্রজগোপীগণ কি করিয়াছিল, তাহার পরিচয় রাসলীলার ত্রিকালদর্শী কবিকুলগুরু মহর্ষি বেদব্যাসের ভাষাতেই সুব্যক্ত। তিনি বলিয়াছেন—

"নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ ॥"

সেই অনঙ্গবর্দ্ধন বংশীগীত শুনিবার পরই ব্রজবাসিনী বনিতাগণের অন্তঃকরণ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল, তাই তাহারা একেবারে যেখানে কান্ত কৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেছিলেন, সেইখানেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। আগমনের সময় দ্রুতগতিবেগে তাহাদের শ্রবণের কুণ্ডলসমূহ অতিশয় দোদুল্যমান হইয়াছিল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাহারা দলে দলে গৃহ হইতে বাহির হইয়া একই পথ দিয়া কৃষ্ণদর্শনলালসায় যখন যমুনাপুলিনের দিকে ধাবিত হইয়াছিল, তখন তাহাদের মধ্যে একে অপরের এই কৃষ্ণদর্শনার্থ উদ্যম বা চেষ্টা নিশ্চয় লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় নাই।

এই একটি শ্লোকেই ভগবান্ বেদব্যাস শ্যামসুন্দরের মোহন বংশীগীতের যে বিশ্বজীবমোহিনী অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। রস-সাহিত্যের দিক্ দিয়াই হউক অথবা গভীরতম দার্শনিকতার দিক্ দিয়াই হউক, সমগ্র বিশ্বমানবের আধ্যাত্মিক জীবনের ইতিহাসে ইহার তুলনা ইহাতেই সম্ভবে, আর কোথায়ও ইহার তুলনা সম্ভবপর নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায় ইহারই ব্যাখ্যামাত্র।

এই শ্লোকে দুইটি বিশেষণ পদের প্রতি সহৃদয় পাঠকবর্গের ভাল করিয়া লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথম হইল,—'অনঙ্গবর্দ্ধনং' ইহা বংশীগীতের বিশেষণ। দ্বিতীয় হইল—'অন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ' ইহা ব্রজগোপীগণের বিশেষণ।

অনঙ্গ-বিলাসে ভক্তি-সঞ্চার

প্রথম বিশেষণটিরই একটু আলোচনা করা যাউক্। অনঙ্গবর্দ্ধন শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ হইতেছে—কামোদ্দীপক। বাঁশীর গান ভোগাসক্ত মানবের অন্তঃকরণে সুপ্ত কামকে জাগাইয়া দিয়া থাকে, ইহাও ত লোকসিদ্ধ। প্রকৃত-স্থলেও কি তাহাই ঘটিয়াছিল? আপাতদৃষ্টিতে ইহাই ইহার সঙ্গত অর্থ বলিয়া হয় ত অনেকেরই মনে হইবে; কিন্তু রাসলীলার লোকোত্তর কবি মহর্ষি বেদব্যাসের যে ইহা অভিপ্রেত অর্থ নহে, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। কেন বলা যায়, তাহা বলি,—

রাসলীলার উপসংহারে এই লীলাশ্রবণে বা লীলাকীর্ত্তনে জীবের কি ফল-লাভ হয়, তাহাই বলিতে উদ্যত হইয়া স্বয়ং বেদব্যাসই বলিয়াছেন—

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥"

ব্রজবধূগণের সহিত বিষ্ণুর এই রাসলীলারূপ বিশিষ্ট ক্রীড়া শ্রদ্ধা-সমন্বিত হইয়া ধৈর্য্য সহকারে যে ব্যক্তি শ্রবণ করিবে, বা অনুকীর্ত্তন করিবে, সে শ্রীভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া শীঘ্রই কামরূপ হৃদ্রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে।

ইহাই যদি হইল রাসলীলাশ্রবণের উদ্দেশ্য, তাহা হইলে সেই রাসলীলার আরম্ভে শ্রীভগবান্ লীলাসহচরী ব্রজগোপিগণকে রাসলীলাস্থলীতে আনয়ন করিবার জন্য বাঁশীতে যে গান গাহিয়াছিলেন, তাহা ব্রজগোপীগণের সুপ্ত কামকে জাগাইয়াছিল; এরূপ তাৎপর্য্য যে মহর্ষি বেদব্যাসের কিছুতেই সম্মত হইতে পারে না, ইহা স্থির; সুতরাং এই 'অনঙ্গবর্দ্ধন'-রূপ বিশেষণ পদটির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহার নির্ণয় অগ্রে করিতে হইবে। এই শ্লোকের টীকাকারগণও এই বৈষম্যের কথা ভাবিয়াছিলেন এবং তাহার সমাধান করিবার চেষ্টাও করিয়াছেন।

প্রেমবর্দ্ধন

গৌড়ীয় বৈষ্ণবকুলাচার্য্য শ্রীসনাতন গোস্বামী নিজকৃত বৃহত্তোষণী-নামক

ভাগবত-টীকায় এই বিশেষণ পদটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"অনঙ্গশব্দ-প্রয়োগশ্চ, তাসাং প্রেমরূপকামবিশেষণে গ্রাম্যধর্ম্মহেতুপ্রাকৃতকামাংশাভাব-বিবক্ষয়া।" এখানে যে অনঙ্গ শব্দটির প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা প্রেমরূপ কামবিশেষের উদয় হওয়ায় গ্রাম্যধর্ম্মের হেতু যে কাম, তাহার লেশমাত্রও সেখানে ছিল না, এইরূপ বুঝাইবার জন্যই।

শ্রীজীব গোস্বামী বৃহৎক্রমসন্দর্ভ-নামক স্বকৃত ভাগবতটীকায় বলিয়াছেন,—"'অনঙ্গবর্দ্ধনং' অঙ্গং কাম-কলা অঙ্গী প্রেমা অতোহনঙ্গ-বর্দ্ধনং অঙ্গিবর্দ্ধনং প্রেমবর্দ্ধনং ইতি যাবৎ।"

'অনঙ্গবর্দ্ধন' এই পদটির অর্থ—অঙ্গ শব্দের তাৎপর্য্য কামকলা, যাহা অঙ্গ নহে, তাহাই অঙ্গী, সেই অঙ্গী প্রেমই হয়, সুতরাং অনঙ্গবর্দ্ধন এই শব্দটির অর্থ অঙ্গিবর্দ্ধন অর্থাৎ প্রেমবর্দ্ধন।

প্রেম অঙ্গ নয় অঙ্গী বা প্রধান

শ্রীজীব গোস্বামীর এই উক্তিটির তাৎপর্য্য এই যে, অঙ্গ শব্দের অর্থ,—উপকরণ বা উপায়। যাহা অঙ্গ অর্থাৎ কাহারও উপকরণ বা উপায় নহে, তাহাকেই অনঙ্গ বলিয়া এখানে বুঝিতে হইবে। সুতরাং যাহা অঙ্গী অর্থাৎ প্রধান, তাহাই অনঙ্গ (ন অঙ্গ অনঙ্গ)। ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, ইহা উপায় নহে, কিন্তু উপেয় অর্থাৎ ইহা সাধন নহে, কিন্তু সাধ্য; সুতরাং অনঙ্গ শব্দের এখানে প্রকৃত অর্থ হইতেছে—প্রেমলক্ষণা ভক্তি। এই প্রেমে কামের গন্ধমাত্রও থাকিতে পারে না; ইহাই হইল প্রেম-ভক্তিবাদের নিগূঢ় রহস্য।

কাম কাহাকে বলে?—ভোগ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে যে ক্ষণস্থায়ি-সুখ এ সংসারে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাকে পাইবার আমাদের অন্তঃকরণে যে আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়, লোকে তাহাকেই কাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এই কাম থাকিলেই ঐন্দ্রিয়িক সুখ আমাদের উৎপন্ন হইতে পারে, না থাকিলে ঐরূপ সুখ উৎপন্ন হয় না। এই কারণে এই কাম হইতেছে সেই ঐন্দ্রিয়িক সুখের অঙ্গ বা সাধন, ইহা সুতরাং সাধ্য বা ফল হইতে পারে না। প্রেম কিন্তু এইরূপ অঙ্গ বা সাধন নহে; কারণ, প্রেম স্বয়ংই সুখস্বরূপ, তাহা কোন সুখান্তরের সাধন নহে, সুতরাং প্রেম অনঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গী বা প্রধান অর্থাৎ তাহাই মানবের চরম বা পরম পুরুষার্থ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার আরম্ভ করিতে উদ্যত হইয়া

ব্রজগোপীগণের আহ্বানার্থ যে বংশীগান করিয়াছিলেন, তাহা ব্রজগোপীগণের হৃদয়ে অঙ্কুরিতভাবে অবস্থিত যে ভগবদ্বিষয়ক প্রেমরূপ ভক্তি, তাহাকেই বর্দ্ধিত বা উদ্দীপিত করিয়াছিল। ইহাই হইল, শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর সম্মত 'অনঙ্গবর্দ্ধন' এই বিশেষণ পদটির তাৎপর্য্যার্থ।

ভগবৎ-প্রেম অভিনব কাম

শ্রীমদ্‌বল্লভাচার্য্যও স্পষ্টভাবেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"কিঞ্চ ভগবতা যদ্‌গীতং তদনঙ্গমেব বর্দ্ধয়তি অঙ্গং তু নাশয়ত্যেব, অতো নূতন উৎপন্নঃ কামঃ॥"

আরও দেখিতে হইবে, শ্রীভগবান্ যে গান করিয়াছিলেন, তাহা অনঙ্গকেই বাড়াইয়া থাকে, অঙ্গকে কিন্তু বিনাশিতই করিয়া থাকে। তাই বুঝিতে হইবে, ব্রজগোপীগণের হৃদয়ে তৎকালে নূতন কাম (অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধ কাম হইতে বিলক্ষণ) উৎপন্ন হইয়াছিল, অর্থাৎ হৃদয়ের রোগরূপ কাম নষ্ট হইয়া তাহা ভগবৎপ্রেমরূপ নূতন কামরূপে পরিণত হইয়াছিল।

বর্দ্ধক অর্থে ছেদক

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরামনারায়ণ প্রভৃতি টীকাকারগণ 'অনঙ্গবর্দ্ধন' এই পদটির ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামীরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন, তাই বিস্তারভয়ে আর তাঁহাদের ব্যাখ্যা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল না। আমার কিন্তু মনে হয়, অনঙ্গ শব্দের এইরূপ যৌগিক অর্থ না করিয়া যদি প্রসিদ্ধ কামরূপ অর্থই গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেও ব্যাসদেবের পূর্ব্বাপর উক্তির মধ্যে আপাত-প্রতীত বিরোধের পরিহার হইতে পারে। আমরা যদি এই স্থলে বর্দ্ধন শব্দের 'বৃদ্ধিকর' এরূপ অর্থ না করিয়া 'ছেদকর' এইরূপ অর্থ গ্রহণ করি, তাহা হইলে সামঞ্জস্য অনায়াসেই হইতে পারে। বৃধ্ এই ধাতু হইতে বর্দ্ধন এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই বৃধ্ ধাতু যেমন বৃদ্ধিরূপ অর্থকে বুঝাইয়া থাকে, সেইরূপ ছেদনরূপ অর্থকেও ইহা বুঝাইয়া থাকে। প্রকৃত স্থলে এই বৃধ্ ধাতুটি ছেদনরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, এই কারণে অনঙ্গবর্দ্ধন শব্দের এখানে কামবিনাশন এইরূপ অর্থ অনায়াসেই হইতে পারে এবং এইরূপ অর্থ করিলে রাসলীলার উপসংহারে ভগবান্ বেদব্যাস যে 'হৃদ্রোগরূপ কামের উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হয়', এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সহিত সামঞ্জস্য অনায়াসেই ত হইতে পারে এবং অনঙ্গ শব্দের সুপ্রসিদ্ধ অর্থ যে কাম, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অগতির গতিরূপ

যৌগিকার্থ গ্রহণও করিতে হয় না। এক্ষণে আবার প্রকৃতেরই অনুসরণ করা যাউক।

একাগ্র চিন্তায় বাহ্যবিস্মৃতি

পূর্ব্বেই বলিয়াছিল, উক্ত শ্লোকের মধ্যে যে "অন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ" এই বিশেষণটি, তাহারও তাৎপর্য্য কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে রাসলীলারম্ভের সময় লীলার উদ্বোধন-স্বরূপ এই শ্যামসুন্দরের বাঁশীর গান যে কিসের, কোন্ রসের গান, তাহা বুঝিতে পারা কঠিন। তাই এক্ষণে ঐ বিশেষণটির কি প্রকৃত অর্থ, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

"অলক্ষিতোদ্যমাঃ"—ইহার অর্থ—যাহাদের মধ্যে কেহই অপর কাহারও উদ্যম লক্ষ্য করিতে পারে নাই। তাহারা দলে দলে একই সময় আরব্ধ 'গৃহকর্ম্ম' পরিত্যাগ করিয়া অসংখ্যাত ব্রজগোপী রাসস্থলী অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে, অথচ কেহও কাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না, অপর কেহ যে তাহারই ন্যায় একই কার্য্যের অনুরোধে দ্রুতবেগে দোদুল্যমানকর্ণকুণ্ডলা হইয়া অগ্রে, পশ্চাতে, পার্শ্বে চলিয়াছে, এ জ্ঞান তাহাদের মধ্যে কাহারও তখন ছিল না। এই অলৌকিক অতিবিস্ময়াবহ ব্যাপার কেমন করিয়া ঘটিয়াছিল, তাহাই ইঙ্গিতে বুঝাইবার জন্য তত্ত্বদর্শী মহর্ষি ব্রজগোপীগণের আর একটি বিশেষণের অবতারণা করিয়াছেন, সে বিশেষণটি এই—'কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।'

মানসবৃত্তি নিরোধ

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তাহাদের সকলেরই মন অথবা মানসধর্ম্ম লজ্জা, ভয়, বিবেক প্রভৃতি ব্যবহারোপযোগী বৃত্তি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল, এই কারণেই তাহারা 'অন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ' হইয়াছিল।

এ সেই বাঁশীর গান, যে গান কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া শ্রোতার মন ও মনের ধর্ম্মগুলি অপহরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপঙ্কজে মিশাইয়া দেয়, সাংসারিক বস্তুনিচয়ের মধ্যে এইটা সৎ, এইটা অসৎ, এইরূপ ভেদবুদ্ধিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া তুলে, আর সেই সঙ্গে অনাদিকাল হইতে জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত অহমিকার মোহমদিরাময় আবরণকে নয়ন হইতে অপসারিত করিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দেয়। সত্য সত্যই তখন বোধ হয়—

"তুমি—আছ অনলে অনিলে চির-নভোনীলে ভূধরে সলিলে গহনে।
আছ বিটপি-লতায় জলদেরি গায় শশি-তারকায় তপনে॥"

এ গান—এ সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী ও সকল প্রাণীর আকর্ষক শ্রীবৃন্দাবন-বিহারী শ্রীশ্যামসুন্দরের প্রীতিমাখা আহ্বানের প্রাণস্পর্শী গান, যাহার কর্ণে একবার পশিয়াছে, তাহার পক্ষে 'কৃষ্ণগৃহীতমানস' হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর সম্ভবপর নহে, এই অখণ্ডনীয় সুন্দর সত্যই এই শ্লোকের বর্ণে বর্ণে ফুটিয়া উঠিতেছে।

স্থাবর জঙ্গমে স্বভাব-বিপর্যয়

এই গানের স্বভাবই এই যে, ইহা যে শুনে, তাহার প্রকৃতিবিপর্যয় ঘটে, ইহার প্রভাবে স্থিরস্বভাব বস্তু অস্থির হইয়া পড়ে, আবার জঙ্গম প্রকৃতি স্থাবরভাব প্রাপ্ত হয়। তাই শ্রীমদ্‌ভাগবতে দেখিতে পাই—

"বামবাহুকৃতবামকপোলো বল্গিতভ্রূরধরার্পিতবেণুঃ।
কোমলাঙ্গুলিভিরাশ্রিতমার্গং গোপ্য ঈরয়তি যত্র মুকুন্দঃ॥"

হে গোপীগণ! যখন নিজ বামবাহুর উপর (মূলদেশে) বামকপোল সন্নিবেশিত করিয়া ভ্রূকম্পন করিতে করিতে অধরে অর্পিত বেণুর স্বররন্ধ্রগুলির উপর কোমল অঙ্গুলিসঞ্চালন দ্বারা মুকুন্দ গাহিতে আরম্ভ করেন,—তখন কি দেখিতে পাই? তখন দেখিতে পাই—

"বৃন্দশো ব্রজবৃষা মৃগগাবো বেণুবাদ্যহৃতচেতস আরাৎ।
দন্তদষ্টকবলা ধৃতকর্ণা নিদ্রিতা লিখিতচিত্রমিবাসন্॥"

সেই বেণুধ্বনি শ্রবণে ব্রজের বৃষ, গাভী ও অন্যান্য মৃগগণ উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া কাতারে কাতারে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, আরও শুনিবার জন্য তাহাদের কর্ণযুগল উদ্ধৃত হইয়াই থাকে। বংশীধ্বনি শ্রবণের পূর্ব্বে গৃহীত তৃণকবল তাহাদের দন্তলগ্নই হইয়া রহিয়াছে, আর চর্ব্বিত হইতেছে না, ভাবের আবেশে তাহারা যেন নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, তাহারা যেন চিত্রবিন্যস্ত—জীবিত নহে।

স্তিমিত নদী

আবার দেখ—"তর্হি ভগ্নগতয়ঃ সরিতো বৈ তৎপদাম্বুজরজোঽনিলনীতম্।
স্পৃহয়তীর্বয়মিবাবহুপুণ্যাঃ প্রেমবিপেতভুজাঃ স্তিমিতাপঃ॥"

সেই সময় নদীকূলের গতিরোধ হইয়া পড়ে, আমরা যেমন বহু পুণ্যের

সঞ্চয় করিতে পারি নাই বলিয়া কৃষ্ণসমাগম পাই না অথচ সর্ব্বদা তাহা পাইবার জন্য স্পৃহাই করিয়া থাই, ঐ স্তিমিতগতি নদীসমূহও আমাদেরই ন্যায় গভীর প্রেমাবেশে কম্পিত বাহুর ন্যায় তরঙ্গ তুলিয়া অনিল-সমানীত শ্রীগোবিন্দের পদাম্বুজরজের প্রার্থনা করিতেছে।

শুধু কি তাই? ঐ আরও দেখ—

"বনলতাস্তরবস্ত আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম॥"

বৃক্ষলতার অমৃত নিঃস্যন্দ

ঐ দেখ, বৃন্দাবনের লতা ও বৃক্ষসমূহ, তাহাদের আত্মাতে যেন শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দমূর্ত্তির মূর্ত্ত আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাদের অকস্মাৎ ও প্রচুরভাবে বিকশিত পুষ্পফলনিচয়ের ভারে শাখা সকল আপনা হইতেই অবনত হইয়া পড়িতেছে, আনন্দময়ের স্পর্শের দিব্য অনুভূতিতে তাহাদের অঙ্গপ্রতঙ্গ সকল হৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, অন্তরে উদ্বেলিত প্রেমময় আনন্দসমুদ্রের উচ্ছ্বাসরূপে তাহাদের প্রত্যেকের অঙ্গ হইতে মধুধারার বর্ষণ হইতেছে, তাহাদের এই সকল দিব্য চেষ্টা তাহাদের অন্তরে আবির্ভূত বিশ্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণেরই অভিব্যঞ্জক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রাসলীলার উদ্বোধনের মঙ্গলমুহূর্ত্তে শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্যামসুন্দরের বিশ্ববিজয়িনী বংশীর এই অপূর্ব্ব শক্তিসম্পন্ন গানই হইতেছে রাসলীলারূপ মহোপনিষদের প্রণব বা বীজমন্ত্র। সমগ্র রাসলীলাই হইতেছে এই মহামন্ত্রের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ, কি ভাবে কেমন করিয়া এই বংশীধ্বনি শ্যামসুন্দরের এই মধুর লীলার সাহায্য করিয়াছিল, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এইবার দেখাইবার জন্য অগ্রসর হইব।

(২)

বঙ্গে মোহন বাঁশী

জড় ও চেতন এই দুই প্রকার বিভিন্ন স্বভাবের বস্তুনিচয়ের ধর্ম্মবিনিময় দ্বারা একরূপতা-সম্পাদন শ্যামের বাঁশীর অসাধারণত্ব শ্রীমদ্ভাগবতের বহু শ্লোকে যেমন সুন্দরভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা সমগ্র পৌরাণিক সাহিত্যের

মধ্যে অতুলনীয়। সংস্কৃত-সাহিত্য, যাহার নাম ইংরাজীতে ক্লাসিক কহে, তাহাতেও বঙ্গীয় গোস্বামিগণের আবির্ভাবের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত এই ভাগবতের বংশী-ধ্বনির অসাধারণত্ব ফুটিয়া উঠে নাই। শুধু তাহাই নহে, বরং বহু শতাব্দীব্যাপী সংস্কৃত-কবি-সমাজে এই বংশীধ্বনির কোন বিশেষ চিহ্নও দেখা যায় না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বিশ্ব-জনীন প্রেমের বন্যায় যখন নদীয়া ভাসিয়াছিল, সেই সময় হইতেই বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণ অধ্যাত্মজীবনে এই বাঁশীর স্বর নূতন করিয়া সাড়া দিয়াছিল, তাই আমরা বাঙ্গালার কবিকর্ণপূর পরমানন্দ সেনের চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ে দেখিতে পাই—

"বিততিরপি গিরীণাং মুঞ্চতীবাশ্রুধারাম্ ব্রজতি পুলকমুচ্চৈর্ব্বৃক্ষবীরুৎপ্রপঞ্চঃ।
বিদধতি সরিতোঽপি স্রোতসস্তম্ভমেতা হরি হরি হরিবংশীনাদ এবোজ্জিহীতে।"

(ঐ দেখ) গিরিশ্রেণী যেন প্রেমাবেগে দ্রুত হইয়া অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছে, বৃন্দাবনের বৃক্ষ-লতা প্রভৃতিও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, স্রোতস্বিনীগণও অকস্মাৎ নিজ নিজ স্রোতকে স্তব্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, হরি হরি, এ নিশ্চয়ই শ্রীহরির বংশীধ্বনি আবির্ভূত হইতেছে!

এই বংশীধ্বনি যে ভাগ্যধরের কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে, তাহার প্রাণ কি ভাবে কিসের আশায় আকুল হইয়া উঠে?

ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ

কবি কর্ণপুর তাহাই একটি শ্লোকে কেমন স্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছেন, দেখুন—

"শ্রুতিভিরপি বিমৃগ্যং ব্রহ্মসম্পত্তিভাজামপি পুরুরসনীয়ং মূর্ত্ত আনন্দসারঃ।
যদহহ ভবিতাদ্য শ্রীলশম্ভু-স্বয়ম্ভূ-প্রভৃতিভিরভিবন্দ্যং পাদপদ্মং দৃশোর্নঃ॥"

(এ বাঁশীর স্বর—যখন শুনিতে পাইয়াছি, তখন)—সেই প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেই পাদপদ্ম এখনই আমার নয়নগোচর হইবে, সেই পদ-পঙ্কজ কেমন? সমগ্র উপনিষদ্ তাহা খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহা জীবন্মুক্ত ভক্তগণের একমাত্র আস্বাদ্য, তাহা মূর্ত্তিমান্ আনন্দের সার, শ্রীশঙ্কর, চতুরানন প্রভৃতি দেবগণ তাহারই পূজা করিয়া থাকেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধবে ইহারই প্রতিধ্বনি বর্ণে বর্ণে কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে!

জড় জগতে প্রকৃতি-বিনিময়

"জাতস্তম্ভতয়া পয়াংসি সরিতাং কাঠিন্যমাপেদিরে
গ্রাবাণো দ্রবভাবসম্বলনতঃ সাক্ষাদমী মার্দ্দবম্।
স্থৈর্য্যং বেপথুনা জহুর্মুহুরগা জাড্যাদ্গতিং জঙ্গমা
বংশীং চুম্বতি হন্ত যামুনতটী-ক্রীড়াকুটুম্বে হরৌ ॥"

যমুনাতটে ক্রীড়ানিরত শ্যামসুন্দরের মধুর অধরে মুরলী মিলিত হইয়াছে—তাই বৃন্দাবনে নদী-সমূহের তরল জলরাশি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহারা কঠিন হইয়া গিয়াছে! গিরি-গোবর্দ্ধনের শিলানিচয় গলিয়া যেন (নবনীতের ন্যায়) কোমল হইয়া উঠিতেছে! বৃক্ষসমূহ মুহুর্মুহুঃ এমন কাঁপিতেছে, মনে হয় যেন তাহারা বুঝি চলিতেও আরম্ভ করিল! আর পশু, পক্ষী প্রভৃতি জঙ্গম প্রাণিগণ এমনই জড়ভাব অবলম্বন করিতেছে যে, দেখিলে মনে হয় যেন, তাহারা চলিবার শক্তিও হারাইয়া ফেলিয়াছে!

ভূলোকের অধঃ ও ঊর্দ্ধে আলোড়ন

বৃন্দাবনে যমুনার শরচ্চন্দ্রিকা-সমুদ্ভাসিত বিমল সৈকতে জাতী-যূথিকা-মল্লিকার দিব্য সৌরভে বাসিত কুঞ্জমধ্যে নব-কিশোর রসিক-শেখর শ্যামসুন্দরের বিশ্বমোহন বংশী এই ভাবে সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে স্থাবর ও জঙ্গম বস্তু-নিচয়কে চিররূঢ় স্বভাব হইতে রূপান্তরিত করিয়া নিজের ভাবময় সাম্রাজ্যকে ক্রমে প্রসারিত করিতে লাগিল। সেই ভাব-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা পৃথিবী ভাসাইয়া ক্রমে কেমন করিয়া উর্দ্ধ ও অধোদেশবর্ত্তী লোকনিচয়কে প্লাবিত করিয়াছিল, তাহার পরিচয় শ্রীরূপ গোস্বামীর—অমর ভাষাতে যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনটি আর কোথাও দেখি নাই—

"রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্ মুহুস্তুম্বুরুম্,
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মেরয়ন্ বেধসম্।
ঔৎসুক্যাবলিভির্বলিং চপলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্,
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ ॥"

এই শ্লোকের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই যে,—সেই বংশীধ্বনি ক্রমে ভূলোক ছাপাইয়া উর্দ্ধে উঠিতে আরম্ভ করিল। দ্যুলোকের মেঘাবলীর গতি রুদ্ধ হইয়া গেল, মেঘলোকের উপরে অমরাবতীতে মহেন্দ্রের সঙ্গীত-সভায় যখন তাহা পৌছিল, তখনই সুরগায়ক তুম্বুরুর চমৎকার লাগিল, বিস্ময়ের আতিশয্যে

বীণার তারে আর অঙ্গুলিনিচয় খেলা করিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠ জড়ীভূত হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ দেবসভার সঙ্গীতোৎসব বন্ধ হইয়া গেল, সকল দেবতা—অপ্সরানিচয়, কিন্নরকুল নিস্তব্ধভাবে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া সেই বাঁশীর স্বরসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া রহিল। ক্রমে বংশীধ্বনি আরও উচ্চতর লোকে উঠিতে লাগিল। সত্যলোকের ধ্যাননিমগ্ন জীবন্মুক্ত সনক, সনাতন, সনন্দন প্রভৃতির নির্ব্বিকল্প নির্গুণ ব্রহ্মসমাধি ভাঙ্গিয়া গেল, সত্যলোকের অধিদেবতা চতুরানন ব্রহ্মার বিস্ময়-সাগর উথলিয়া উঠিল। কেবল যে সে বংশীধ্বনি উর্দ্ধেই উঠিয়াছিল, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাহা আধোলোকসমূহে প্রসারিত হইতে লাগিল। পাতালে বলিরাজের প্রাণে বংশীধারীর সেই মধুর আনন্দ-সান্দ্র মূর্ত্তি দেখিবার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া সেই স্বর আরও নীচে নামিতে লাগিল। ত্রিভুবন যাঁহার ফণামণ্ডলীর উপর অধিষ্ঠিত, সেই সর্ব্বাধার অনন্তদেবেরও দেহ সেই স্বরের উন্মাদনাময় আস্বাদনে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এইরূপে সপ্তলোককে আপূরিত করিয়া, সেই বংশীধ্বনি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পর্য্যাপ্ত অবকাশ না পাইয়া, বাড়িতে বাড়িতে প্রবল বেগে ব্রহ্মাণ্ডকটাহ-ভিত্তিতে এমন আঘাত করিতে আরম্ভ করিল যে, শেষে সে ভিত্তি চারিদিকেই ভাঙ্গিয়া পড়িল;—বংশীধ্বনি বিরজা পার হইয়া—ক্ষীরসমুদ্র পার হইয়া গোলোকের অভিমুখে অবিশ্রান্ত-বেগে ছুটিতে লাগিল।

কৃষ্ণদাসের কাব্যোচ্ছাস

কৃষ্ণপ্রেমে পাগল প্রেমের ঠাকুর শ্রীগোরাঙ্গদেব এই শ্যামের বাঁশীর বিশ্ববিমোহন স্বরলহরীর তত্ত্ব প্রিয়শিষ্য সনাতন গোস্বামীকে যেরূপে বুঝাইয়াছিলেন, তাহার পরিচয় বাঙ্গালার ভক্ত ভাবুক কবিকুলশিরোমণি কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে কেমন মধুরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, দেখুন—

"সনাতন! কৃষ্ণ-মাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন সন্নিপাতি, সব পিতে করে মতি,
দুর্দ্দৈব-বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু॥
কৃষ্ণাঙ্গ-লাবণ্যপুর মধুর হইতে সুমধুর
তাতে সেই মুখ-সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তার সেই স্মিত জ্যোৎস্নাভর॥

মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হইতে সুমধুর
তাহা হৈতে অতি সুমধুর
আপনার এক কণে ব্যাপে সব ত্রিভুবনে
দশ দিগে বহে যার পূর॥
স্মিত কিরণ সুকর্পূরে, পৈশে অধর মধুরে,
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশী ছিদ্র আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে
ধ্বনিরূপে পায়া পরিণামে॥
সে ধ্বনি চৌদিগে ধায় অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়
জগতের বলে পৈশে কাণে।
সভা মাতোয়াল করি বলেতে আনয়ে ধরি,
বিশেষত যুবতীর গণে॥
ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,
পতিকোল হইতে কাড়ি আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, সেই করে আকর্ষণে,
তার আগে কেবা গোপীগণে॥
নীবি খসায় পতি আগে গৃহকর্ম্ম করায় ত্যাগে
বলে ধরি আনে কৃষ্ণস্থানে।
লোকধর্ম্ম লজ্জা ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,
ঐছে নাচায় সব প্রাণিগণে॥
কাণের ভিতরে বাসা করে, আপনি তাঁহা সদা স্ফুরে,
অন্য শব্দে না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কাণ, আন বুলিতে বোলায় আন,
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে॥
"এই বেণুধ্বনি শুনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী
পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার।"

প্রাকৃত ভাবে বিপ্লব

বৈষ্ণব কবিগণের বর্ণিত এই বংশীধ্বনি হৃদয়তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনিত হইলে তাহ সকল সামাজিক শৃঙ্খলার প্রতিকূল ভাব ধারণ করে, পতিব্রতার ব্রত ভাঙ্গিয়

দেয়, পতির কোল হইতে তাহাকে শ্রীকৃষ্ণসন্নিধানে টানিয়া আনে, সুতরাং এ হেন সমাজ-বিপ্লবকর বংশীধ্বনি সদাচারনিরত শিষ্ট সামাজিকগণের পবিত্র কর্ণবিবরে প্রবেশের যোগ্য নহে। ইহা পাশব কাম-প্রবৃত্তিকে জাগাইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত শিষ্ট-সমাজে সর্ব্বনাশকর বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া থাকে, সুতরাং ইহা অশ্রাব্য ও সর্ব্বথা নিন্দনীয়; এই প্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। এই সমালোচনা প্রাকৃত সংসার-সর্ব্বস্ব ব্যক্তির পক্ষ হইতে হইবে, ইহা সম্ভাবনা করিয়া এই বংশীধ্বনির প্রথম দ্রষ্টা মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীমদ্‌ভাগবতের 'রাসপঞ্চধ্যায়ী'তে যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে এই শ্যামের বাঁশীর সুর শুনিবার যোগ্যতা কোন মানবেরই হইতে পারে না।

রঙ্গনাথের ছলনা

তাই সেই উত্তরের সারাংশ এখানে উদ্ধৃত হইতেছে,—

এই বংশীর আহ্বানে উন্মাদ-গ্রস্ত রোগীর ন্যায় লোকলজ্জা, ভয়, সম্ভ্রম ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া ব্রজগোপীগণ যখন দৌড়িতে দৌড়িতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে শরচ্চন্দ্র-চন্দ্রিকা-ধবলিত যমুনার বিমল সৈকতে নিকুঞ্জরাজিবিরাজিত রাসস্থলীতে শ্যামসুন্দরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন শ্যামসুন্দর হাসিতে হাসিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে অকম্পিত সুব্যক্ত স্বরে বলিলেন—

"স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ।
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ ব্রূতাগমনকারণম্॥
রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ॥
মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ।
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মা কৃদ্ধ্বং বন্ধুসাধ্বসম্॥
দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতম্।
যমুনানিললীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতম্॥
তদ্‌যাত মা চিরং গোষ্ঠং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ।
ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত॥
অথবা মদভিস্নেহাৎ ভবত্যো যন্ত্রিতাশয়াঃ।
আগতা হ্যুপপন্নং বঃ প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ॥

ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া।
তদ্‌বন্ধূনাং চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপালনম্‌॥
দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা।
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী॥
অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্‌।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ॥
শ্রবণাদ্‌ দর্শনাদ্‌ ধ্যানান্‌ ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্‌॥”

এই কয়টি শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, সৌভাগ্যবতী ব্রজবাসিনীগণ! পথে আসিবার সময়ে তোমাদের কোন ক্লেশ হয় নাই ত? বল, আমি তোমাদের কোন্‌ কার্য্য করিব। ব্রজের কুশল ত? অকস্মাৎ এমনভাবে ব্রজ ছাড়িয়া কেন তোমরা এখানে আসিয়াছ, তাহা স্পষ্ট করিয়া বল। এই ভয়ঙ্করী রাত্রি—এই সময় জনসঞ্চারশূন্য বনে বহু প্রকার হিংস্র প্রাণী বিচরণ করিয়া থাকে, তাই বলি, শীঘ্র ব্রজে ফিরিয়া যাও, এই সময় এখানে তোমাদের ন্যায় কোমলাঙ্গী বনিতাগণের অবস্থিতি সমুচিত হইতে পারে না। তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও ভর্ত্তা সকলেই ব্যাকুল হইয়া, তোমাদিগকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সাহসের কার্য্য করিয়া তাঁহাদিগের মনে ভীতির সঞ্চার করিও না। এখানে আসিয়া পড়িয়াছ, আসার ফলও যে কিছু না হইয়াছে, তাহা নহে; যমুনার স্নিগ্ধ সান্ধ্যসমীর সঞ্চারে কম্পিত তরুপল্লবনিচয়ে মনোহর পূর্ণিমার বিমল চন্দ্রালোকে ধবলিত কুসুমিত সুন্দর কানন ত দেখা হইয়াছে, আর কেন এখানে থাকা? যাও পতিব্রতাগণ, শীঘ্র ব্রজে ফিরিয়া যাও, পতিশুশ্রূষায় নিরত হও—গো-বৎসগণ সায়ংকালের গো-দোহন না হওয়াতে গোষ্ঠে বাঁধা রহিয়াছে, যাইয়া গো-দোহন কর। তাহাদিগকে দুগ্ধ পান করাও, আর তোমাদের বালকগণকেও দুগ্ধ পান করাও, তাহারা ক্ষুধায় ক্রন্দন করিতেছে। আমি বুঝিতেছি, আমাকে তোমরা ভালবাসিয়াছ, সেই ভালবাসা তোমাদের অন্তঃকরণকে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিয়াছে। সেই জন্যই তোমরা এমন অসময়ে এমন করিয়া আমার নিকট আসিয়া পড়িয়াছ, ইহাতে কোন দোষ নাই। কারণ, প্রাণী মাত্রই আমাকে ভালবাসিয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া তোমরা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ, ইহা ঠিক নহে। কারণ, অকপটভাবে ভর্ত্তার সেবা করাই স্ত্রীজাতির পরম ধর্ম্ম। শুধু তাহাই

নহে, ভর্ত্তার যাহারা আত্মীয়, তাহাদের কল্যাণসাধনও স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম এবং পুত্র-কন্যাগণের পালনও তাহাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য। যে সকল রমণী ইহলোকে-পরলোকে শ্রেয়ঃ কামনা করিয়া থাকে, পতি যদি অসুন্দর হয় কিম্বা অসচ্চরিত্র কিম্বা দরিদ্র অথবা সে বৃদ্ধ, জড়, অভাগা কিম্বা রোগীও হয়, তবুও তাহাকে পরিত্যাগ করা তাহাদের উচিত নহে; কেবল মহাপাতকগ্রস্ত পতি যদি প্রায়শ্চিত্ত-পরাঙ্মুখ হয়, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে, অন্যথা নহে। মনে রাখিও, স্ত্রীলোকের পক্ষে ভর্তৃব্যতিক্রম অর্থাৎ উপপতির সেবা নরকপাতের কারণ, অকীর্ত্তিকর, ক্লেশজনক, ভয়-হেতু ও তুচ্ছ-ফলপ্রদ; সকল মনুষ্যসমাজে এই ভর্তৃব্যতিক্রম নিন্দিত হইয়া থাকে, সুতরাং কুলললনাগণের ইহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। আমাকে ভালবাসিতে চাহ, ভালবাস—তাহাতে কোন দোষ নাই, সেই ভালবাসাকে ঘনীভূত করিতে চাহ ত আমার কথা শ্রবণ কর, আমাকে গৃহে বসিয়া ধ্যান করিও, অবসরমত আমাকে দর্শন করিও, আর পার ত মুক্তকণ্ঠে আমার গুণলীলা কীর্ত্তন করিও, কিন্তু এমন করিয়া কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া আমার সহিত এমন সন্নিকর্ষ করিও না। তাই বলি, ব্রজসুন্দরিগণ, এখনও সময় আছে, শীঘ্র তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও।"

অধর্ম্ম-বিপ্লব বিধ্বস্ত করিয়া সনাতন ধর্ম্মের সমুজ্জ্বল শুদ্ধ আদর্শ সংসারে স্থাপন করিবার জন্য যিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, সেই ধর্ম্মমূর্ত্তি বাসুদেবের, সকল ধর্ম্মের সার প্রেমভক্তিরূপ বিশ্বজনীন ধর্ম্মের সংস্থাপনের শুভ মুহূর্ত্তে এইরূপ সারগর্ভ উপদেশ যেমন সুন্দর ও সুসঙ্গত, তেমনই ইহা তাঁহার অন্তর্নিহিত অতি গম্ভীর উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে একান্ত অনুকূল, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

গোপীগণের অবসাদ

প্রাণারাম দেবতার দেবতা প্রিয়তমের মুখে এই অসম্ভাবিত উক্তি শ্রবণ করিয়া, —মাধুর্য্য-ভক্তির আদর্শ ব্রজগোপীগণের কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহারা শ্রীভগবানের এই কর্কশ হিতবচনের কি প্রতিবচন দিয়াছিল, তাহা মধুররসের মাধুর্য্যমণ্ডিত ভাগবতের মধুরতম কবিতাতেই ব্যক্ত হওয়া সম্ভব ও সুসঙ্গত। তাই ভাগবত বলিতেছেন,—

"ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণ্য গোপ্যো গোবিন্দভাষিতম্।
বিষণ্ণা ভগ্নসংকল্পাশ্চিন্তামাপুর্দুরত্যয়াম্॥

শ্রীগোবিন্দের মুখে এই অপ্রিয় কথা শ্রবণ করিয়া ব্রজগোপীগণ নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িল; কারণ, তাহাদের চিরনিরূঢ় কৃষ্ণসেবার সংকল্প যেন ভাঙ্গিয়া গেল। তখন তাহারা অপার চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইল। তখন তাহারা কি করিল ?—

"কৃত্বা মুখান্যবশুচঃ শ্বসনেন শুষ্যদ্‌বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবং লিখন্ত্যঃ।
অস্ত্রৈরুপাত্তমসিভিঃ কুচকুঙ্কুমানি তস্থুর্মৃজন্ত্য উরুদুঃখহতাঃ স্ম তূষ্ণীম্‌॥
প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং কৃষ্ণং তদর্থবিনিবর্ত্তিত-সর্ব্বকামম্‌।
নেত্রে বিমৃজ্য রুদিতোপহতে স্ম কিঞ্চিৎ সংরম্ভগদ্‌গদগিরোঽব্রুবতানুরক্তাঃ॥"

অবসাদকর শোকের গুরু আশঙ্কায় তাহাদের বক্ষঃস্থল আলোড়িত করিয়া যে প্রতপ্ত দীর্ঘশ্বাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার তীক্ষ্ণ স্পর্শে তাহাদের সুপক বিম্বফলের ন্যায় সুরুচির কোমল অধর ক্ষণকালের মধ্যে নীরস শুষ্ক হইয়া উঠিল। তাহাদের সমুন্নত বক্ষঃস্থলে লিপ্ত কুঙ্কুমাবলি অবিরলোদ্‌গত নয়নকজ্জল-বিবর্ণীকৃত অশ্রুধারায় প্রক্ষালিত হইয়া গেল। গুরু দুঃখানুভূতির বিবশতায় তাহাদের মুখে অনেকক্ষণ ধরিয়া কোন কথাই বাহির হইতে পারিল না।

রূঢ়তার প্রতিবাদ

যিনি আত্মা হইতেও প্রিয়তম, তিনিই এমন করিয়া ডাকিয়া আনিয়া এত রূঢ় কথা বলিতেছেন কেমন করিয়া? এই ভাবিতে ভাবিতে অনেকক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া শেষে তাহারা—যাহারা কৃষ্ণসেবার জন্য সকল কাম বিসর্জ্জন করিয়াছিল—তাহারা বেদনাশ্রুভারবিবশীকৃত লোচনদ্বয় বসনাঞ্চলে যথাসম্ভব মুছিয়া ফেলিল, প্রেম-সংরম্ভের তীব্র আবেগে তাহাদের কণ্ঠ জড়ীকৃত হইতেছিল, অতর্কিতভাবে চরণ-নখের দ্বারা ভূমিতে কি লিখিতেছিল, তাহা তাহারা নিজেই বুঝিতেছিল না; তথাপি কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া একটু আশ্বস্ত হইয়া তাহারা অতি সাবধানতার সহিত এই কয়টি প্রাণের কথা এই ভাবে প্রাণারাম শ্রীগোবিন্দকে জানাইয়াছিল—

"মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্‌ গদিতুং নৃশংসং সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্‌।
ভক্ত্যা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্‌ দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষুম্‌॥"

হে প্রভো! আপনি স্বতন্ত্র, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু তাই বলিয়া এ সময়ে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আপনার এইরূপ কঠোর অভিভাষণ যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না; কেন পারে না, তাহা বলি, শুনুন—আমরা—

আমার বলিবার যাহা কিছু এ সংসারে ছিল বা আছে, অথবা হইতে পারে, তাহা সকলই একেবারে অনন্তকালের জন্য উপেক্ষা করিয়া আপনার পাদমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। আমরা বেশ বুঝিয়াছি, তুমি কাহারও কাছে ধরা দিবার পাত্র নহ, কিন্তু আমরাও ছাড়িবার পাত্র নহি। কারণ, আমরা তোমার ভক্ত, আদিপুরুষ পরব্রহ্ম যেমন সংসারবিরত মোক্ষার্থী জ্ঞানী পুরুষদিগকে নিরাশ করেন না, প্রত্যুত তাঁহাদিগকে আত্মভাবে ভজনা করেন, তুমিও প্রভো, তোমার একান্ত ভক্ত আমাদিগকে নিরাশ করিয়া ছাড়িও না, প্রত্যুত সেই আদিপুরুষের ন্যায় আমাদিগকে গ্রহণ কর।

বৈধ আচারে অপর্য্যাপ্তি

আমরা সকলকে ছাড়িয়া কেন তোমার শরণ গ্রহণ করিতেছি, তাহাও শুন—

"যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং নমু বন্ধুরাত্মা॥"

তুমি সত্যই ধর্ম্মজ্ঞ বটে, কিন্তু মর্ম্মজ্ঞ নহ। তুমি ব্রজগোপীগণকে উপদেশ দিয়াছ যে, পতি, পুত্র, কন্যা ও সুহৃদ্গণের সেবাই নারীর স্বধর্ম্ম.—আমরা বলি শুন, এই ধর্ম্মোপদেশদাতা তোমাকেই যদি আমরা ভজনা করিতে পারি, তাহা হইলে কি আমাদের পতিসেবা, পুত্রসেবা, কন্যাসেবা ও সুহৃৎসেবা—একাধারে সুসম্পন্ন হইবে না? নিশ্চয়ই হইবে, তাহার কারণ এই যে, তুমিই একমাত্র সকলের আত্মা—তুমিই একমাত্র সকলের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম, ইহাই যদি সকল শাস্ত্রের—সকল উপনিষদের সার রহস্য হয়, তবে তোমার সেবা করিলে আমাদের পতিসেবা হইবে না, পুত্র-কন্যা-সেবা হইবে না, সুহৃৎ-সেবা হইবে না, ইহা শাস্ত্ররহস্যজ্ঞ কোন্ ধর্ম্মবিৎ বলিতে সাহস করে—তাহা তুমি প্রভু, আমাদিগকে বুঝাইয়া দেও।

উৎসর্গে পরমানন্দ

শ্যামের বাঁশীর ইহাই বিশেষত্ব যে, ইহার সুরের স্বর্গীয় ঝঙ্কারে কেবল বেহাগ, খাম্বাজ, ললিত, বিভাষ, ভৈরবী প্রভৃতি রাগ-রাগিণীই যে ফুটিয়া উঠে, তাহা নহে; কিন্তু ইহা কানের ভিতর দিয়া প্রাণের মরমে পশিয়া সিদ্ধ সাধকের জন্ম-জন্মান্তর-সঞ্চিত অন্তঃপ্রসুপ্ত ভাবরাজ্যকে চির-নূতন আনন্দময় আলোকের সাহায্যে নিত্য নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলে; তাই রাসলীলার শুভ আরম্ভক্ষণে গো-পালননিরত আজন্ম অশিক্ষিত গোপললনাগণের কর্ণে এই বাঁশীর স্বর

প্রবেশ করিয়া বংশীধরের চরণপ্রান্তে তাহাদিগকে টানিয়া আনিয়া যে আনন্দসান্দ্র চিন্ময় রসঘন বিগ্রহ দর্শন করাইয়াছিল, তাহাই উপনিষদের চরম প্রতিপাদ্য; তাহাই যোগিরাজবৃন্দের এক মাত্র ধ্যেয়, তাহাই জ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা এবং ভক্তের ভগবান্।

এই বাঁশীর যে ভাববিবর্ত্ত মনের বৃন্দাবনে ফুটিয়া উঠে, তাহাই বুঝাইতে যাইয়া ভক্ত কবি গাহিয়াছেন—

"ঐ যে শ্যামের বাঁশী বাজিছে বিপিনে।
বাঁশী, বনে বাজে কি মনে বাজে, তা ত বুঝি নে॥
বাজে বাঁশী, 'দে মা ননী'
শুনে নন্দরাণী—
'মাথায় বাঁধা দাও গো তুলে' নন্দরাজ শুনে।
রাখালবালক শুনে বাঁশী 'চল সখা বনে'।
আর—রাধানামে সাধা বাঁশী কিশোরীশ্রবণে॥

(৩)

কুশল-চর্চ্চায় বিরাগ

ব্রজগোপিকাগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মানসিক বৃত্তি রাসারম্ভের পূর্ব্বে বাঁশীর স্বর শুনিয়া কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে রাসলীলার রহস্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। তাই রাসলীলারম্ভের পূর্ব্বে রাসস্থলীতে সমবেত ব্রজগোপিগণের মুখেই ভগবান্ বেদব্যাস ব্যক্ত করিয়াছেন। বাঁশীর রবে উন্মনা হইয়া, পতি, পুত্র, স্বজন, গৃহ ও কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া যাহারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য রাসস্থলীতে সমবেত হইয়াছিল, কুলটা-জনোচিত পাশববৃত্তির চরিতার্থতাসাধন তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, ইহা আমরা পূর্ব্বোদ্ধৃত ভাগবতের শ্লোকে দেখাইয়াছি। তাহাদিগের আর একটি উক্তিও এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানের যোগ্য।

"কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্
নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিম্।
তন্নঃ প্রসীদ পরমেশ্বর মা স্ম ছিন্দ্যা
আশাং ভৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই—হে অরবিন্দনয়ন, যাহারা কুশল অর্থাৎ শাস্ত্র-তাৎপর্য্যের পরিজ্ঞাতা, তাহারা তোমাকেই ভালবাসিয়া থাকে। কেন ভালবাসে, তাহার কারণ, তুমিই সকলের আত্মা। শাস্ত্রেই বলিয়াছে, আমরা প্রজা অর্থাৎ সন্ততি প্রভৃতি লইয়া কি সুখ পাইব? পুত্র বল, পতি বল, ধন বল, স্বজন বল, এ সংসারে প্রাকৃত লোকসমূহ যাহা যাহা সুখের হেতু বলিয়া জানে, তাহারা কেহই সুখ দিতে পাবে না, প্রত্যুত তাহারা সকলেই মানসিক পীড়া বা অবিশ্রান্ত উদ্বিগ্নতারই কারণ হইয়া থাকে। যাহারা আত্মাকে বুঝে না, আত্মার সাক্ষাৎ অনুভূতি দেহাত্মাভিমানের আবরণবশতঃ যাহাদের হয় নাই, তাহাদেরই নিকট পতি, পুত্র, ভার্য্যা, ধন, জন, ঐশ্বর্য্য ও পারলৌকিক সমৃদ্ধি সুখের হেতু বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। সুতরাং সেই সকল পতি, সুত প্রভৃতি দ্বারা আমাদিগের কি লাভ হইবে? আমরা তোমাকে অর্থাৎ আমাদের সকলের আত্মাকে যখন তোমারই কৃপায় পাইয়াছি—হে পরমেশ্বর, তুমি প্রসন্ন হও। অনাদিকাল হইতে তোমাকে পাইবার জন্য, পাইয়া সেবা করিবার জন্য আমরা যে বড় আশা মনে মনে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি, তুমি সে আশা ছিন্ন করিও না, ইহাই তোমার চরণে আমাদিগের প্রার্থনা।

অদ্বৈতের অতিক্রম

এই যে গোপীগণের মনোবৃত্তি, ইহাকে কি বলা যাইতে পারে? ইহা অদ্বৈতবাদীর সম্মত ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞান হইতে পারে না। কারণ, সেই বিজ্ঞান যাহার হইয়াছে, তাহার এ সংসারে কোন বিষয়েই আশা বা আকাঙ্ক্ষা সম্ভবপর নহে। তাহার নিকটে এ সংসারে সকল বস্তু মায়িক বলিয়া প্রতীত হয়। সুখের অনুভূতির জন্য সে লালায়িত হয় না। দুঃখের প্রতিও তাহার কোনরূপ বিদ্বেষ থাকে না। কারণ, তাহার চক্ষুতে প্রপঞ্চের সুখ ও দুঃখ একজাতীয় বস্তু, অর্থাৎ তাহারা দুইই কল্পিত, কেহই সত্য নয়। আমরা কিন্তু উক্ত শ্লোকে দেখিতে পাইতেছি যে, ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে আত্মভাবেও দেখিতেছে অথচ সেই সঙ্গে প্রার্থনাও করিতেছে যে, তোমার সেবার জন্য আমাদিগের চিরসঞ্চিত আশাকে ছিন্ন করিও না, তুমি প্রসন্ন হও, আমাদিগকে তোমার সেবা করিবার অবসর দাও—শক্তি দাও। তোমার সেবা হইতে আমরা যেন আর কখনও বঞ্চিত না হই। এরূপ প্রার্থনা যে করে, সে কখনই

অদ্বৈত-জ্ঞানসম্পন্ন নহে। সেব্যসেবক ভাব তাহার জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় অথচ সে বলিতেছে, তোমাকে আত্মা বলিয়াই বুঝিয়াছি। আত্মাকে ছাড়িয়া আমরা আর কাহাকেও চাহি না। এ বড় বিষম সমস্যা। শ্রুতি বলিতেছেন—"যস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ কেন কং পশ্যেৎ কেন কং বিজানীয়াৎ"। যাহার নিকট সবই আত্মা বলিয়া প্রতীত হয় অর্থাৎ আত্ম-ব্যতিরিক্ত কোন বস্তুরই পৃথক্ সত্তা আছে, এই জ্ঞান যাহার লুপ্ত হইয়াছে, সে কোন্ প্রমাণের সাহায্যে কোন্ বস্তুর বিজ্ঞাতা হইবে? কোন্ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সে কাহাকে দেখিবে? দার্শনিকগণেরও চিত্তভ্রান্তিকর এই বিষম সমস্যার সমাধান করিবার জন্যই শ্যামের বাঁশী রাসলীলার আরম্ভক্ষণে বাজিয়া উঠিয়াছিল। এই বাঁশীর স্বরলহরীতে ভক্তহৃদয়ে যে ভাবসমুদ্র উদ্বেলিত হয়, তাহারই পরিচয় দিতে যাইয়া কোন ভক্ত কবি গাহিয়াছেন :—

"অদ্বৈতবোধাব্ধিতলে নিমগ্নাঃ প্রশান্ততাপা নিভৃতা নিরীহাঃ।
বয়ং যদীয়ে কলবেণুনাদে দাসীকৃতা গোপসুতং নুমস্তম্॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—দীর্ঘকাল শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের প্রভাবে আমরা অদ্বৈতজ্ঞানরূপ নিরবধি সমুদ্রের তলভাগে তলাইয়া গিয়াছিলাম। ভেদবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন সকল প্রকার পাপ-তাপ আমাদিগের শান্ত হইয়া গিয়াছিল। আত্মস্বরূপ আনন্দের উদয়ে আমাদিগের সকল চেষ্টাই নিবৃত্ত হইয়াছিল। এই আনন্দময় অবস্থাকে পাইয়া আমরা পরিপূর্ণ শান্তিকে লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু হঠাৎ যাঁহার কলবেণুনাদ—আমাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে সেবার জন্য সমুদ্যত দাসীরূপে পরিণত করিয়াছে, সেই গোপতনয় শ্রীকৃষ্ণকে আমরা স্তুতি করিতেছি।

সাক্ষাৎকারে প্রাণীমাত্রের আবেশ

যোগ, ধ্যান, ধারণা ও তপস্যা প্রভৃতির প্রভাবে যাঁহাদিগের অন্তঃকরণ জন্মজন্মান্তরের অর্জ্জিত অশুদ্ধিমলকে পরিহার করিয়া স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় সর্ব্বাত্মভূত অখণ্ডৈকরস সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, কেবল তাহাদিগেরই হৃদয়ে এইরূপ ভাবান্তর উৎপাদন করিতেই যে বাঁশী সমর্থ, তাহা নহে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

"ধন্যাস্তু মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্য এতা যা নন্দনন্দনমুপাত্ত-বিচিত্রবেশম্।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহ কৃষ্ণসারাঃ পূজাং দধুর্বিরচিতাং নয়নোপহারৈঃ॥"

গোপবালকোচিত-বিচিত্রবেশধারী সেই নন্দনন্দনকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া, তাঁহার কলবেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিজ নিজ পতির সহিত মিলিত হরিণীগণ ধন্য। যেহেতু, তাহারা বিস্ফারিত বিস্ময়স্তিমিত সমুজ্জ্বল নয়নের দ্বারা তৎকালে তাঁহার উপযুক্ত পূজা করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। ভাগবত আরও বলিতেছেন—

"কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগা পুলকান্যবিভ্রন্॥"

হে ভুবনসুন্দর! তোমার বেণু হইতে নির্গত অব্যক্ত মধুর প্রাণস্পর্শী গীত যাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, এমন কোন্ মানবী আছে যে, সম্মোহিত হইয়া আর্য্যগণসেবিত ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? তাহার উপর আবার এই যে তোমার রূপ, যাহার এক অংশের দ্বারা সকল সৌন্দর্য্য, সকল মাধুর্য্য পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, সেই এই রূপও যে নারীর নয়নপথের পথিক হয়, সেও সম্মোহিত হইয়া কুলধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতে অণুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করে না। না করিবারই ত কথা, সে ত মানবী, তাহারও ত সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার শক্তি আছে। ঐ দেখ, তোমার আশে-পাশে, সম্মুখে, পশ্চাতে ব্রজের গোসমূহ, বৃন্দাবনের বৃক্ষনিচয়, আকাশের পক্ষিসমূহ ও অরণ্যের মৃগকুল এই রূপ দেখিয়া ঐ বাঁশীর সেই কলকাকলীময় ধ্বনি শ্রবণ করিয়া রোমাঞ্চিত শরীরে নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে।

নিখিলের শিহরণ

বৃন্দাবনচন্দ্র শ্যামসুন্দরের এই মধুর বংশীনিনাদে ব্রহ্মজ্ঞানীর শুষ্ক অদ্বৈতজ্ঞানকে স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় যেমন ভাসাইয়া দেয়, তেমনই আজন্ম অশিক্ষিত, কায়মনোবাক্যে গৃহকর্ম্মনিরত ব্রজের কুলললনাগণের অহংভাবাবিষ্ট সরল অন্তঃকরণে সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিত সচ্চিদানন্দরসঘন পরমাত্মার অখণ্ডস্বরূপ সমুদ্ভাসিত করে। বনের মৃগ, গাছের পাখী, ব্রজের গাভীকে চিরাভ্যস্ত কর্ম্মসমূহ হইতে নিবৃত্ত করিয়া আনন্দঘন সৌন্দর্য্যময় রসরূপ ব্রহ্মের আস্বাদন করাইয়া নিস্তব্ধ, রোমাঞ্চিত ও আনন্দবিহ্বল করিয়া তুলে। এ বাঁশীর স্বরে বাতাসের গতি রুদ্ধ হইয়া যায়, নদীর স্রোত প্রতিকূলবাহী হয়, বৃক্ষলতা প্রভৃতির প্রত্যেক অঙ্গ শিহরিয়া উঠে, ইহাই উল্লিখিত শ্লোক কয়টির দ্বারা সুব্যক্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। রাসলীলারম্ভের পূর্ব্বে শ্যামের বাঁশীর এই অপূর্ব্ব রহস্য ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতরচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস ইহাই প্রতিপাদন

করিয়াছেন যে, মানবাত্মার পূর্ণ পরিতৃপ্তি কেবল বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানেরই উপর নির্ভর করে না।

সার্থক মানবত্ব

মানবের আকৃতি, মানবের প্রকৃতি, মানবের দেহ, মানবের বাহ্য আভ্যন্তর ইন্দ্রিয়ের রীতি-নীতি, গঠনপ্রণালী ও কার্য্যসমূহের গূঢ় রহস্যের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, এ সংসারে মানবের সৃষ্টি উদ্দেশ্যহীন নহে। সে উদ্দেশ্য কি? দার্শনিক ভারত অনাদিকাল হইতে বলিয়া আসিতেছে যে, মানবজীবনের চরম বা পরম উদ্দেশ্য হইল মুক্তি বা নির্ব্বাণ। এ মুক্তি বা নির্ব্বাণ যদি কখনও মানবের ঘটে, তখন তাহার আপনার বলিবার কিছুই থাকে না। যাহার জন্য সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে এ পর্য্যন্ত সে অবিশ্রান্তভাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছে, সেই তাহার আত্মার বা জীবস্বরূপের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত এই নির্ব্বাণে ভাঙ্গিয়া যায়। যাহার দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশের জন্য সে মুক্তিপথের পথিক হয়, তাহার সেই প্রিয় আত্মাই পুনরাবৃত্তিরহিতভাবে যে সচ্চিদানন্দব্রহ্মে মিশিয়া যায়, তৎকালে সে আনন্দের অনুভূতি তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এই মুক্তি যদি মানবসৃষ্টির চরম লক্ষ্য হয়, তবে তাহার এই যে মানবদেহ, যাহার প্রতি অঙ্গের সমাবেশবৈচিত্র্যে সেবার অপূর্ব্ব উপযোগিতা বিস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, সে মানবদেহ নির্ম্মাণের জন্য বিধাতৃপুরুষের অসাধারণ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। এ মুক্তি ত সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহার ছিল, তবে আবার সেই মুক্তি পাইবার জন্য এ সেবার সামগ্রীসম্ভারে সুরচিত মনুষ্যদেহ নির্ম্মাণের জন্য জগৎকর্তার এত প্রয়াস কেন? এই প্রশ্নের সদুত্তর অদ্বৈতজ্ঞানের আচার্য্যগণের নিকট হইতে শুনিবার জন্য মানবসমাজ চিরদিন উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সে সদুত্তর এখনও তাহার কর্ণবিবরে প্রবেশ করিয়া তাহার ঔৎসুক্যময় অন্তরাবরণকে শান্ত করিতে পারে নাই।

মুক্তির উর্দ্ধে কৃষ্ণসেবা

মানবজীবনের লক্ষ্যনির্ণয় বিষয়ে—এই অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত আকুলতা, উৎকণ্ঠা ও সংশয়কে দূর করিয়া মানবপ্রকৃতির অনুগত মানবের একান্ত ঈপ্সিত, মানবাত্মার চিরাভীপ্সিত উদ্দেশ্যের আনন্দময় মূর্ত্তি হৃদয়ে গাঢ় অঙ্কিত করিয়া দিবার জন্য শ্রীমদ্‌ভাগবতকার মহর্ষি বেদব্যাস রাসলীলা বর্ণনা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এ রাসলীলার উদ্দেশ্য মুক্তি নহে, কিন্তু

মুক্তের পক্ষেও স্পৃহণীয়—মানবাত্মার পরিপূর্ণতাবিধায়ক প্রীতিময় সেবাধর্ম্ম। এ সেবা কাহার? যাহার অপেক্ষা সুন্দর সংসারে নাই, যাহা অপেক্ষা মধুর মানবের কল্পনার অতীত, সৌন্দর্য্যের, লাবণ্যের, মাধুর্য্যের, পবিত্রতার ও অখণ্ডিত মহিমার যাহা একমাত্র আধার, যাহার সত্তায় প্রপঞ্চের সকল বস্তু সত্তাযুক্ত হইয়া থাকে, যাহার অস্তিত্বের উপর চেতন অচেতন সকল বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে, যাহার প্রকাশে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র, বিদ্যুৎ ও অগ্নি প্রভৃতি প্রকাশিত হয়, যাহার অনুভূতির উপর সকল সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের অনুভূতি নির্ভর করিয়া থাকে, সেই রসোজ্জ্বল-বিগ্রহ রসিক-শেখর প্রাণ-জীবের আত্মভূত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবাই হইল মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। এই সেবার অগ্রে আনন্দ, মধ্যে আনন্দ, পশ্চাতেও আনন্দ। এই সেবা আনন্দের কারণ নহে, কিন্তু ইহাই সাক্ষাৎ রসঘন অনাবিল আদ্যন্তরহিত পূর্ণানন্দ। এই সেবানন্দের অধিকারী হইতে হইলে মানবকে সৌন্দর্য্যানুভূতির যোগ্যতা লাভ করিতে হয়। দেহাত্মভাবের পরিচ্ছিন্নতায় আবদ্ধ মানবে এই অনাবিল ঈশসৌন্দর্য্যের অনুভব করিবার শক্তি থাকে না। এই সৌন্দর্য্যের অনুভূতি মানবের যে পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত মানব হয় সাংসারিক জীবই থাকে, না হয় সে সংসারের জ্বালা-তাপ এড়াইবার জন্য মুক্তিপথের পথিক হইতে চাহে, কিন্তু সে ভক্ত বা ভগবৎ-সেবক হইতে পারে না। এই সর্ব্বানর্থকর দেহাত্মভাবকে ভাঙ্গিয়া দিতে হইলে পরমাত্মসৌন্দর্য্যের অনুভবের একমাত্র কারণ—সাধন-ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে জ্ঞান-গর্ব্বিত শুষ্ক চিত্তে সাধন ভক্তির প্রবেশ-সম্ভাবনা নাই। এই সকল সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইলে এবং বুঝিয়া সেবাধর্ম্মের অধিকারী হইতে হইলে শ্যামের বাঁশীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। ভক্তিসিদ্ধান্তের এই অপূর্ব্ব রহস্য বুঝাইবার জন্যই রাস-লীলায় শ্যামের এই অপূর্ব্ব বংশীধ্বনি হইয়াছিল।

সাহিত্যে শ্রীরাধা

(১)

বৈষ্ণব সার-তত্ত্ব

বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সাহিত্যে শ্রীমতী রাধিকার যে রসভাবময়ী সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার মুখ্য উপকরণ কোথা হইতে কি ভাবে আসিয়াছে, এ প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে রাধার স্থান অতি উচ্চে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, বাঙ্গালার রসভাব-সমুজ্জ্বল বৈষ্ণবদর্শনের বা শ্রীগৌরাঙ্গদেব-প্রবর্ত্তিত অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের মূল ভিত্তি শ্রীরাধা। পুরাণ এই ভিত্তির শিলান্যাস করিয়াছে, তন্ত্র ইহার সংগঠন করিয়াছে, সংস্কৃত ভাষার অমর কবিগণ ইহাকে সুধা-লিপ্ত করিয়াছেন, আর সর্ব্বশেষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রেমময় তুলিকায় রসের বিচিত্র বর্ণরাজিতে ইহাকে সুচিত্রিত করিয়া, জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন। একাধারে ভারতীয় সকল দর্শনের সারতত্ত্ব ও ভারতীয় রস-শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য যদি কেহ দেখিয়া নির্বৃতি লাভ করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় হইতেছে—গৌড়ীয় কবি ও ভক্ত দার্শনিকগণের কল্পনাময় ভাব-তুলিকায় সুচিত্রিত এই রাধাতত্ত্ব।

পুরাণ-তন্ত্রে মূল

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সর্ব্বপ্রধান উপজীব্য শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যক্তভাবে শ্রীরাধিকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রধান বিষ্ণুপুরাণে রাধিকার কোন উদ্দেশই নাই, হরিবংশে বা মহাভারতের কোথায়ও রাধার নামগন্ধ নাই, পদ্মপুরাণের মধ্যে প্রচুরভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইলেও শ্রীরাধিকার অস্তিত্বের প্রমাণ নিতান্তই অল্প। * ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণে এই রাধাতত্ত্ব বিশদভাবে কতকটা প্রস্ফুটিত হইলেও, উহার প্রামাণিকতা বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ করিয়া থাকেন, কেবল বৃহদ্গোতমীয়

---

* চৈতন্যচরিতামৃতে—পদ্মপুরাণের বলিয়া এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

"যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা।"

তন্ত্রে শ্রীরাধিকার তত্ত্ব অতি বিস্পষ্টভাবে অথচ সূত্ররূপে মাত্র বর্ণিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥"

বৃহদ্‌গৌতমীয় তন্ত্রের এই মূল বচনটিকে অবলম্বন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যে ভাবে শ্রীরাধিকার তত্ত্ব বিশদীকৃত ও বিস্তারিত করিয়াছেন, তাহা পরে যথাস্থানে প্রতিপাদিত হইবে। পুরাণে, তন্ত্রে ও শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীরাধাকে শ্রীভগবানের পরাশক্তিরূপে যে বর্ণনা করা হইয়াছে, সে বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সংস্কৃত সাহিত্যে শ্রীরাধাকে আমরা কি ভাবে দেখিতে পাই এবং কোন্ সময় হইতে লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যে শ্রীরাধার মূর্ত্তি চিত্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহারই আলোচনা আপাততঃ করা যাইতেছে।

ধ্বন্যালোকে সূচনা

পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্ম-সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলে—শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কৃত কাব্য ও নাটকে শ্রীরাধার নাম কত দিন হইতে পাওয়া যায়, তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে নির্ণয় করা কঠিন। কারণ, এখনও সংস্কৃত-সাহিত্যের অন্তর্গত বহু পুস্তকের নাম মাত্রই আমরা জানিতে পারিলেও ঐ সকল পুস্তক আমাদের এখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কিন্তু যে সকল প্রামাণিক সাহিত্য গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে বেশ বুঝা যায় যে, খ্রীষ্টজন্মের পরবর্ত্তী নবম শতাব্দী হইতেই সংস্কৃত-সাহিত্যে শ্রীরাধার নাম ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পূর্ব্বে সংস্কৃত-সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণাবতার-লীলাবর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীরাধার প্রসঙ্গ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। নবম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবযুগের আরম্ভাবধি এই দীর্ঘকালের মধ্যে যে সকল সংস্কৃত কবি অল্প বা বিস্তরভাবে স্বকৃত সাহিত্যে শ্রীরাধার বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহারা কিন্তু কেহই রাধাকে শ্রীকৃষ্ণের পরাশক্তি বা হ্লাদিনীর সার প্রেমভক্তির পূর্ণ আদর্শ বলিয়া বর্ণন করেন নাই; প্রত্যুত সকলেই তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেমার্থিনী সমাজভয়বিহ্বলা পরকীয়া গোপরমণীরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। কয়েকটি উদাহরণ দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

নবম শতাব্দীর শেষভাগে প্রসিদ্ধ অলঙ্কারাচার্য্য আনন্দবর্দ্ধন জীবিত

ছিলেন। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ধ্বন্যালোকনামক অলঙ্কার-গ্রন্থে আমরা তাঁহার উদ্ধৃত দুইটি শ্লোকে শ্রীরাধার উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা—

"দুরারাধ্যা রাধা সুভগ যদনেনাপি মৃজতঃ
তবৈতৎ প্রাণেশাজঘনবসনেনাশ্রু পতিতম্।
কঠোরং স্ত্রীচেতস্তদলমুপচারৈর্বিরম হে
ক্রিয়াৎ কল্যাণং বো হরিরনুনয়েষ্বেবমুদিতঃ।"

এই শ্লোকটির রচনা-প্রণালী দেখিলে বোধ হয়, ইহা কোন নাটকের অথবা কাব্যের মঙ্গলাচরণ-শ্লোক। কোন্ গ্রন্থ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা আনন্দবর্দ্ধন বলেন নাই অথচ ইহা আনন্দবর্দ্ধনের স্বরচিত শ্লোক নহে, তাহাও ঠিক। কারণ, ধ্বন্যালোক গ্রন্থে তাঁহার নিজ কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বত্রই তিনি "যথা মম" এই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিতে যাইয়া তিনি কেবল 'যথা চ' এইরূপই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য এইরূপ—

"রাধার আরাধনা যে বড়ই দুঃখের, তাহা সত্য, কারণ, হে সুভগ! তোমার যে বড়ই প্রিয়তমা—তাহার পরিহিত বস্ত্রেরই অঞ্চল দিয়া তুমি আমার এই নয়নের পতিত অশ্রুধারা মুছাইতেছ, (আর বলিতেছ) স্ত্রীলোকের হৃদয় বড়ই কঠোর, থাক, আর প্রিয়বচন বা নব নব সেবার উপচারদ্রব্যের আবশ্যক নাই, তুমি বিরত হও। বহু বার অনুনয়কালে শ্রীরাধা যাঁহাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, সেই হরি তোমাদিগের মঙ্গলবিধান করুন।"

খণ্ডিতা নায়িকা

এই শ্লোকে অভিমানিনী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অবিনয় দর্শনে রোদন করিতেছেন, তাঁহার দুই চক্ষু হইতে ধারা বহিয়া অশ্রু পতিত হইতেছে আর শ্রীকৃষ্ণ নিজের পরিহিত বসনের অঞ্চল দিয়া সেই অশ্রু মুছাইতেছেন, দৈব-দুর্বিপাকে তাঁহার পরিহিত বস্ত্রখানি নিজের নহে, কিন্তু উহা যে সৌভাগ্যবতী গোপললনার কুঞ্জে তিনি রাত্রি-যাপন করিয়াছিলেন, তাহারই বসন—প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের অবিশ্বস্ততার এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া শ্রীরাধা দলিতা ফণিনীর ন্যায় মর্ম্মন্তুদ মন্যুর আবেশে প্রিয়তমের সেবার প্রতি নিতান্ত বিমুখ হইয়া কেবল কাঁদিতেছেন। ইহাই হইল এই শ্লোকে কৃষ্ণপ্রাণা রাধিকার চিত্র।

আলঙ্কারিকগণ এই প্রকার প্রিয়তমের অবিনয়ে বিক্ষুব্ধহৃদয়া প্রেমবতী রমণীকে খণ্ডিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যথা,—

"পার্শ্বমেতি প্রিয়ো যস্যা অন্যসম্ভোগচিহ্নিতঃ।
সা খণ্ডিতেতি কথিতা ধীরৈরীর্ষ্যাকষায়িতা ॥" (সাহিত্যদর্পণ তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

অন্য কোন বনিতার সহিত সমাগম যাহা দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে, এইরূপ কোন চিহ্নযুক্ত প্রিয়তম যাহার পার্শ্বে উপস্থিত হয়, সেই ঈর্ষ্যা-কষায়িতা রমণীকে পণ্ডিতগণ 'খণ্ডিতা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

বৃন্দাবনবিলাসের স্মৃতি

ধ্বন্যালোকে শ্রীরাধা সম্বন্ধে উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকটি এই—

"তেষাং গোপবধূ-বিলাসসুহৃদাং রাধারহঃসাক্ষিণাং
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দশৈলতনয়া-তীরে লতাবেশ্মনাম্।
বিচ্ছিন্নে স্মরতল্পকল্পন-মৃদুচ্ছেদপ্রসঙ্গেঽধুনা
জানে তে জরঠীভবন্তি বিগলন্নীলত্বিষঃ পল্লবাঃ ॥"

মথুরায় অথবা দ্বারকায় যখন শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান ছিলেন, সেই সময় বৃন্দাবন হইতে সমাগত (খুব সম্ভব উদ্ধব) ব্যক্তিবিশেষকে সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

হে ভদ্র! যমুনার তীরে সেই লতাগৃহ-সমূহের মঙ্গল ত?—যে লতাগৃহ-সমূহ গোপবধূগণের নানাপ্রকার বিলাসের সুহৃদ্ এবং যাহারা শ্রীরাধার (হরিবিরহব্যাকুলতাময়) একান্তে স্থিতির সাক্ষী। (অথবা তাহাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়?) এখন সেই লতাগৃহ-সমূহে (রাধাকৃষ্ণের) মিলনের জন্য কোমল শয্যা রচনার্থ আর কোমল কিশলয়-সমূহের ছেদের আবশ্যকতা নাই, তাই আমার মনে হয়, ঐ সকল লতা-গৃহের পল্লব-সমূহ পাকিয়া কঠোর ভাব ধারণ করিতেছে, তাহাদের সেই (নয়নমনোহর) নীল প্রভা নিশ্চয়ই আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই শ্লোকটিতে বড়ই গূঢ়ভাবে, বড়ই সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার প্রধান সহচরী শ্রীরাধার তত্ত্ব কেমন সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিতেছে! শ্রীরাধার প্রিয় সহচরী গোপবধূগণ সকল গৃহকৃত্যের উপেক্ষা করিয়া, সর্ব্বদা যমুনা-তীরের লতাকুঞ্জ-সমূহে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবার জন্য নব নব বিলাসরচনায় সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত হার সেই বিলাস-রচনা-পরিশোভিত কুঞ্জমণ্ডপের কোন এক নিভৃত স্থানে

শ্রীকৃষ্ণসমাগমার্থিনী শ্রীরাধা একাকিনী প্রতি পল্লবকম্পজনিত শব্দে প্রিয়তমের আগমন-সূচক পদশব্দের সম্ভাবনায় কম্পিতহৃদয়া হইয়া কত রাত্রি অপেক্ষা করিতেছেন—সেই সময়ে তাঁহার প্রেমপ্রবণ হৃদয়-সমুদ্রে প্রতিক্ষণ আশা ও নৈরাশ্যের, আনন্দের ও বিষাদের উত্তালতরঙ্গমালার মধুর ঘাত-প্রতিঘাতের অপূর্ব্ব চিত্রগুলি যেন জীবন্ত চিত্রের আবেগময় ছায়ার মত প্রতি পুষ্পগুচ্ছে, প্রতি পল্লবসম্ভারে স্বপ্নময় নৃত্য করিতেছে। এই সকল সুখের স্মৃতি রাজকার্য্যে ব্যাপৃত নূতন রাজা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময় হৃদয়-সমুদ্রের ভাব-তরঙ্গাবলীকে উদ্বেল করিয়া তুলিতেছে; মিলনের সুখময় স্মৃতি ও বিরহের বিষাদময় বিবর্ত্ত—এই পরস্পর প্রতিকূল ভাবসমাবেশের অত স্পষ্ট অথচ অত সংক্ষিপ্ত মর্ম্মস্পর্শী চিত্র সংস্কৃত সাহিত্যের আর কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ক্ষেমেন্দ্রে বল্লভতমা শ্রীরাধা

ইহার পর খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষে মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের 'দশাবতার-চরিতে' শ্রীকৃষ্ণলীলার মধ্যে শ্রীরাধার স্বরূপ যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও বলি—

"ন স সখি যমুনায়াস্তীরবানীরকুঞ্জে
গহনভুবি ভবত্যা মৎপ্রিয়ঃ ক্বাপি দৃষ্টঃ।
সুমুখি ফলমিয়ত্তু স্নেহমোহাৎ ত্বয়াপ্তং
যদুরসি লিখিতেয়ং কণ্টকোল্লেখরেখা ॥ ১
ইত্যভূন্মদনোদ্দাম-যৌবনে কালিয়দ্বিষঃ।
গোপাঙ্গনানাং সংরম্ভগর্ভোপালম্ভবিভ্রমঃ ॥ ২
প্রীত্যৈ বভূব কৃষ্ণস্য শ্যামানিচয়চুম্বিনঃ
জাতী মধুকরস্যেব রাধৈবাধিকবল্লভা ॥" ৩

শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণার্থ কোন সহচরীকে যমুনাতীরে গহনবনে প্রেরণ করিয়া শ্রীমতী সঙ্কেতকুঞ্জে অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিয়ৎকাল পরে সহচরী ফিরিয়া আসিলে শ্রীরাধা তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের কোন সন্ধান পাওয়া গেল কি না জিজ্ঞাসা করায় সহচরী উত্তর দিতেছেন—

"সখি! যমুনার তীরে গহনকাননের মধ্যে সেই বেতসলতা-কুঞ্জে কোথায়ও তোমার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাওয়া গেল না।" এই কথা শুনিয়া পরিহাসের ছলে সহচরীর প্রীতিপ্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন যে, "ও সুমুখি! (তাহার দেখা ত পাইলেই না) কিন্তু আমার প্রতি ভালবাসা'

মোহে পড়িয়া তুমি কি ফল পাইয়াছ! আহা, গহনকাননের মধ্যে তাহাকে খুঁজিতে যাইয়া তোমার বুকের উপর এই যে কঠোর কণ্টকের ক্ষতরেখা অঙ্কিত হইয়াছে!" ১

"কালিয়দমনকারী শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার মদনোন্মাদদুদ্দম যৌবনারম্ভকালে গোপাঙ্গনা-সমূহের তৎসংক্রান্ত হর্ষমিশ্রিত তিরস্কারবাক্যসমূহ এই ভাবে প্রায়ই শ্রুত হইত।" ২

"যদিও শ্রীকৃষ্ণ বহু গোপবধূর প্রতি আসক্ত ছিলেন, তথাপি ভ্রমরের প্রীতি যেমন জাতী-কুসুমের প্রতিই অধিক হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীরাধাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা ছিলেন।"

'কৃষ্ণাবতারে" বৈচিত্র্য

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র যে কৃষ্ণলীলার বর্ণন করিয়াছেন, তাহা যে কোন পুরাণ বা সাহিত্য গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। কারণ, হরিবংশ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ বা শ্রীমদ্‌ভাগবতে আমরা যে ভাবে কৃষ্ণচরিত বর্ণিত হইয়াছে দেখিতে পাই, ক্ষেমেন্দ্র-রচিত কৃষ্ণচরিতের সহিত তাহার বহুস্থানে বৈপরীত্যই দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, ক্ষেমেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনের পূর্ব্বেই তাঁহাকে প্ররূঢ়যৌবন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে আমরা দেখিতে পাই,—যৌবনারম্ভেব পূর্ব্বে অর্থাৎ কিশোরাবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ভাগবত প্রভৃতিতে দেখা যায়, নন্দ-প্রমুখ গোপবৃন্দ গোকুলে নানাপ্রকার উৎপাত হইতেছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের শৈশবাবস্থায় গোকুল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃন্দাবনে ব্রজে চলিয়া আসিয়াছিলেন। এই বৃন্দাবনস্থিত ব্রজেই অক্রুরের আগমন হইয়াছিল এবং তিনি এইখান হইতেই শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গিয়াছিলেন। ক্ষেমেন্দ্র-কৃত কৃষ্ণাবতার গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অক্রুর গোকুল হইতেই শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া ভাগবত প্রভৃতিতে বর্ণিত রাসলীলা ও বস্ত্রহরণ-লীলা প্রভৃতির উল্লেখও ক্ষেমেন্দ্র করেন নাই। এমন কি, তাঁহার কৃষ্ণাবতার গ্রন্থে বৃন্দাবনের নাম পর্য্যন্তও দেখা যায় না।

দেবকী কংসের পিতৃষসা

এই গ্রন্থে ভাগবত প্রভৃতির সহিত আর একটি গুরুতর বিষয়ে এইরূপ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত ও হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণকে

কংসের ভাগিনেয় বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে; এই গ্রন্থে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের গর্ভধারিণী দেবকীকে কংসের পিতৃষ্বসা বলা হইয়াছে, যথা—

"পিতৃষ্বসুস্তে দেবক্যা যঃ সমুৎপদ্যতে সুতঃ।
স সুরৈর্নিশ্চিতো হন্তা বিভূতের্জীবিতস্য তে॥"

ক্ষেমেন্দ্রকৃত কৃষ্ণাবতার-চরিত।

নারদ একদিন গোপনে আসিয়া কংসকে বলিয়াছিলেন—

"তোমার পিতার ভগিনী দেবকীর যে পুত্র জন্মিবে, দেবগণ ইহা স্থির করিয়াছেন যে, সেই পুত্র তোমার ঐশ্বর্য্য ও জীবনকে বিধ্বস্ত করিবে।"

এইরূপ আরও কতকগুলি কথা কৃষ্ণচরিত সম্বন্ধে ক্ষেমেন্দ্র লিখিয়াছেন— যাহা বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত পুরাণাদিপ্রথিত কৃষ্ণ-চরিতের নিতান্ত বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয়, বিস্তারভয়ে এ স্থানে আর তাহা উদ্ধৃত হইল না।

অষ্টম-একাদশ শতকের শ্রীরাধা

এই সকল কৃষ্ণচরিত-সংক্রান্ত মতভেদ দেখিয়া স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, যে সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র কৃষ্ণচরিত বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান সময়ে আর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। এবং ইহার সঙ্গে ইহাও স্পষ্টভাবে অনুমিত হয় যে, বর্ত্তমান সময়ে কৃষ্ণচরিত বিষয়ে যে সকল ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ সাধারণে প্রধান প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতেছে, ক্ষেমেন্দ্রের সময় ঐ সকল পুরাণের প্রচার ছিল না বা থাকিলেও ক্ষেমেন্দ্র প্রভৃতির নিকট তাহা প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইত না। যাহা হউক, ইহা স্থির যে, শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ে পূর্ব্বে এরূপ অনেক গ্রন্থ ছিল, যাহা এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে এবং ঐ সময়ে প্রচলিত সেই সকল গ্রন্থে শ্রীরাধার চরিত্রে এমন কিছু বর্ণিত হয় নাই, যাহা দ্বারা তাঁহাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের পরা প্রকৃতি প্রেমভক্তির পরম আদর্শ শ্রীরাধিকার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পরবনিতা কৃষ্ণপ্রেমার্থিনী সমাজভয়বিহ্বলা শ্রীরাধা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের বর্ণনায় যে অপূর্ব্ব আকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারই সমালোচনা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে করা যাইবে।

জয়দেবের শ্রীরাধা

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আমাদের দেশে বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে মহাকবি জয়দেব শ্রীরাধিকার চরিত্র যে ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা শ্রীরাধার লৌকিক নায়িকাভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। জয়দেব-বর্ণিত রাধা-চরিত্রে আমরা দেবভাবের বা পরবর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অভিমত হ্লাদিনী শক্তির সারভাবের কোন চিহ্ন দেখিতে পাই না। মহাকবি জয়দেব তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গীতগোবিন্দ কাব্যের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে শ্রীরাধা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার গীতগোবিন্দের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি এইরূপ :—

> "মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ
> র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
> ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
> রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—"হে রাধে। আকাশ মেঘে আবৃত, তমালবৃক্ষ-সকলের ছায়ায় বনভূমিসমূহ অন্ধকারে অবৃত, রাত্রিকাল উপস্থিত, এই কৃষ্ণ নিতান্ত ভীরু, সুতরাং ইহাকে তুমিই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও," নন্দের এই প্রকার আদেশ শুনিয়া পথিমধ্যে যে কুঞ্জগৃহ আছে, তদভিমুখে চলিত শ্রীরাধা ও মাধবের নিগূঢ় কেলিসমূহ বিজয়ী হউক্।

এই শ্লোকটির যে প্রকৃত কি উদ্দেশ্য, তাহাও সুস্পষ্ট নহে, ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে রাধার নাম নাই, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জয়দেবের পূর্ব্বতন কবিবৃন্দ রাধাসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু পূর্ব্ব-প্রবন্ধেও দেখাইয়াছি, কিন্তু ঐ সকল উদ্ধৃত শ্লোকে রাধার চরিত্রে সামান্য পরকীয়াভাব-ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই উপলব্ধ হয় না। তিনি গোপনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া থাকেন, সখিগণ কেবল তাঁহাদিগের এই মিলনের সাহায্য গোপনে করিয়া থাকে, পাছে তাঁহাদের এই মধুর মিলনের বৃত্তান্ত অপর কেহ জানিতে পারে, এই ভয়ে তাঁহার সখীগণ ও তিনি ব্যাকুল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ন্যায় অন্য গোপরমণীতেও আসক্ত, এ কথা শ্রীরাধার অবিদিত না হইলেও তিনি সে জন্য কৃষ্ণকে ভালবাসিতে বিমুখ নহেন। হাতে-কলমে কৃষ্ণ ধরা পড়িলেও অতি

কঠোর বাক্যে তাঁহাকে তিরস্কার করিতে বা প্রত্যাখ্যান করিতে রাধার প্রাণ চাহে না, এইরূপ সশঙ্ক প্রেমমুগ্ধহৃদয় অনন্যশরণ লোকশঙ্কাব্যাকুল অল্পাভিমান-পরায়ণ রাধাকে আমরা জয়দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন কবিগণের কবিতাদর্পণে প্রতিফলিত হইতে দেখিতে পাই। কিন্তু জয়দেবের এই কবিতায় রাধা আর একভাবে যেন চিত্রিত হইয়াছেন। নন্দ-গোপ ব্রজভূমির অধিপতি হইলেও বার্দ্ধক্যবশতঃ ব্রজভূমির নিবিড় অন্ধকারে মেঘগর্জ্জনে ভীত হইয়া একাকী শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া গৃহে উপস্থিত হইতে সাহস করেন না, তাই তিনি ঐরূপ সময়ে রাত্রিকালে নিবিড় বনমধ্যে অকস্মাৎ রাধাকে দেখিতে পাইয়া বড়ই বল পাইয়াছিলেন। তাই তিনি রাধাকে বলিতেছেন · হে রাধে! আমার এই ভীরু বালককে তুমিই সঙ্গে করিয়া গৃহে লইয়া যাও, তাড়াতাড়ি যাইও, নহিলে গোপালের ভিজিয়া যাইবার সম্ভাবনা, আমি পরে যাইব, ভিজিতে হয় আমি ভিজিব, গোপালকে তুমি এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত কর।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে আভাস

নন্দ মহারাজের এই আনন্দপ্রদ আদেশ শুনিয়া রাধা আহ্লাদিত হৃদয়ে কৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া সে স্থান হইতে অপসৃত হইলেন, কিন্তু নন্দের গৃহে না যাইয়া নিভৃত নিকুঞ্জগৃহে গমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সহিত নানা প্রকার কেলিসমূহে নিরতা হইলেন, এই ভাবের রাধাচরিত্র জয়দেব পাইলেন কোথা হইতে? ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কিন্তু রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রথম সমাগম এই ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে, ইহা আমরা দেখিতে পাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই চরিত্র যে ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাও দেখাইতেছি,—

"একদা কৃষ্ণসহিতো নন্দো বৃন্দাবনং যযৌ।
তত্রোপবনভাণ্ডীরে চারয়ামাস গোকুলম্॥
সরঃসুস্বাদুতোয়ঞ্চ পায়য়ামাস তৎ পপৌ।
উবাস বটমূলে চ বালং কৃত্বা স্ববক্ষসি॥
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো মায়াবালকবিগ্রহঃ।
চকার মায়য়াকস্মান্মেঘাচ্ছন্নং নভো মুনে॥
মেঘাবৃতং নভো দৃষ্ট্বা শ্যামলং কাননান্তরম্।
বঞ্ঝাবাতং মেঘশব্দং বজ্রশব্দঞ্চ দারুণম্॥

বৃষ্টিধারামতিস্থূলাং কম্পমানাংশ্চ পাদপান্।
দৃষ্ট্বৈবং পতিতস্কন্ধান্ নন্দো ভয়মবাপ হ॥
কথং যাস্যামি গোবৎসং বিহায় স্বাশ্রমং প্রতি।
গৃহং যদি ন যাস্যামি ভবিতা বালকস্য কিম্॥
এবং নন্দে প্রবদতি রুরোদ শ্রীহরিস্তদা।
মায়াভিয়া ভয়েভ্যশ্চ পিতুঃ কণ্ঠং দধার সঃ॥
এতস্মিন্নন্তরে রাধা জগাম কৃষ্ণসন্নিধিম্॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ কৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৫ অধ্যায়)

একদিন কৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া নন্দ বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। সেখানে ভাণ্ডীরবনে তিনি গোবৃন্দকে বিচরণ করাইতেছিলেন, সরোবর-সমূহের স্বাদু জল গো-সকলকে পান করাইবার পর নিজেও পান করিয়া, বালক কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়া, যে সময় একটি বটবৃক্ষের মূলে বসিয়াছিলেন, সেই সময় সেই মায়া-বালকরূপধারী শ্রীকৃষ্ণ নিজ মায়ার প্রভাবে অকস্মাৎ গগনমণ্ডলকে মেঘাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন। অকস্মাৎ আকাশ মেঘাবৃত হইয়াছে, বনমধ্য নিবিড় অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে, ঝঞ্ঝাবাত, মেঘের গর্জ্জন, বজ্রপাতের দারুণ শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে অতিস্থূল বৃষ্টিধারা হইতেছে, বায়ুবশে কম্পমান বৃক্ষসমূহের স্কন্ধদেশ ভগ্ন হইয়া ভূমিতে পতিত হইতেছে, এই সব দেখিয়া নন্দ ভয় পাইয়াছিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, এই সকল গাভীকে ও বৎসসমূহকে ছাড়িয়া কেমন করিয়াই বা গৃহে ফিরিব, আর যদি না যাই, তাহা হইলে বালক শ্রীকৃষ্ণেরই বা কি দশা হইবে? এইরূপ শঙ্কাকুল হইয়া নন্দ যখন এই প্রকার বলিতেছিলেন, সেই সময় মায়াবশে ভয় পাইয়া শ্রীহরিও রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিলেন। ঠিক এই সময়ে শ্রীরাধা সেই স্থানে আসিয়া দেখা দিলেন।

বয়সের বৈষম্য

ইহার পর ১২টি শ্লোকে শ্রীরাধার নবযৌবনোদ্ভাসিত লোকাতীত হাবভাববিলাস-মণ্ডিত সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহার পর কি হইল?

দৃষ্ট্বা তাং নির্জ্জনে নন্দো বিস্ময়ং পরমং যযৌ।
চন্দ্রকোটিপ্রভামৃষ্টাং ভাসয়ন্তীং দিশো দশ॥

উবাচ তাং সাশ্রুনেত্রো ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ।
জানামি ত্বাং গর্গমুখাৎ পদ্মাধিকপ্রিয়াং হরেঃ ॥
জানামীমং মহাবিষ্ণোঃ পরং নির্গুণমচ্যুতম্।
তথাপি মোহিতোঽহং চ মানবো বিষ্ণুমায়য়া ॥
গৃহাণ প্রাণনাথঞ্চ গচ্ছ ভদ্রে যথাসুখম্।
পশ্চাদ্দাস্যসি মৎপুত্রং কৃত্বা পূর্ণং মনোরথম্ ॥
ইত্যুক্ত্বা স দদৌ তস্মৈ রুদন্তং বালকং ভিয়া।
জগ্রাহ বালকং রাধা জহাস মধুরং সুখাৎ ॥
উবাচ নন্দং সা যত্নান্ন প্রকাশ্যং রহস্যকম্।
অহং দৃষ্টা ত্বয়ানেন কতিজন্ম-ফলোদয়াৎ ॥
প্রাজ্ঞস্ত্বং গর্গবচনাৎ সর্ব্বং জানাসি কারণম্।
অকথ্যমাবয়োর্গোপ্যং চরিত্রং গোকুলে ব্রজ ॥
বরং বৃণু ব্রজেশ ত্বং যৎ তে মনসি বাঞ্ছিতম্।
দদামি লীলয়া তুভ্যং দেবানামপি দুর্ল্লভম্ ॥
রাধিকাবচনং শ্রুত্বা তামুবাচ ব্রজেশ্বরঃ।
যুবয়োশ্চরণে ভক্তিং দেহি নান্যত্র মে স্পৃহা ॥
যুবয়োঃ সন্নিধৌ বাসং দাস্যসি ত্বং সুদুর্ল্লভম্।
আবাভ্যাং দেহি জগতামম্বিকে পরমেশ্বরি ॥
শ্রুত্বা নন্দস্য বচনমুবাচ পরমেশ্বরী ॥
দাস্যামি দাস্যমতুলমিদানীং ভক্তিরস্তু তে ॥
আবয়োশ্চরণাম্ভোজে যুবয়োশ্চ দিবানিশম্।
প্রফুল্লহৃদয়ে শশ্বৎ স্মৃতিরস্তু সুদুর্ল্লভা ॥
মায়া যুবাঞ্চ প্রচ্ছন্নৌ ন করিষ্যতি মদ্বরাৎ।
গোলোকে যাস্যথোঽন্তে চ বিহায় মানবীং তনুম্ ॥
এবমুক্ত্বা তু সানন্দংকৃত্বা কৃষ্ণং স্ববক্ষসি।
গত্বা দূরে ত্বং নিনায় বাহুভ্যাঞ্চ যথেপ্সিতম্ ॥

নন্দের গোপাল-সমর্পণ

নন্দ অকস্মাৎ সেই নির্জ্জন স্থানে কোটি চন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বলবর্ণা, কান্তিচ্ছটায় দশদিক্ সমুদ্ভাসিত করিয়া বিরাজমানা সেই রাধাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভক্তিভরে আত্মকন্ধর নত করিয়া সাশ্রুনেত্র নন্দ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, গর্গের মুখে আমি আপনার পরিচয় পাইয়াছি, আপনি পদ্মা অপেক্ষা শ্রীহরির প্রিয়া, আমার এই যে বালক গোপাল, ইনিও যে মহাবিষ্ণু হইতেও শ্রেষ্ঠ সেই নির্গুণ অচ্যুত, তাহাও আমি জানি ; কিন্তু জানিয়াও আমি বিষ্ণুমায়ার দ্বারা মোহিত হইয়া আছি, কারণ, আমি সামান্য মনুষ্য ছাড়া আর কিছুই নহি। হে ভদ্রে! আমার গোপাল তোমার প্রাণনাথ, সুতরাং তুমি ইহাকে গ্রহণ কর, যেখানে ইহাকে লইয়া তুমি সুখী হইবে, সেইখানে যাও, তোমার মনোরথ পূর্ণ হইলে পশ্চাৎ আমার পুত্রকে আমার নিকটে অর্পণ করিও। এই বলিয়া নন্দ রাধিকার হস্তে গোপালকে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই গোপাল তখনও ভয়ে ক্রন্দন করিতেছিলেন, রাধা সেই মনোহর বালককে বড়ই হর্ষের সহিত গ্রহণ করিয়া হাস্য করিলেন, এবং নন্দকে ইহা বলিলেন যে, "তুমি এই রহস্য-বৃত্তান্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না, তোমার বহু জন্মের সুকৃতিফলে তুমি আমার দর্শন পাইয়াছ, তুমি বিজ্ঞ এবং গর্গের মুখে শুনিয়া এই সকল লীলার যাহা কিছু কারণ, তাহা তুমি জান, তুমি গোকুলে চলিয়া যাও, কিন্তু আমাদিগের এই নিভৃত সমাগমের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। হে ব্রজেশ্বর! তোমার মনে যদি কোন বাঞ্ছিত থাকে, তাহাও আমাকে জানাও, আমি তোমাকে সেই বরই দিব। সেই বর দেবতাদিগের দুর্ল্লভ হইলেও আমি অবলীলাক্রমে তোমাকে দিব।"

বর-প্রার্থনা

রাধিকার বচন শুনিয়া ব্রজেশ্বর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমাদিগের দুই জনের চরণে আমার ভক্তি হউক, এই বরই আপনি আমাকে দিউন, অন্য কোন বরে আমার স্পৃহা নাই। হে জগজ্জননি! পরমেশ্বরি! রাধিকে! তোমাদিগের দুই জনের নিকটে আমি এবং যশোদা যেন সর্ব্বদা বাস করিতে পারি, এই বরটিও আমাদিগকে দিও।" নন্দের বচন শ্রবণ করিয়া পরমেশ্বরী রাধিকা বলিয়াছিলেন, তোমাদিগের অভীপ্সিত দাস্যরূপ বর আমি যথাসময়ে তোমাদিগকে দিব। তোমার ভক্তি হউক, আমাদিগের চরণাম্ভোজে তোমাদিগের সর্ব্বদা ভক্তি হউক। আরও বর দিতেছি যে, আমাদিগের স্মৃতি দেবতাদিগের দুর্ল্লভ হইলেও তোমাদিগের প্রফুল্ল হৃদয়ে তাহা সর্ব্বদা বিরাজমান থাকুক। আমি ইহাও বর দিতেছি যে, মায়া কখনও তোমাদের দুই জনকে

আবৃত করিতে পারিবে না, এবং এই মানবশরীর পরিত্যাগ করিয়া তোমরা যথাসময়ে দুই জনে গোলোকে যাইয়া বাস করিবে।" এই প্রকার বলিয়া রাধা নিজ বক্ষঃস্থলে গোপালকে আরোপণপূর্ব্বক দুই বাহুর দ্বারা ধরিয়া দূরে নিজ ঈপ্সিত স্থানে চলিয়া গেলেন।

পরমেশ্বরী রাধিকা

ইহার পর ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের যমুনাতটে বৃন্দাবনকুঞ্জে নিভৃত বিহারের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। অনাবশ্যক বোধে এখানে তাহা উদ্ধৃত হইল না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের যে অংশটুকু উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীরাধার এবং শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে দেখিতে পাই, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী অপেক্ষাও প্রিয়তমা। নন্দ তাঁহাকে পরমেশ্বরী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন এবং তাঁহার চরণে দেবতাগণের দুর্ল্লভ যে ভক্তি, তাহাই বররূপে প্রার্থনা করিতেছেন। গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের এই বৃত্তান্তটি সংক্ষিপ্তভাবে সূচিত হইয়াছে, ইহাই অনেকের মত। এই শ্লোকটি ছাড়িয়া দিলে গীত-গোবিন্দের রাধা সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহার দ্বারা গীত-গোবিন্দকার রাধার বিষয়ে এমন কিছুই সূচনা করেন নাই—যাহাতে রাধার পরমেশ্বরী-স্বভাব সূচিত হইতে পারে।

গীতগোবিন্দে প্রভেদ

ইহা দেখিয়া কেহ কেহ বলেন যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের উদ্ধৃত অংশের সহিত গীতগোবিন্দের এই শ্লোকটির প্রকৃতপক্ষে কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা বলেন যে, এই শ্লোকটিতে যে উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ব্রজেশ্বর নন্দের যে উক্তি, তাহা নহে, ইহা রাধিকার প্রতি প্রণয়ভরে নিজের আত্মসমর্পণসূচক শ্রীকৃষ্ণেরই উক্তি। অর্থাৎ "মেঘাচ্ছন্ন গগনমণ্ডল ও ঘন তিমিরাবৃত বৃন্দাবন বিলোকন করিয়া নির্জ্জন নিকুঞ্জ-বিহারের ইহাই উপযুক্ত সময়, এ সময় রাধার ঈপ্সিত দেশে গমন করিয়া তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণই রাধাকে বলিতেছেন—হে রাধে! আকাশ মেঘে আবৃত হইয়াছে, বনভূমি তমালের নিবিড় অন্ধকারে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে, রাত্রিকাল, আমার বড় ভয় হইতেছে, সুতরাং এই ভীত ব্যক্তিকে অর্থাৎ আমাকে তুমি তোমার অভীপ্সিত গৃহে অর্থাৎ যমুনাপুলিনে অবস্থিত নিভৃত নিকুঞ্জ-কেলিমন্দিরে পথ দেখাইয়া লইয়া চল।"

প্রণয়ীর এইরূপ আদেশ স্বেচ্ছাবিহারার্থিনী শ্রীরাধার পক্ষে 'নন্দ-নিদেশ' অর্থাৎ আনন্দদায়ক আদেশ।

এই আদেশ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধা নিভৃত নিকুঞ্জগৃহে গমনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত যে নিভৃত কেলিসমূহ করিয়াছিলেন, তাহাই স্মৃত হইয়া তোমাদিগের মঙ্গলবিধান করুক। ইহাই হইল কোন কোন টীকাকারের মতে গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটির যথার্থ তাৎপর্য্য।

প্রাকৃত পরকীয়া

পরে গীতগোবিন্দে বিস্তারের সহিত যে রাধাকৃষ্ণের মধুর লীলাসমূহ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে এই প্রকার অর্থ ই যে প্রথম শ্লোকের অভিমত, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এই শ্লোকের দ্বারা কেন সূচিত হইল, এরূপ প্রশ্নের কোন সদুত্তর সমগ্র গীতগোবিন্দের মধ্যে পাওয়া যায় না। যাহাই হউক, গীতগোবিন্দকার স্পষ্ট কথায় বিস্তৃতভাবে পরে যেরূপ রাধাচরিত্র বর্ণন করিয়াছেন, তাহার দ্বারা বুঝা যায় যে, গীতগোবিন্দকারের রাধায় বৈষ্ণবগণসম্মত তাঁহার পরাশক্তিরূপ স্বভাব সূচিত হয় নাই। প্রাচীন কবিগণের ন্যায় তিনিও রাধাকে ভীতা প্রেমিকা পরনায়িকারূপে বর্ণন করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপে কয়েকটি স্থান গীতগোবিন্দ হইতে উদ্ধৃত হইতেছে তাহা দ্বারাই ইহা আরও সুস্পষ্ট হইবে।

সখী আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিরহিণী রাধার অবস্থা জানাইতেছেন—

"বহতি চ চলিতবিলোচনজলভরমানন-কমলমুদারম্।
বিধুমিব বিকট-বিধুন্তুদ-দন্তদলন-গলিতামৃতধারম্॥
বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসমশরভূতম্।
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং নবচূতম্॥
ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীবদুরাপম্।
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্॥
প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহম্।
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি তনুতে তনুদাহম্॥"

"রাধার আননকমল চঞ্চল বিলোচন হইতে বিমুক্ত অশ্রুধারায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যেন, করাল রাহুর দন্তসমূহের দ্বারা চন্দ্র

বিদলিত হইয়া অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে। রাধার আর কোন কাজ নাই, একা নির্জ্জন স্থানে বসিয়া মৃগমদের দ্বারা সাক্ষাৎ কন্দর্পের ন্যায় তোমার মধুর আকৃতি লিখিতেছে। সেই মূর্ত্তি লিখিয়া তাহারই হস্তে শরের ন্যায় আম্রমুকুল সন্নিবেশিত করিতেছে এবং সেই মূর্ত্তিরই চরণতলে একটি মকর অঙ্কিত করিয়া বারংবার প্রণাম করিতেছে। তুমি বড় দুর্ল্লভ, সাক্ষাৎভাবে তোমাকে পাইবার সম্ভাবনা নাই, তাই ধ্যানসমাধিতে তোমার মনোহর মূর্ত্তি সম্মুখে পরিকল্পিত করিয়া সে কখনও বিলাপ করিতেছে, কখনও হাসিতেছে, কখনও বিষণ্ণভাবে চুপ করিয়া থাকিতেছে, কখনও বা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে, কখনও বা পাগলের ন্যায় এ দিকে ছুটিতেছে, ভীষণ জ্বরাতুর ব্যক্তির ন্যায় তাহার শরীর হইতে দুর্বিষহ তাপ নির্গত হইতেছে, বার বার সেই মনঃকল্পিত ত্বদীয় মূর্ত্তিকে সম্মুখে রাখিয়া সে বলিতেছে, 'মাধব! আমি তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যদি বিমুখ হও, তাহা হইলে সুশীতল চন্দ্রও আমাকে তাপিত করে'।"

রতি-বিলাস

সখী আবার বলিতেছে—

"স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্।
সা মন্যুতে কৃশতনুরিব ভারম্।
রাধিকা তব বিরহে কেশব॥
সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কম্।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্॥
শ্বসিত-পবনমনুপমপরিণাহম্।
মদনদহনমিব বহতি সদাহম্॥
দিশি দিশি কিরতি সজলকণজালম্।
নয়ননলিনমিব বিগলিতনালম্॥
ত্যজতি ন পাণিতলেন কপোলম্।
বালশশিনমিব সায়মলোলম্॥
নয়নবিষয়মপি কিসলয়তল্পম্।
গণয়তি বিহিত-হুতাশ-বিকল্পম্॥
হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্।
বিরহবিহিত-মরণেব নিকামম্॥"

"হে কেশব! তোমার বিরহে সেই কৃশাঙ্গী রাধা তাহার স্তনদেশে বিনিহিত উৎকৃষ্ট হারকেও নিতান্ত ভার বলিয়া বোধ করিতেছে। বিরহতাপ-শান্তির জন্য দেহে অর্পিত সরস ও মসৃণ চন্দনপঙ্ককেও সে সশঙ্কভাবে বিষের ন্যায় দেখিতেছে। তাহার নিজের শ্বাস-মারুত দীর্ঘ হইয়া যদি দেহে কোন স্থানে লাগে, তবে তাহাকেও সে দাহকর মদনাগ্নি বলিয়া বোধ করিতেছে। তোমার আগমনের আশায় অশ্রুজালাবৃত নয়নদ্বয়কে বিগলিতনাল নীলপদ্মের ন্যায় চারিদিকে প্রেরণ করিতেছে। সায়ংকালে নবোদ্গত স্থির চন্দ্রের ন্যায় নিজের কপোলতল সর্ব্বদাই তাহার করতলে বিন্যস্ত আছে, শয়নের জন্য বিরচিত কিসলয়শয্যা তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলে সে তাহাকে হুতাশনের মূর্ত্তি বলিয়া গণনা করিতেছে। বিরহে আর বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই, মরণ নিকটবর্ত্তী হইয়াছে ভাবিয়া জন্মান্তরে পুনর্মিলনের কামনা করিয়া সে কেবলই হরি হরি এই মন্ত্র জপ করিতেছে।"

এই চিত্রে রাধার বিরহ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এ বিরহে রাধা সর্ব্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রতিক্ষণে তাঁহার মিলনের আশায় উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে তাঁহারই স্মৃতিরচিত মনোহর মূর্ত্তি দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে। ইহাতে দ্বেষ নাই, অভিমান নাই, আত্মসৌন্দর্য্যের গরিমা নাই, আছে কেবল নিজের দৈন্য, বিষাদ, উৎসুকতা ও ব্যাকুলতা। অলৌকিক দেবভাবের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই, লোকসিদ্ধ সরল প্রেমের ইহা একখানি নিখুঁত চিত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে।

(৩)

শ্রীরূপগোস্বামীর বর্ণনা

গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিগণের সাহিত্যে শ্রীরাধার চরিত্র যে ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে প্রাচীন কবিগণের বর্ণিত রাধাচরিত্রের সাদৃশ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইলেও, বৈসাদৃশ্যই অধিক পরিমাণে উপলব্ধ হইয়া থাকে। এই বৈষ্ণব সাহিত্য দুই ভাগে বিভক্ত;—এক সংস্কৃত, দ্বিতীয় বাঙ্গালা। সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে শ্রীরূপ গোস্বামীর গ্রন্থেই ইহার উদাহরণ অধিক পরিমাণে প্রাচীন কবিগণের বর্ণিত রাধা-চরিত্রের অনুরূপ। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি স্থল নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে,—

"যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলিতা গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা,
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ সখি ! তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহান্ ময়া ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো,
ধিগ্ ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী ॥" (বিদগ্ধমাধব)

সখীকে সম্বোধন করিয়া রাধা বলিতেছেন, "যাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া সুখলাভের আশায় গুরুজন হইতে গুরু লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়াছি, হে সখি! প্রাণ হইতে প্রিয়তম হইলেও তোমাদিগকে নানা ক্লেশ প্রদান করিয়াছি, সাধ্বী পতিব্রতা স্ত্রীগণের উপাসিত যে মহান্ পাতিব্রত্যরূপ ধর্ম্ম, তাহাও পরিত্যাগ করিয়াছি, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, এই ভাবে উপেক্ষিত হইয়া এখনও যে আমি পাপভারাক্রান্ত জীবন বহন করিতেছি, ইহার জন্য আমার ধৈর্য্যকেও ধিক্।"

উপেক্ষিতা সর্ব্বত্যাগিনী

উপেক্ষিতা, অবমানিতা, কলঙ্কিনী রাধার এই বিষাদময়ী মূর্ত্তি আমরা পূর্ব্বপ্রদর্শিত প্রাচীন কবিগণের কবিতাতে যেমন দেখিয়াছি, এখানেও ঠিক তাহাই দেখিতেছি। এ অবমাননা, এ উপেক্ষা, এ কলঙ্কভারেও কিন্তু রাধার প্রেম সমানভাবে রহিয়াছে, কিছুমাত্র অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে না, প্রত্যুত উত্তরোত্তর বাড়িয়াই যাইতেছে,—

"অন্তঃ ক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং যামোঽদ্য যাম্যাং পুরং
নায়ং বঞ্চনসঞ্চয়প্রণয়িনং হাসং তথাপ্যুজ্ঝতি।
অস্মিন্ সংপুটিতে গভীরকপটৈরাভীরপল্লীবিটে
হা মেধাবিনি! রাধিকে! তব কথং প্রেমা গরীয়ানভূৎ ॥" (বিদগ্ধমাধব)

রাধা শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিজের সহচরীগণকে দূতীরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সহচরীগণ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"হা মেধাবিনি! রাধিকে! শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রতি সদয় হইলেন না, ইহাতে আমরা যে ক্লেশ অনুভব করিতেছি, তাহা বাহিরে প্রকাশ করিবার নহে, কলঙ্কের ভার আর বহিতে না পারিয়া আমরা, মনে হয়, শীঘ্রই যমপুরে চলিয়া যাইব। ইহা যে শ্রীকৃষ্ণ বুঝেন না, তাহা নহে, বুঝিয়াও তিনি বঞ্চনা-সমূহের চিরসহচর উপেক্ষাদ্যোতক হাস্য ক্ষণকালের জন্য পরিত্যাগ করেন নাই।

সখি! এই কৃষ্ণ কে? ইনি আমাদিগের আভীরপল্লীর একটি ধূর্ত্ত লম্পট যুবা, গভীর কপটের দুর্ভেদ্য আবরণে এই কৃষ্ণ সর্ব্বদা আবৃত, সুতরাং সর্ব্বদাই অজ্ঞেয়প্রকৃতি। ইঁহার সকল ব্যবহার আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত তুমি যে জান না, তাহা নহে, কারণ, তোমার মেধা অসাধারণ। জানিয়াও এই কৃষ্ণের প্রতি তোমার প্রেম কেন যে উত্তরোত্তর এমন ভাবে বাড়িয়াই চলিতেছে, তাহা আমরা বুঝি না।"

আত্মনিবেদন

প্রেমময়ী শ্রীরাধার এই উপেক্ষাজনিত বিরসতার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মনিবেদনবচনও কেমন স্বাভাবিক ও সকরুণ।

"গৃহান্তঃ খেলন্ত্যো নিজসহজবাল্যস্য বলনা-
দভদ্রং ভদ্রং বা ন হি কিমপি জানীমহি মনাক্।
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণাং কামপি দশাং
কথং বা ন্যায্যা যে প্রথয়িতুমুদাসীনপদবী॥" (বিদগ্ধমাধব)

"আমরা অশিক্ষিতা গোপললনা, আজন্মসিদ্ধ অজ্ঞতার দ্বারা পরিচালিত হইয়া অন্তঃপুরে থাকিয়া খেলা করিয়া থাকি। কি করিলে আমাদিগের মঙ্গল হইবে, কিসেই বা অমঙ্গল হয়, তাহার কিছুই আমরা বুঝি না। হে নাথ! তুমি ছাড়া আমাদের আর কেহই রক্ষক নাই, আমাদিগকে এমনভাবে নিরাশ্রয় করিয়া উপেক্ষা করা কি তোমার উচিত? এত আত্মীয়—এত সুহৃদ্ হইয়াও তুমি যে সর্ব্বদা আমাদিগের সহিত উদাসীনের ন্যায় ব্যবহার করিতেছ, ইহা কি তোমার পক্ষে উচিত হইতেছে?"

অন্তিম কাতরতা

সর্ব্বপ্রকারে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রেমময়ের উপেক্ষায় দিশাহারা হইয়া রাধা যে ভাবে দিনযাপন করিতেছেন, মরণ নিকটবর্ত্তী জানিয়া প্রাণের কথা অন্তিমসময়ে প্রাণপ্রিয় সহচরীবর্গকে যে ভাবে জানাইতেছেন, শ্রীরূপ গোস্বামীর কবিতায় তাহা বড়ই সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। যথা,—

"অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং
মুধা মা রোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিম্।
তমালস্য স্কন্ধে সখি কলিতদোর্বল্লরিরিয়ং
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ॥" (বিদগ্ধমাধব)

কৃষ্ণ-প্রত্যাখ্যাতা দূতী সহচরী ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং রোদন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের অকরুণ ব্যবহারের কথা শ্রীরাধাকে শোকজড়িতকণ্ঠে নিবেদন করিতেছেন, তাহা শুনিয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন, "সখি! কৃষ্ণের কৃপা হইল না, ইহাতে তোমার অপরাধ কি, এমন করিয়া আর বৃথা কাঁদিও না। আমি ত মরিবই। দেখ সখি, ভুলিও না, মরণের পর তোমাদিগের একটা গুরু কর্তব্যকর্ম্ম আছে, তাহাই স্মরণ করাইয়া দিতেছি। আমার মৃতদেহ অগ্নিসাৎ করিও না বা জলে ডুবাইও না; কিন্তু সখি! সেই কৃষ্ণস্পৃষ্ট অভাগিনীর দেহকে বিশুদ্ধ করিয়া ভাল করিয়া সাজাইও, তাহার পর এই বৃন্দাবনের সেই তমালতরুর স্কন্ধে, সেই দেহের দুইটি বাহু লতিকার ন্যায় জড়াইয়া দিয়া, যাহাতে সে দেহ শীঘ্রই নষ্ট না হয়, সেই ভাবে রক্ষা করিও (আমি জীবিত থাকিতে হয় ত তিনি আমার প্রতি রোষবশতঃ এই বৃন্দাবনে না-ও আসিতে পারেন। কিন্তু আমি মরিয়া গেলে কখনও হয় ত তাঁহার সাধের বৃন্দাবনে তিনি একদিন আসিবেন। যখন আসিবেন, তখন তাঁহাকে আমার সেই কৃষ্ণ-প্রতিম তমালস্কন্ধে দোদুল্যমান প্রাণহীন দেহ একবার দেখাইও)।

আধ্যাত্মিক রূপায়ণ

শ্রীরূপ গোস্বামীর এই সকল কবিতাতে শ্রীরাধার যে প্রেমময় রূপ অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টভাবে আধ্যাত্মিক রাধাভাবের স্পষ্ট পরিচয় না থাকিলেও, পরবর্ত্তী বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিগণ এই চরিত্র অবলম্বন করিয়াই যে অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। কবিরাজ গোস্বামীর অমরকাব্য শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আমরা এই অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক রাধাভাবের পরিচয় পরিপূর্ণরূপে পাইয়া থাকি। চরিতামৃতকার এই রাধাচরিত্র যে নিজে কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা নহে। শ্রীরূপ গোস্বামীর "উজ্জ্বল-নীলমণি" নামক অলঙ্কার-গ্রন্থে ইহার প্রথম সূচনা, আমরা দেখিতে পাই। প্রথমে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে কি ভাবে রাধা-চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই অগ্রে দেখা যাউক। উজ্জ্বলনীলমণির কথা থাক্, তাহা পরে বলিব।

হ্লাদিনীর সার মহাভাব

ভগবানের ত্রিবিধ শক্তির বিচার করিতে উদ্যত হইয়া চরিতামৃতকার মধ্য-লীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী॥"

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের পরমারাধ্যা রাধার আধ্যাত্মিক চরিত্রের এই কয়টি কবিতাই মূল সূত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি যে রাধারূপে পরিণত হইয়াছেন, এই কয়টি কবিতার দ্বারা সংক্ষেপে তাহাই সূচিত হইতেছে। মনে রাখিতে হইবে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্তে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অদ্বৈতবাদীর অঙ্গীকৃত নির্গুণ, নিরাকার, অখণ্ড ব্রহ্মই নহেন। তিনি সাকার, তিনি সগুণ, তিনি সৎ, চিৎ এবং আনন্দস্বরূপ হইয়াও আনন্দের অনুভবিতা এবং নিখিল-জীবকে সেই আত্মানন্দের অনুভাবয়িতা। একই বস্তু একই কালে স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়া কেমন করিয়া সেই আনন্দের অনুভবিতা হন এবং অপর সকলকেও সেই আনন্দের অনুভব করাইয়া থাকেন, এই অতি নিগূঢ় জটিল দার্শনিক রহস্যের সমাধান একমাত্র রাধাতত্ত্বেরই উপর নির্ভর করিতেছে। তাঁহাদিগের মতে শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার শক্তি এক হইলেও পরস্পর ভেদও বিদ্যমান রহিয়াছে। ভেদের সঙ্গে জড়িত এই অভেদতত্ত্ব ভাল করিয়া না বুঝিলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের রাধাতত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় না। চৈতন্য-চরিতামৃতকার এই কয়টি কবিতায় তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বিষ্ণুর শক্তিত্রয়

আনন্দরূপ ও চৈতন্যস্বরূপ শ্রীভগবান্ আত্মস্বরূপ আনন্দকে অনুভব করিবার সঙ্গে সঙ্গে সকল জীবকেই সেই আত্মানন্দ অনুভব করাইবার জন্য যে নিত্যসিদ্ধ শক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, সেই শক্তির নাম হ্লাদিনী শক্তি। ইহা যে কেবল গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণেরই সিদ্ধান্ত, তাহা নহে, পুরাণকর্তা ঋষিগণেরও ইহাই সিদ্ধান্ত—অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। আমরা বিষ্ণুপুরাণে দুইটি শ্লোকে এই ভাবের সিদ্ধান্তটি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥
হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥"

এই দুইটি শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে চরিতামৃতকার বলিতেছেন—

"সংক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের স্বরূপ।
এবে সংক্ষেপে কহি শুন রাধাতত্ত্বরূপ॥
কৃষ্ণের অনন্তশক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তিনাম॥
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তি সভার উপরে॥
সৎ চিৎ আনন্দ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিদ্ যারে জ্ঞান করি মানি॥"

আনন্দের অনুভাবয়িত্রী

হ্লাদিনীশক্তি ভগবান্‌কে এবং জীবসমূহকে কি ভাবে আনন্দ অনুভব করাইতে সমর্থ হয়, তাহারই ইঙ্গিতে সূচনা করা হইয়াছে,—

"হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥"

যে অংশের সাহায্য হ্লাদিনী উল্লিখিত নিজ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাই হইল হ্লাদিনীর সার অংশ। চরিতামৃতকারের মতে তাহাকে প্রেম বলা যায়। প্রেম বলিলে ভক্তিসিদ্ধান্ত অনুসারে কি বুঝা যায়, চরিতামৃতকার তাহাও বলিয়াছেন—

"আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান"।

প্রেম-স্বরূপ আনন্দাভিলাষ

এখানে যে "রস" শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ—যাহার দ্বারা চিন্ময় আনন্দের আস্বাদন হইয়া থাকে, তাহাই অর্থাৎ 'অভিলাষ'। এ কিসের অভিলাষ? আনন্দকে, চিন্ময় বস্তুকে অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে আস্বাদন করিবার

জন্য জীবের আজন্মসিদ্ধ যে সুখভোগবিষয়ক অভিলাষ, তাহাই হইল এ স্থলে "রস" শব্দের অর্থ। প্রেম বা প্রীতির স্বরূপ কি, তাহা বুঝাইতে যাইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণের প্রধানতম পুরুষ শ্রীজীব গোস্বামী প্রীতি-সন্দর্ভে এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, উল্লাসময়, প্রকাশময় যে অভিলাষ বা আকাঙ্ক্ষা, তাহাই হইল প্রেম বা প্রীতি শব্দের মুখ্য অর্থ। প্রেম না হইলে আনন্দের অনুভব পূর্ণভাবে হইতে পারে না বলিয়া, সর্ব্বদা সকলের আনন্দ অনুভব করাইবার জন্য প্রবৃত্ত যে হ্লাদিনীশক্তি, তাহাই সকল জীবের হৃদয়ে আনন্দানুভব করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষারূপ যে প্রেম, তদ্রূপে পরিণত হইয়া থাকে।

সুখাভিলাষী জীব

মনুষ্যমাত্রের চরিত্র অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখিতে পাই যে, সকলেই আজন্ম মরণ পর্য্যন্ত সুখভোগের লালসা বা আকাঙ্ক্ষায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এই যে সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা, ইহা জীবনে কখনও পরিতৃপ্তি লাভ করে না। নিত্য নূতন নূতন ভোগ্যবস্তুর লাভে ক্ষণিক তৃপ্তি অনুভব করিবার, সুখাস্বাদনের জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়ে স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। বৈষয়িক আনন্দের আস্বাদনে কিছুতেই এ আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি লাভ করে না। কেন এমন হয়? সুখের জন্য লালায়িত জীব, বহু দিন হইতে সঞ্চিত বড় আশার বিষয় ভোগ্যবস্তু পাইয়াও, সুখের আস্বাদন করিয়াও, আপনাকে যে তৃপ্ত বা চরিতার্থ বলিয়া বোধ করে না, অজ্ঞাত নূতন সুখের আশায় পরক্ষণে আবার ব্যাকুল হইয়া পড়ে, কেন এমন হয়?

রতি বা আকাঙ্ক্ষার পরিণতি

ইহার উত্তর দিতে যাইয়া ভক্তিশাস্ত্রের আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, আমরা যে সুখের আশায় সর্ব্বদা ব্যাকুল হইয়া থাকি, সেই সুখ বাস্তবিকপক্ষে প্রাকৃত বিষয় হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না। যাহা নিত্যসিদ্ধ, যাহা আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র বিরাজমান, সেই অপরিচ্ছিন্ন অনাদিনিধন ভগবান্ই বাস্তবিক সেই সুখ। অপরিচ্ছিন্ন ভগবৎস্বরূপ সেই সুখকে আস্বাদন করিবার জন্য আমাদিগের আজন্মসিদ্ধ যে আকাঙ্ক্ষা, তাহা পরিচ্ছিন্ন, পরিণামবিরস এবং বিনাশভীতি-সমাকুল বৈষয়িক সুখের আস্বাদনে চরিতার্থ হইতে পারে না। যে সকল বস্তুকে আমরা সুখের সাধন বলিয়া বিবেচনা করি, তাহারা প্রকৃতপক্ষে সুখের সাধন নহে।

কিন্তু সুখাভাসেরই তাহা সাধন হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত জীবের দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আত্মভাব বিদ্যমান থাকে, সে পর্য্যন্ত মানবের এই সকল প্রাকৃত বিষয়েই সুখসাধনত্ব-জ্ঞান হইয়া থাকে। যাহা বাস্তবিক সুখের সাধন নহে, তাহাকেই সুখ-সাধন রূপে আমরা বুঝিয়া থাকি বলিয়া, ঐ সকল বস্তুর প্রাপ্তিতে সুখী হইলাম বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা ভ্রান্তি ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। যে পর্য্যন্ত জীবের সেই পরমাত্মরূপ নিত্যসুখের দিকে মনোবৃত্তি ধাবিত না হয়, সে পর্য্যন্ত অতৃপ্তি বিদ্যমানই থাকে, কখনই নিবৃত্ত হইতে পারে না। একবার কিন্তু তাঁহারই কৃপায় সেই ভগবান্ যদি নিজ আনন্দস্বরূপ চিন্ময় মূর্ত্তির আস্বাদন করুণাবশতঃ করাইয়া দেন, তাহা হইলে আর মানব কখনও বিষয়-সম্পর্কজনিত সুখাভাসের প্রাপ্তি-লালসায় ব্যাকুল হয় না। তখন তাহার আজন্মসিদ্ধ বৈষয়িক সুখবিষয়ক যে আকাঙ্ক্ষা, তাহাই বিষয়াবেশ পরিহার করতঃ সেই নিত্যসুখরূপ ভগবদ্‌বিগ্রহের নিয়তানুভূতির জন্য যে 'আকাঙ্ক্ষা' বা 'রতি', তদ্রূপেই পরিণত হইয়া থাকে, এই রতিই হইল শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তির পরিণতি।

রাগাত্মিকা ভক্তি

চরিতামৃতকার ইহারই স্বরূপ বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন, "হ্লাদিনীর সার প্রেম।" এই প্রেম যে পর্য্যন্ত ভাবরূপে পরিণত না হয়, সে পর্য্যন্ত জীব সাধারণ ভক্ত বা বৈধভক্তরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। নিজ নিজ অধিকারের অনুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত বিশুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, এই রতি বা নিত্য সুখস্বরূপ ভগবদ্দর্শনবিষয়ক লালসা জীবের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া থাকে। ইহাই আবার যখন ভাবের দ্বারা আবিষ্ট হয়, তখনই তাহাকে আচার্য্যগণ 'রাগাত্মিকা ভক্তি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই 'রাগাত্মিকা ভক্তি' আবার যখন সর্ব্বপ্রকারের স্বার্থসম্পর্কবিরহিত হইয়া মোদন নামে প্রসিদ্ধ মহাভাবরূপে পরিণত হয়, তখনই তাহাকে ভক্তি-শাস্ত্রের আচার্য্যগণ 'মধুরভক্তি' বা 'মহাভাব' এইরূপ শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

মোদন মহাভাব

বৈষ্ণব কবিগণ এই মোদনাখ্য মহাভাবকেই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে 'সাধ্যভক্তি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ভগবানের মধুর লীলাবিষয়িণী যে ইচ্ছা

নিত্যসিদ্ধভাবে বিরাজমান আছে, সেই ইচ্ছাবশতঃ এই মোদনাখ্য মহাভাব যখন স্বয়ং অপ্রাকৃত হইয়াও প্রাকৃত আকার ধারণ করিয়া সংসারে মধুর রসের পারাবার সৃষ্টি করে, সেই অবস্থাতেই এই মোদনাখ্য ভাব রাধারূপে প্রকটিত হইয়া থাকে। ইহাই হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্তানুসারে বাস্তব রাধাতত্ত্ব। কত প্রকারে কত অপূর্ব্ব ভাবের মধ্য দিয়া এই আধ্যাত্মিক রাধার স্বরূপ ভক্তিরাজ্যে আত্মবিকাশ করিয়া, ভগবানের মধুর লীলাশক্তির পূর্ণতা সম্পাদন করে, ভক্ত কবিগণের কবিতাসমূহে পরবর্ত্তী কালে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

(৪)

শ্রীরাধার আধ্যাত্মিক রূপায়ণ

সেই কৃষ্ণপ্রেমময়ী বিরহভীতি-বিহ্বলা রাধিকা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সাহিত্যে কি ভাবে আধ্যাত্মিক রাধারূপে পরিণত হইয়া পরবর্ত্তী বৈষ্ণব ভক্ত-মণ্ডলীর পরম উপাস্যরূপে হৃদয়রাজ্য অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই দেখা যাক্। গোবিন্দলীলামৃতে দেখিতে পাওয়া যায়, এই আধ্যাত্মিক রাধার প্রাথমিক স্ফূরণ—

> "সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনী নাম শক্তেঃ
> সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ কিশলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
> সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং
> জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাৎ শতগুণমধিকং যন্তি যত্তন্নচিত্রম্॥"

ব্রজবাসিজনরূপ কুমুদসমূহের পক্ষে সুধাকর-সদৃশ শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের যে জগদানন্দদায়িনী হ্লাদিনী নামক শক্তি বিদ্যমান আছে, সেই শক্তির সার ভূত যে প্রেমলতিকা, তাহা হইল শ্রীরাধার স্বরূপ। সেই প্রেম লতিকার কিশলয়, পত্র ও পুষ্প প্রভৃতির স্থলাভিষিক্ত ললিতা ও বিশাখা প্রভৃতি সখীগণ, ইহারা সকলে রূপে, গুণে, বেশে ও ভূষায় রাধিকারই অনুরূপ। রাধিকারূপ এই প্রেমলতিকা কৃষ্ণলীলার অমৃতরসধারায় সিক্ত হইয়া উল্লসিত হইলে, ঐ সখীগণ কৃষ্ণলীলামৃত-রসের ধারায় নিজে সিক্ত হওয়া অপেক্ষা শতগুণ অধিকভাবে যে সমুল্লসিত করে, তাহাতে কোন বিস্ময়ের কারণ নাই।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণরূপ ভগবানের স্বরূপশক্তি যে হ্লাদিনী, সেই হ্লাদিনীর

সাররূপ যে প্রেম, রাধা সেই প্রেমেরই স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। হ্লাদিনী শক্তির ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া চৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি-দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ ॥

রস-সঞ্চারিণী হ্লাদিনীর বিবর্ত্ত

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মতে ভগবান্ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও, তিনি অদ্বৈতবাদি-সম্মত ভোগ্যভোক্তৃভাব-বর্জ্জিত অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই নহেন। তিনি নিজ স্বরূপ-শক্তির প্রভাবে স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়াও সর্ব্বদা সেই আনন্দের স্বয়ং উপভোক্তা এবং সেই আত্মানন্দের অনুভূতির দ্বারা নিখিল জীবকে আনন্দময় করিয়া, এই কায়িক দুঃখময় প্রপঞ্চকে সুখ-সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়া স্বীয় অনন্ত বৈচিত্র্যময় লীলাশক্তির পূর্ণ বিকাশ করেন, ইহাই তাঁহার স্বভাব। এই স্বভাবেরই নামান্তর হ্লাদিনী শক্তি। এই শক্তি মানব হৃদয়ে প্রেমরূপে বিকশিত হইয়াই প্রপঞ্চকে আনন্দময় করিয়া থাকে, ইহাই হইল গৌড়ীয় ভক্ত দার্শনিক আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তকেই অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব কবিগণ কল্পনা-তুলিকার সাহায্যে ব্রজগোপিকা-কুলললামভূতা প্রেমময়ী শ্রীরাধিকার যে অপূর্ব্ব চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। এ রাধায় প্রেম মহাভাবরূপে পরিণত হইয়াছে, কামবাসনাবাসিত লৌকিক দেহ, ইন্দ্রিয়মন ইহা হইতে একেবারে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণে রস সঞ্চারিণী বৃত্তির চিন্ময় বিবর্ত্তগুলি এই চিন্ময়ী বিশ্বপ্রেমাত্মিকা শ্রীরাধার সখীরূপে পরিণত হইয়াছে। রস ও মাধুর্য্যের মধুর মিলনে চিন্ময় পরিণতি দিব্য সৌরভে পৃথিবীকে অলকা রাজ্যে পরিণত করিয়াছে। তাই চরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

"প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার ॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তার কায়ব্যূহরূপ ॥"

কৃষ্ণ প্রেমবিলাসে রাধার প্রসাধন

এ রাধা আত্মসুখার্থিনী রক্ত মাংসের রাধিকা নহেন। ইনি চৈতন্যময় কৃষ্ণের চৈতন্যময়ী হ্লাদিনী শক্তির বিশ্বজনীন প্রেম-বিবর্ত্ত। আত্মভাবে তিনি আত্ম-মহিমার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া জ্ঞানী ও কর্ম্মীর অদ্বয় জ্ঞানবাদ ও পরিচ্ছিন্ন ভোক্তৃবাদকে সমূলে উন্মুলিত করিবার জন্য সাধকের সদ্‌ভাবময় হৃদি বৃন্দাবনে সমুদিত হইয়া থাকেন। এ রাধিকার বেশভূষা বর্ণন করিতে যাইয়া তাই ভক্ত কবি কবিরাজ গোস্বামী গাহিয়াছেন ঃ—

"রাধা প্রতি কৃষ্ণ স্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্তন।
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ॥
কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান মধ্যম॥
লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজ লজ্জা শ্যাম পট্ট শাড়ী পরিধান॥
কৃষ্ণ অনুরাগ রক্ত দ্বিতীয় বসন।
প্রণয় মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন॥
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখী প্রণয় চন্দন।
স্মিত-কান্তি কর্পূর তিন অঙ্গে বিলেপন॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর॥
প্রচ্ছন্নমান বাম্য ধম্মিল্ল বিন্যাস।
ধীরাধীরাত্ব গুণ অঙ্গে পট্টবাস॥
রাগ তাম্বুল রাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেম কৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল॥
সূদ্দীপ্ত সাত্বিক ভাব হর্ষাদি সঞ্চারী।
এই সব ভাব ভূষণ প্রতি অঙ্গে ভরি॥
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত।
গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত॥
সৌভাগ্যতিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেম বৈচিত্ত্য রত্ন হৃদয়ে তরল॥

মধ্যবয়স্থিতা সখী স্কন্ধে করন্যাস।
কৃষ্ণলীলামনোবৃত্তি সখী আশ-পাশ॥
নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে সৌভাগ্য পর্য্যঙ্ক।
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণ সঙ্গ॥
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ—অবতংস কানে।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ—প্রবাহ যতনে॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস মধু পান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম গুণগান পূর্ণ কলেবর॥

শ্রীরাধার বেশভূষার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য

প্রিয়তম আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলনের অনুকূল বেশ ও ভূষার অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ এই কয়টি পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। ভক্তের প্রতি ভগবানের প্রীতিরূপ যে স্নেহ তাহাই হইল শ্রীরাধার উদ্বর্ত্তন, অর্থাৎ স্নানের পূর্ব্বে সুগন্ধবাসিত হরিদ্রাদিরূপ উদ্বর্ত্তন। এই উদ্বর্ত্তন অঙ্গে মাখিয়া দেহকে নির্ম্মল করিয়া তবে স্নান করিতে হয়। সাধনার পথে কৃষ্ণ মিলনের জন্য অগ্রসর ভক্তের ভাবময় দেহকে প্রথমে ভগবানের ভক্তের প্রতি ভালবাসারূপ যে উদ্বর্ত্তন আছে, তাহার দ্বারা লেপন করিতে হয়, অর্থাৎ ভগবৎ প্রীতির প্রতি আত্যন্তিক বিশ্বাস ও নির্ভর ব্যতিরেকে কোন ভক্তই ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের অনুকূল বিশুদ্ধতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই বিশ্বাসরূপ উদ্বর্ত্তনের সেবনে ভক্তের ভাবময় দেহ ভগবৎপ্রেমের সৌরভে সুরভিত হয়। দুরাকাঙ্ক্ষার দুরন্ত তাপে ক্লিষ্ট বিবর্ণ ভৌতিক দেহ বিলীন হইয়া যায়, সেই সঙ্গে সমুজ্জ্বল বর্ণ বিশিষ্ট কৃষ্ণসঙ্গমের অনুকূল সিদ্ধদেহ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। তাহার পর স্নান। এ স্নান একবার নহে, দুইবার নহে, কিন্তু তিনবার। ইহা কোন ভৌতিক স্বচ্ছ সলিলা শীতলনদীতে অবগাহন নহে। আশে, পাশে, সম্মুখে, পশ্চাতে, উপরে, নীচে, কৃষ্ণের অদর্শনে, স্বকৃতকর্ম্মের বিপাকরূপ দুরন্ত অহমিকার ভীষণ বিপদের আবর্ত্তে পড়িয়া মুহ্যমান হইয়া অসংখ্য জীব যখন অধীর হইয়া রহিয়াছে—তাহাদিগের দুঃখ দেখিয়া আপনারই পূর্ব্বাবস্থা স্মরণে যে বিশ্বজনীন করুণা হৃদয়কে প্লাবিত করিয়া থাকে, সেই করুণাময় অমৃতবারির দ্বারা ভক্তের ভাবময় স্নান, তাহাই হইল তাহার প্রথম স্নান।

জীবের দুঃখে যাহার হৃদয় গলিয়া অমৃত-সাগরের সৃষ্টি করে, সে হৃদয়ে জীব-দুঃখ-নিচয়ের নিরাকরণে সমর্থ অনন্ত অপরিসীম উৎসাহের উদয় হয়। সেই উৎসাহের প্রভাবে জরা বিদূরিত হয়, অবসাদ গলিয়া পড়ে, নূতন তারুণ্যের ছটায় নবজীবনের আলোক প্রভায় জগৎ আলোকিত হইয়া যায়। এই তারুণ্যের অমৃতধারায় কৃষ্ণসমাগমাথিনী শ্রীরাধার দ্বিতীয় স্নান সমাধা হইয়া থাকে। তাহার পর লাবণ্যরূপ যে অমৃতধারা, সেই অমৃতধারায় সেই প্রেমময় বিশুদ্ধ সিদ্ধদেহের তৃতীয় স্নান সাধিত হইয়া থাকে। এ লাবণ্য কিসের প্লাবন? ইহা পার্থিব দেহের প্রাপঞ্চিক সৌন্দর্য্য নহে, কিন্তু ইহা সাধনসিদ্ধ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণরূপ দর্পণে প্রতিফলিত সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ রসঘন-মূর্ত্তি ভগবানের অলৌকিক সৌন্দর্য্যরূপ লাবণ্য। এই লাবণ্যের অনুভূতি হইল ভক্তের পক্ষে ভগবৎ সমাগমের অনুকূল তৃতীয় স্নান।

এই স্নানের পর ভক্ত-হৃদয়ে নিজের অকিঞ্চনত্ব-স্মরণে যে সঙ্কোচ বা লজ্জার অনুভূতি তাহাই শ্রীরাধার শ্যামবর্ণ পট্টবস্ত্র। এ পট্টবস্ত্রে আবৃত না হইলে প্রেমের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে না। সেই পট্টবস্ত্রের উপর উত্তরীয় বস্ত্ররূপে ভগবদনুরাগরূপ রক্তবস্ত্র। নীল শাড়ীর উপর লোহিত বর্ণের উত্তরীয় শোভাবিধান করিয়া থাকে। তাহার পর প্রণয়ের স্বভাবসিদ্ধ যে অহেতুক অভিনয়—তাহাই তাহার বক্ষে আবরণরূপে কঞ্চুলিকার শোভা ধারণ করিয়াছে। এইবার এই ভাবে স্নাত ও রাগবস্ত্রাবৃত প্রেমময়ী শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গে বিলেপনের বর্ণন করা হইতেছে। সে বিলেপন কি? লৌকিক বিলেপনে সাধারণতঃ চন্দন, কুঙ্কুম ও কর্পূর চূর্ণ ব্যবহার হইয়া থাকে। রাধার অঙ্গের বিলেপনে গাঢতাপ্রাপ্ত প্রেমরূপ প্রণয় চন্দনের স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রেমরসে সমুচ্ছলিত চৈতন্যময় দেহের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য কুঙ্কুমের কার্য্য করিতেছে, আর অনুপম আনন্দে উদ্ভাসিত মুখমণ্ডলের মৃদু মধুর হাস্য কর্পূর চূর্ণরূপে পরিণত হইয়াছে। এই অপূর্ব্ব অলৌকিক বিলেপনে বিভূষিত শ্রীরাধার অঙ্গে, নিখিল-সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিরূপ যে উজ্জ্বল রস তাহাই কস্তূরীরূপে পরিণত হইয়াছে। সেই কস্তূরীর দ্বারা বিরচিত অলকা-তিলকারূপ চিত্ররচনা তাঁহার শ্রীঅঙ্গে বিচিত্রিত হইয়াছে। সুগভীর প্রণয় সমুদ্রের ভাবময় তরঙ্গরূপ অন্তঃপ্রচ্ছন্ন মান ও বামতা সেই শ্রীঅঙ্গে কবরীর স্থান অধিকার করিয়াছে। ধীরধীরা স্বভাবরূপ গুণরাজি সেই শ্রীঅঙ্গে পট্টবাস বা সুগন্ধি চূর্ণের অর্থাৎ পাউডারের কার্য্য করিতেছে।

সে চিদানন্দময় দেহে লৌকিক তাম্বূলের রাগ সম্ভবপর নহে, তাই ভগবৎ

প্রেমরূপ তাম্বুলরাগে সেই অধর উজ্জ্বল হইয়াছে। আর প্রেম স্বভাব-বশতঃ সমুদ্ভুত কৌটিল্য তাঁহার নয়ন যুগলে কজ্জলের স্থান অধিকার করিয়াছে। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবনিচয় ও হর্ষ প্রভৃতি প্রীতি-সঞ্চারী ভাবনিচয় একাধারে এককালে আবির্ভূত হইয়া শ্রীরাধার ভাবময় অঙ্গসমূহে বিচিত্র ভূষণের কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। অহেতুক হাস, রোদন প্রভৃতি যে বিংশতি প্রকার ভাব অছে, তাহাও সেই সকল ভূষণের মধ্যে সমাবিষ্ট হইয়াছে। রমণীয় বরণীয় গুণগণ পুষ্পমালার আকার ধারণ করিয়া শ্রীরাধার সকল অঙ্গে অপূর্ব্ব শোভা বিধান করিতেছে। সৌভাগ্যের সমুজ্জ্বল তিলকে সে চারু ললাট অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। প্রেমবৈচিত্ত্যরূপ রত্নহার হৃদয়ের সৌন্দর্য্যকে শতগুণে বর্দ্ধিত করিতেছে। এহেন প্রেমময়ী রাধা মধ্যবয়ঃস্থিতা সখীর স্কন্ধে হস্ত বিন্যস্ত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার আশে-পাশে-সম্মুখে-পশ্চাতে কৃষ্ণলীলারূপ মনোবৃত্তি-নিচয় প্রিয় সখীর কার্য্য করিতেছে। কৃষ্ণ-প্রেমপূত নিজাঙ্গের সৌরভে পরিপূর্ণ বিশ্বপ্রপঞ্চই তাঁহার আবাসগৃহ, সেই আবাসগৃহে সৌভাগ্যরূপ পর্য্যঙ্কে তিনি উপবেশন করেন। সে সময়ে কৃষ্ণ-সঙ্গ-চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা সে হৃদয়ে স্থান পায় না। কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের গুন, কৃষ্ণের যশ, তাঁহার কর্ণের বিভূষণ। কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের গুণ এবং কৃষ্ণের যশঃপ্রবাহ তাঁহার বচনে প্রবাহনরূপে বহিতে থাকে। এইভাবে স্নাত, সজ্জিত ও বিভূষিত হইয়া রাধা আত্মশক্তির প্রভাবে সচ্চিদানন্দ নিরাকার নির্ব্বিকার কৃষ্ণকেও নিজ হৃদয়ে অভিব্যক্ত শ্যামরসরূপ সুধা পান করাইয়া থাকেন। অকাম পুরুষকে সর্ব্বকামের আধার করিয়া তাঁহার আকাঙ্ক্ষাকে পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন। ইহাই হইল রাধার স্বরূপ। কৃষ্ণপ্রেমরূপ বিশুদ্ধ রত্নের ইহাই হইল রত্নাকর। লোকাতীত অনুপম গুণগানে ইহার কলেবর সর্ব্বদা পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

এই ভাবে রাধার স্বরূপ বর্ণন করিয়া চরিতামৃতকার বলিয়াছেন :—

"যাহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যার ঠাঞি কলা-বিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যার সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।
যার পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যার সদ্‌গুন গানের কৃষ্ণ নাহি পান পার।
তার গুন গণিবে কেমনে জীব ছার॥"

ভক্ত-ভগবানে ভেদাভেদ লীলা

এ অপূর্ব্ব রাধাতত্ত্ব কোন প্রাচীন কবির কাব্যে উপলব্ধ হয় না। এ রাধায় প্রেম আছে, কাম নাই। দর্শনে ইহার তত্ত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাঙ্গালী ভক্ত কবির ভগবৎ-প্রেম-বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে এই রাধার ছায়া যে ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে, বাঙ্গালার অমর কবি চৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকবিরাজ গোস্বামী তাহাই উক্ত কয়টি পয়ারে চিত্রিত করিয়াছেন। রাধার এই তত্ত্ব প্রচার করিবার জন্যই কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাই রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন ঃ—

"রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তি রস্মা
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥"

সচ্চিদানন্দ রসঘন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বজীবের প্রতি যে প্রীতি বা প্রণয়, শ্রীরাধা তাহারই পরিণতি। তিনি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। এই কারণে রাধা এবং কৃষ্ণ স্বরূপতঃ একই, ভিন্ন নহেন। কিন্তু তাহা হইলেও এই রাধা এবং কৃষ্ণ সৃষ্টির প্রথম সময় হইতে বিভিন্ন দেহকে আশ্রয় করিয়া সংসারে লীলা করিয়া আসিতেছেন। সেই অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন দেহ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ অদ্য আবার ঐক্যকে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন। রাধার ভাবদ্যুতির দ্বারা সমাবৃত সেই সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ স্বরূপ শ্রীচৈতন্যকে আমি নমস্কার করিতেছি।

ভক্ত ও ভগবান্, এই দুই এর মধ্যে যে পর্য্যন্ত দেহগত ভেদ বিদ্যমান থাকে, সে পর্য্যন্ত প্রেমভক্তি পূর্ণতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যেখানে ভেদ, সেখানেই সংকোচ বা আবরণ; লেশমাত্র আবরণ বিদ্যমান থাকিলে প্রেমের পূর্ণতা প্রকটিত হয় না। এই প্রেমের পূর্ণতার জন্য ভগবান প্রেমের পাত্র হইয়াও—প্রেমের বিষয় হইয়াও—প্রেমের আধাররূপে যতদিন আবির্ভূত হন নাই, ততদিন পর্য্যন্ত মানব প্রেমকে পূর্ণ ভাবে আস্বাদন করিতে সমর্থ হয় নাই। পরিপুর্ণ প্রেমের আস্বাদন ব্যতিরেকে মানব জনমের সাফল্য কথনই সম্ভবপর নহে। সেই পরিপূর্ণ প্রেমের অনাবিল আদর্শ শ্রীরাধা। এহেন রাধাতত্ত্ব যিনি রাধা হইয়া জগতের আরাধনার পথ সুগম করিয়া গিয়াছেন, সেই বাহিরে রাধা—ভিতরে কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যদেবকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করিয়া শ্রীরাধাতত্ত্বের উপসংহার করা যাইতেছে।

গভীরতা বুঝিতে না পারায় রসিক ভক্তগোষ্ঠী ক্ষণকালের জন্য যেন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। অন্তর্য্যামী প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেব ইহা দেখিলেন, ব্যাপার কি তাহাও বুঝিলেন, কিন্তু কাহাকেও ইঙ্গিতে কিছু বুঝাইবার চেষ্টা না করিয়া তিনি আবার নৃত্যারম্ভ করিলেন। আবার নৃত্যরস প্রবাহের বন্যায় যাত্রী ও ভক্তবৃন্দকে ভাসাইয়া অনাবিল আনন্দের গোলোক এই মর জগতে সৃষ্টি করিয়া যথা সময়ে নৃত্য করিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহে নীলাচলনাথকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া মধ্যাহ্ন স্নানের জন্য পার্ষদগণ সমভিব্যাহারে গম্ভীরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রসরাজ রসিকশেখরের লীলাশক্তির এক নবীন বিবর্ত্ত অব্যাখ্যাতভাবেই রহিয়া গেল।

শ্রীরূপের অনুপ্রেরণা

মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন স্নান করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন, এমন সময় শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত দেখা হইল। যথারীতি অভিবাদনের পর গোস্বামী তাঁহার অনুসন্ধিৎসু নয়নদ্বয় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীমুখারবিন্দে সন্নিবেশিত করিবামাত্র গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন—

> কৃষ্ণকে বাহির না করিহ ব্রজ হইতে।
> ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কাঁহাতে॥

চৈতন্য-চরিতামৃত, অন্ত্যখণ্ড—১ম পরিচ্ছেদ।

এই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্নান করিতে চলিয়া গেলেন, শ্রীরূপ গোস্বামী কিন্তু তাঁহার অনুগমন না করিয়া চিন্তাকুল মানসে গম্ভীরায় প্রবেশ করিলেন। সেদিনকার রথযাত্রার ঘটনা তাঁহার মনে জাগিয়া রহিয়াছে, তাহার পর স্নানের পথে মহাপ্রভু "কৃষ্ণকে কখনও ব্রজ হইতে বাহির করিও না, কৃষ্ণ কখনও ব্রজ ছাড়িয়া যাইতে পারেন না", এইরূপ কথাই বা হঠাৎ কেন আমাকে শুনাইয়া কহিলেন, এই সকল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে শ্রীরূপ গোস্বামী কি এক নূতনভাবে বিভোর হইয়া উঠিলেন, সম্মুখে একখানি তালপত্র পড়িয়াছিল, তাহা হাতে করিয়া উঠাইয়া লইয়া তাহাতে ভাবময় স্বপ্নের আবেশে একটি শ্লোক লিখিয়া ফেলিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে কুটীরে অবস্থান করিতেন, তাহারই খড়ের চালায় প্রবেশদ্বারের ঊর্দ্ধদিকে সেই তালপত্রখানি গুঁজিয়া রাখিলেন।

এই কার্য্য সমাধা করিয়া তাড়াতাড়ি তিনি স্নানের জন্য সমুদ্রতীরে গমন

কিন্তু সে নৃত্য থামিয়া গেল। রথারূঢ় দারুব্রহ্মময় শ্রীমূর্ত্তির বিশাল সমুজ্জ্বল মনোহর নয়নদ্বয়ে নিজ নয়নদ্বয় স্থিরভাবে বিন্যস্ত করিয়া দরদরিত অশ্রুধারায় বিশাল বক্ষঃ প্লাবিত করিয়া ধরাতল সিক্ত করিতে করিতে করুণাকাতর কণ্ঠে বদ্ধাঞ্জলি শ্রীমহাপ্রভু উদাসভাবে এই শ্লোকটি পাঠ করিতে লাগিলেন—

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তেচোন্মীলিত-মালতী-সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত-ব্যাপার-লীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥"

(সাহিত্যদর্পণে উদ্ধৃত শ্লোক)

ইহার তাৎপর্য্য এই—

"মর্ম্মন্তুদ তীব্র বিরহের জ্বালাময় সন্তাপে যাহার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে সুখের কৌমার জীবন জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া গিয়াছে, সেই কান্ত আজ আবার বরবেশে অভাগিনীর নয়ন পথের পথিক হইয়াছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বড় সাধের সেই সুধাকর-কররাজি-সমুজ্জ্বল মধুযামিনীও দেখা দিয়াছে। নব বিকশিত মালতী-কুসুম-সৌরভসুবাসিত প্রস্ফুটিত কদম্বরাজির প্রাণ-মাতান সুগন্ধভারে মন্দবহনশীল স্নিগ্ধশীতল মারুতও তেমনই করিয়া আকাশ-পবন প্লাবিত করিয়া তেমনই ধীরভাবে আবার বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর আমিও মনে হয়, এখনও সেই আমিই রহিয়াছি। কিন্তু, মন কিছুতেই মানিতেছে না, কেবলই মনে পড়িতেছে, সেই নর্ম্মদাতীর আর সেই নর্ম্মদাতীরের সেই বেতসীলতার নিভৃত স্নিগ্ধ শান্তকুঞ্জ আর সেই কুঞ্জে প্রিয়তমের প্রীতিমাখা মুখ দেখিতে দেখিতে বিশ্ব সংসার ভুলিয়া গিয়া তাঁহারই অঙ্কে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া আমি—সেই আমিই আবার আত্মহারা হইয়া প্রেমসুষুপ্তির মোহন মদিরাবশে, মুগ্ধভাবে বিলীন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি; হায়, অবশ মনের এই উৎকণ্ঠা কি শান্ত হইবার নহে!"

প্রাকৃত কাব্যের আবৃত্তিতে ইঙ্গিত

হঠাৎ মহাপ্রভুর নৃত্য বন্ধ, আর সেই সময় তাঁহার মুখে প্রাকৃত কাব্যের এই শ্লোকের ভাবাবেশময় আবৃত্তি, ইহার তাৎপর্য্য কি, তাহা না বুঝিতে পারিয়া কিন্তু ভক্তগণ যেন একটু উন্মনায়মান হইয়া উঠিলেন। রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গের অকস্মাৎ সমুদ্ভূত এই নবীন রসতরঙ্গ অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব। ইহার

রথযাত্রা

বিরাট মহোৎসব

রথে শ্রীবামনমূর্ত্তি দেখিয়া পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশায়, আজ অহিমাচল আসমুদ্র ভারতের সকল প্রদেশের সনাতনধর্ম্মাবলম্বী জনগণ নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। যাঁহার অধিষ্ঠানে সমগ্র জীব-নিবহের দেহরথ চলিয়া থাকে, সেই সচ্চিদানন্দ রসঘন প্রেমের ঠাকুরকে দারুব্রহ্মমূর্ত্তিতে বাহিরের ভৌতিক রথে দেখিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় বিশাল ভারতে আজ এক বৎসর পরে আবার আকুল প্রাণের মধ্যে একটা বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। দর্শনোৎসুক অবিরাম জনস্রোতের প্রবল বন্যার তীব্র আঘাতে রেলকোম্পানীর শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়ম-প্রাচীরও ভাঙ্গিবার উপক্রম করিতেছে। নীলাচলের অভিমুখে ধাবমান অগণিত যাত্রীর "জয় জগন্নাথ" ধ্বনিতে আকাশপবনও প্রতিক্ষণ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। এই বিরাট হিন্দু মহোৎসবের বিরাট সমাবেশের বিস্ময়াবহ বিরাট আয়োজন দেখিলে, সত্য সত্যই মনে হয়, এখনও হিন্দু বাঁচিয়া আছে, কে বলে তাহার জীবনীশক্তি নির্ব্বাণোন্মুখ হইতেছে? যে বলে সে ভ্রান্ত, তাহার এই নৈরাশ্যের ভয়াবহ অবসাদ কল্পিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

সমগ্র ভারতবাসী হিন্দু এ রথযাত্রা মহোৎসবকে কি ভাবে দেখিয়া থাকে, তাহার আলোচনা আজ করিব না, চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের বৈষ্ণব সম্প্রদায় কেমন করিয়া কিভাবে এই রথযাত্রা দেখিয়া আপনাকে ধন্য বলিয়া বিবেচনা করিত, আজিকার প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

রথযাত্রায় সপরিকর মহাপ্রভু

নীলাচলে রথযাত্রা মহোৎসব দর্শনব্যপদেশে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণারবিন্দ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইবার আশায় শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীবাস প্রভৃতি গৌরাঙ্গপ্রাণ গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ সমবেত হইয়াছেন। এবার সৌভাগ্যক্রমে শ্রীবৃন্দাবন হইতে ভক্তকুল-শিরোমণি শ্রীরূপগোস্বামী ও শ্রীসনাতনগোস্বামী সেই সময় নীলাচলে উপস্থিত, সুতরাং এবার রথযাত্রায় ভক্তবৃন্দের আনন্দের আর সীমা নাই। রথযাত্রার দিনে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বিরাট নাম-সঙ্কীর্ত্তন মহা-যজ্ঞে ভাবোদ্বেগ-বিহ্বল উন্মাদনাময় উদ্দণ্ড নৃত্য হইতেছে। হঠাৎ ক্ষণকালের জন্য

করিলেন। তাহার পর কি হইল, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের পদে এই ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—

হেনকালে আইলা প্রভু তাঁহারে মিলিতে।
চালে গোঁজা শ্লোক পাঞা লাগিলা পড়িতে॥
শ্লোক পড়ি সুখে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
সেই কালে রূপ গোসাঞি স্নান করি আইলা॥
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ প্রাঙ্গণে পড়িলা।
প্রভু তারে চাপড় মারি কহিতে লাগিলা॥
গূঢ় মোর হৃদয় তুঞি জানিলি কেমনে।
এত বলি রূপে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গনে॥
সেই শ্লোক লইয়া প্রভু স্বরূপে দেখাইল।
স্বরূপের পরীক্ষা লাগি তাহারে পুছিল॥
মোর অন্তর্বার্ত্তা রূপ জানিল কেমনে।
স্বরূপ কহে জানি কৃপা করিয়াছ আপনে॥
প্রভু কহে এহোঁ মোরে প্রয়াগে মিলিল।
যোগ্যপাত্র জানি ইহায় মোর কৃপা হইল॥
তবে শক্তি সঞ্চারিয়া কৈল উপদেশ।
তুমিও কহিও ইহার রসের বিশেষ॥
স্বরূপ কহে, যবে এই শ্লোক দেখিল।
তুমি কৃপা করিয়াছ তবহি জানিল॥

চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যখণ্ড—১ম পরিচ্ছেদ।

কুরুক্ষেত্রে সন্দর্শনের শ্লোক

তাহার পর ভক্তমণ্ডলীকে একত্র করিয়া একদিন মহাপ্রভু দুই ভ্রাতার সহিত পরিচিত করিবার জন্য হঠাৎ শ্রীরূপের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন সেখানে কি করিলেন ?

ভক্ত সঙ্গে প্রভু আইলা দেখি দুই জন।
দণ্ডবৎ হইয়া কৈল চরণ বন্দন॥
ভক্ত সঙ্গে কৈল প্রভু দুহাঁকে মিলন।
পিণ্ডার উপরে বসিলা লইয়া ভক্তগণ॥

রূপ হরিদাস দুহে বসিলা পিণ্ডাতলে।
সভা অগ্রে না বসিলা পিণ্ডার উপরে॥"

তাহার পর কি হইল ?

"পূর্ব্ব শ্লোক পঢ় যবে প্রভু আজ্ঞা দিল।
লজ্জাতে না পড়ে রূপ মৌন ধরিল॥"

তখন মহাপ্রভুর ইঙ্গিতানুসারে—

"স্বরূপ গোসাঞি তবে সেই শ্লোক পড়িল।
শুনি সভাকার চিত্তে চমৎকার হইল॥"

সেই শ্লোকটি এই—

"প্রিয়ঃ কৃষ্ণঃ সোঽয়ং সহচরি কুরুক্ষেত্র মিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গম সুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুর-মুরলী-পঞ্চম-জুষে
মনোমে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥"

ইহার তাৎপর্য্য—

শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন,—"সহচরি, এই সেই কান্ত কৃষ্ণ, আজ আবার কুরুক্ষেত্রে (রথারূঢ় হইয়া) আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন, আমিও সেই রাধা আজ এখানে। এখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধার ইহাই সুখের মিলন! এ মিলনও বটে, ইহাতে আনন্দ নাই, তাহাও বলিতে পারি না; তথাপি সখি, সেই যমুনার পুলিনে নিভৃত নিকুঞ্জ কানন—যেখানে শ্যামের অধরসুধার আস্বাদনে উন্মত্ত হইয়া ক্রীড়াশীল মুরলী মধুর পঞ্চম স্বরে দিঙ্মণ্ডলকে মধুময় করিয়া তুলিত, সেই নিকুঞ্জ কাননের জন্য এক অতৃপ্ত তৃষা আমার মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে।"

এই শ্লোক শুনিয়া ভক্তবৃন্দের হৃদয়ের সকল সংশয় দূর হইল, রথযাত্রাকালে শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া অকস্মাৎ উদ্দণ্ডনৃত্য পরিহারপূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গদেব কেন যে সাহিত্যদর্পণধৃত "যঃ কৌমারহরঃ" ইত্যাদি শ্লোক আবিষ্টভাবে পাঠ করিয়াছিলেন, শ্রীরূপের মধুর কবিতা শুনিয়া এক্ষণে তাঁহারা তাহা বিশদভাবে বুঝিতে সমর্থ হইয়া অসীম আনন্দ উপভোগ করিলেন।

ভাগবতে রথযাত্রার সূচনা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতানুসারে ইহাই হইল—রথযাত্রার শ্রীমদভাগবত

ভক্ত-ভগবানে ভেদাভেদ লীলা

এ অপূর্ব্ব রাধাতত্ত্ব কোন প্রাচীন কবির কাব্যে উপলব্ধ হয় না। এ রাধায় প্রেম আছে, কাম নাই। দর্শনে ইহার তত্ত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাঙ্গালী ভক্ত কবির ভগবৎ-প্রেম-বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে এই রাধার ছায়া যে ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে, বাঙ্গালার অমর কবি চৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকবিরাজ গোস্বামী তাহাই উক্ত কয়টি পয়ারে চিত্রিত করিয়াছেন। রাধার এই তত্ত্ব প্রচার করিবার জন্যই কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাই রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন :—

"রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তিরস্মা
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥"

সচ্চিদানন্দ রসঘন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বজীবের প্রতি যে প্রীতি বা প্রণয়, শ্রীরাধা তাহারই পরিণতি। তিনি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। এই কারণে রাধা এবং কৃষ্ণ স্বরূপতঃ একই, ভিন্ন নহেন। কিন্তু তাহা হইলেও এই রাধা এবং কৃষ্ণ সৃষ্টির প্রথম সময় হইতে বিভিন্ন দেহকে আশ্রয় করিয়া সংসারে লীলা করিয়া আসিতেছেন। সেই অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন দেহ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ অদ্য আবার ঐক্যকে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন। রাধার ভাবদ্যুতির দ্বারা সমাবৃত সেই সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ-স্বরূপ শ্রীচৈতন্যকে আমি নমস্কার করিতেছি।

ভক্ত ও ভগবান্, এই দুই-এর মধ্যে যে পর্য্যন্ত দেহগত ভেদ বিদ্যমান থাকে, সে পর্য্যন্ত প্রেমভক্তি পূর্ণতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যেখানে ভেদ, সেখানেই সংকোচ বা আবরণ; লেশমাত্র আবরণ বিদ্যমান থাকিলে প্রেমের পূর্ণতা প্রকটিত হয় না। এই প্রেমের পূর্ণতার জন্য ভগবান্ প্রেমের পাত্র হইয়াও—প্রেমের বিষয় হইয়াও—প্রেমের আধাররূপে যতদিন আবির্ভূত হন নাই, ততদিন পর্য্যন্ত মানব প্রেমকে পূর্ণ ভাবে আস্বাদন করিতে সমর্থ হয় নাই। পরিপূর্ণ প্রেমের আস্বাদন ব্যতিরেকে মানব জনমের সাফল্য কথনই সম্ভবপর নহে। সেই পরিপূর্ণ প্রেমের অনাবিল আদর্শ শ্রীরাধা। এহেন রাধাতত্ত্বে যিনি রাধা হইয়া জগতের আরাধনার পথ সুগম করিয়া গিয়াছেন, সেই বাহিরের রাধা—ভিতরে কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যদেবকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করিয়া শ্রীরাধাতত্ত্বের উপসংহার করা যাইতেছে।

রথযাত্রা

বিরাট মহোৎসব

রথে শ্রীবামনমূর্ত্তি দেখিয়া পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশায়, আজ আহিমাচল আসমুদ্র ভারতের সকল প্রদেশের সনাতনধর্ম্মাবলম্বী জনগণ নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। যাঁহার অধিষ্ঠানে সমগ্র জীব-নিবহের দেহরথ চলিয়া থাকে, সেই সচ্চিদানন্দ রসঘন প্রেমের ঠাকুরকে দারুব্রহ্মমূর্ত্তিতে বাহিরের ভৌতিক রথে দেখিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় বিশাল ভারতে আজ এক বৎসর পরে আবার আকুল প্রাণের মধ্যে একটা বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। দর্শনোৎসুক অবিরাম জনস্রোতের প্রবল বন্যার তীব্র আঘাতে রেলকোম্পানীর শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়ম-প্রাচীরও ভাঙ্গিবার উপক্রম করিতেছে। নীলাচলের অভিমুখে ধাবমান অগণিত যাত্রীর "জয় জগন্নাথ" ধ্বনিতে আকাশপবনও প্রতিক্ষণ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। এই বিরাট হিন্দু মহোৎসবের বিরাট সমাবেশের বিস্ময়াবহ বিরাট আরম্ভ দেখিলে, সত্য সত্যই মনে হয়, এখনও হিন্দু বাঁচিয়া আছে, কে বলে তাহার জীবনীশক্তি নির্ব্বাণোন্মুখ হইতেছে? যে বলে সে ভ্রান্ত, তাহার এই নৈরাশ্যের ভয়াবহ অবসাদ কল্পিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

সমগ্র ভারতবাসী হিন্দু এ রথযাত্রা মহোৎসবকে কি ভাবে দেখিয়া থাকে, তাহার আলোচনা আজ করিব না, চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের বৈষ্ণব সম্প্রদায় কেমন করিয়া কিভাবে এই রথযাত্রা দেখিয়া আপনাকে ধন্য বলিয়া বিবেচনা করিত, আজিকার প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

রথযাত্রায় সপরিকর মহাপ্রভু

নীলাচলে রথযাত্রা মহোৎসব দর্শনব্যপদেশে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণারবিন্দ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইবার আশায় শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীবাস প্রভৃতি গৌরাঙ্গপ্রাণ গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ সমবেত হইয়াছেন। এবার সৌভাগ্যক্রমে শ্রীবৃন্দাবন হইতে ভক্তকুল-শিরোমণি শ্রীরূপগোস্বামী ও শ্রীসনাতনগোস্বামী সেই সময় নীলাচলে উপস্থিত, সুতরাং এবার রথযাত্রায় ভক্তবৃন্দের আনন্দের আর সীমা নাই। রথযাত্রার দিনে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বিরাট নাম-সঙ্কীর্ত্তন মহাযজ্ঞে ভাবোদ্বেগ-বিহ্বল উন্মাদনাময় উদ্দণ্ড নৃত্য হইতেছে। হঠাৎ ক্ষণকালের জন্য

কিন্তু সে নৃত্য থামিয়া গেল। রথারূঢ় দারুব্রহ্মময় শ্রীমূর্ত্তির বিশাল সমুজ্জ্বল মনোহর নয়নদ্বয়ে নিজ নয়নদ্বয় স্থিরভাবে বিন্যস্ত করিয়া দরদরিত অশ্রুধারায় বিশাল বক্ষঃ প্লাবিত করিয়া ধরাতল সিক্ত করিতে করিতে করুণাকাতর কণ্ঠে বদ্ধাঞ্জলি শ্রীমহাপ্রভু উদাসভাবে এই শ্লোকটি পাঠ করিতে লাগিলেন—

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তেচোন্মীলিত-মালতী-সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত-ব্যাপার-লীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥"

(সাহিত্যদর্পণে উদ্ধৃত শ্লোক)

ইহার তাৎপর্য্য এই—

"মর্ম্মন্তুদ তীব্র বিরহের জ্বালাময় সন্তাপে যাহার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে সুখের কৌমার জীবন জলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া গিয়াছে, সেই কান্ত আজ আবার বরবেশে অভাগিনীর নয়ন পথের পথিক হইয়াছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বড় সাধের সেই সুধাকর-কররাজি-সমুজ্জ্বল মধুযামিনীও দেখা দিয়াছে। নব বিকশিত মালতী-কুসুম-সৌরভসুবাসিত প্রস্ফুটিত কদম্বরাজির প্রাণ-মাতান সুগন্ধভারে মন্দবহনশীল স্নিগ্ধশীতল মারুতও তেমনই করিয়া আকাশ-পবন প্লাবিত করিয়া তেমনই ধীরভাবে আবার বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর আমিও মনে হয়, এখনও সেই আমিই রহিয়াছি। কিন্তু, মন কিছুতেই মানিতেছে না, কেবলই মনে পড়িতেছে, সেই নর্ম্মদাতীর আর সেই নর্ম্মদাতীরের সেই বেতসীলতার নিভৃত স্নিগ্ধ শান্তকুঞ্জ আর সেই কুঞ্জে প্রিয়তমের প্রীতিমাখা মুখ দেখিতে দেখিতে বিশ্ব সংসার ভুলিয়া গিয়া তাঁহারই অঙ্কে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া আমি— সেই আমিই আবার আত্মহারা হইয়া প্রেমসুষুপ্তির মোহন মদিরাবশে, মুগ্ধভাবে বিলীন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি ; হায়, অবশ মনের এই উৎকণ্ঠা কি শান্ত হইবার নহে!"

প্রাকৃত কাব্যের আবৃত্তিতে ইঙ্গিত

হঠাৎ মহাপ্রভুর নৃত্য বন্ধ, আর সেই সময় তাঁহার মুখে প্রাকৃত কাব্যের এই শ্লোকের ভাবাবেশময় আবৃত্তি, ইহার তাৎপর্য্য কি, তাহা না বুঝিতে পারিয়া কিন্তু ভক্তগণ যেন একটু উন্মনায়মান হইয়া উঠিলেন। রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গের অকস্মাৎ সমুদ্ভুত এই নবীন রসতরঙ্গ অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব। ইহার

গভীরতা বুঝিতে না পারায় রসিক ভক্তগোষ্ঠী ক্ষণকালের জন্য যেন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। অন্তর্য্যামী প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেব ইহা দেখিলেন, ব্যাপার কি তাহাও বুঝিলেন, কিন্তু কাহাকেও ইঙ্গিতে কিছু বুঝাইবার চেষ্টা না করিয়া তিনি আবার নৃত্যারম্ভ করিলেন। আবার নৃত্যরস প্রবাহের বন্যায় যাত্রী ও ভক্তবৃন্দকে ভাসাইয়া অনাবিল আনন্দের গোলোক এই মর জগতে সৃষ্টি করিয়া যথা সময়ে তিনি নৃত্য করিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহে নীলাচলনাথকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া মধ্যাহ্ন স্নানের জন্য পার্ষদগণ সমভিব্যাহারে গম্ভীরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রসরাজ রসিকশেখরের লীলাশক্তির এক নবীন বিবর্ত্ত অব্যাখ্যাতভাবেই রহিয়া গেল।

শ্রীরূপের অনুপ্রেরণা

মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন স্নান করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন, এমন সময় শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত দেখা হইল। যথারীতি অভিবাদনের পর গোস্বামী তাঁহার অনুসন্ধিৎসু নয়নদ্বয় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীমুখারবিন্দে সন্নিবেশিত করিবামাত্র গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন—

কৃষ্ণকে বাহির না করিহ ব্রজ হইতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কাঁহাতে॥

চৈতন্য-চরিতামৃত, অন্ত্যখণ্ড—১ম পরিচ্ছেদ।

এই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্নান করিতে চলিয়া গেলেন, শ্রীরূপ গোস্বামী কিন্তু তাঁহার অনুগমন না করিয়া চিন্তাকুল মানসে গম্ভীরায় প্রবেশ করিলেন। সেদিনকার রথযাত্রার ঘটনা তাঁহার মনে জাগিয়া রহিয়াছে, তাহার পর স্নানের পথে মহাপ্রভু "কৃষ্ণকে কখনও ব্রজ হইতে বাহির করিও না, কৃষ্ণ কখনও ব্রজ ছাড়িয়া যাইতে পারেন না", এইরূপ কথাই বা হঠাৎ কেন আমাকে শুনাইয়া কহিলেন, এই সকল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে শ্রীরূপ গোস্বামী কি এক নূতনভাবে বিভোর হইয়া উঠিলেন। সম্মুখে একখানি তালপত্র পড়িয়াছিল, তাহা হাতে করিয়া উঠাইয়া লইয়া তাহাতে ভাবময় স্বপ্নের আবেশে একটি শ্লোক লিখিয়া ফেলিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে কুটীরে অবস্থান করিতেন, তাহারই খড়ের চালায় প্রবেশদ্বারের উর্দ্ধদিকে সেই তালপত্রখানি গুঁজিয়া রাখিলেন।

এই কার্য্য সমাধা করিয়া তাড়াতাড়ি তিনি স্নানের জন্য সমুদ্রতীরে গমন

করিলেন। তাহার পর কি হইল, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের পদে এই ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—

হেনকালে আইলা প্রভু তাঁহারে মিলিতে।
চালে গোঁজা শ্লোক পাঞা লাগিলা পড়িতে॥
শ্লোক পড়ি সুখে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
সেই কালে রূপ গোসাঞি স্নান করি আইলা॥
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ প্রাঙ্গণে পড়িলা।
প্রভু তারে চাপড় মারি কহিতে লাগিলা॥
গূঢ় মোর হৃদয় তুঞি জানিলি কেমনে।
এত বলি রূপে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গনে॥
সেই শ্লোক লইয়া প্রভু স্বরূপে দেখাইল।
স্বরূপের পরীক্ষা লাগি তাহারে পুছিল॥
মোর অন্তর্বার্ত্তা রূপ জানিল কেমনে।
স্বরূপ কহে জানি কৃপা করিয়াছ আপনে॥
প্রভু কহে এহোঁ মোরে প্রয়াগে মিলিল।
যোগ্যপাত্র জানি ইঁহায় মোর কৃপা হইল॥
তবে শক্তি সঞ্চারিয়া কৈল উপদেশ।
তুমিও কহিও ইহার রসের বিশেষ॥
স্বরূপ কহে, যবে এই শ্লোক দেখিল।
তুমি কৃপা করিয়াছ তবহি জানিল॥

চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যখণ্ড—১ম পরিচ্ছেদ।

কুরুক্ষেত্রে সন্দর্শনের শ্লোক

তাহার পর ভক্তমণ্ডলীকে একত্র করিয়া একদিন মহাপ্রভু দুই ভ্রাতার সহিত পরিচিত করিবার জন্য হঠাৎ শ্রীরূপের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন সেখানে কি করিলেন?

"ভক্ত সঙ্গে প্রভু আইলা দেখি দুই জন।
দণ্ডবৎ হইয়া কৈল চরণ বন্দন॥
ভক্ত সঙ্গে কৈল প্রভু দুহাঁকে মিলন।
পিণ্ডার উপরে বসিলা লইয়া ভক্তগণ॥

রূপ হরিদাস দুহে বসিলা পিণ্ডাতলে।
সভা অগ্রে না বসিলা পিণ্ডার উপরে॥"

তাহার পর কি হইল?

"পূর্ব্ব শ্লোক পঢ় যবে প্রভু আজ্ঞা দিল।
লজ্জাতে না পঢ়ে রূপ মৌন ধরিল॥"

তখন মহাপ্রভুর ইঙ্গিতানুসারে—

"স্বরূপ গোসাঞি তবে সেই শ্লোক পড়িল।
শুনি সভাকার চিত্তে চমৎকার হইল॥"

সেই শ্লোকটি এই—

"প্রিয়ঃ কৃষ্ণঃ সোঽয়ং সহচরি কুরুক্ষেত্র-মিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গম-সুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুর-মুরলী-পঞ্চম-জুষে
মনোমে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥"

ইহার তাৎপর্য্য—

শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন,—"সহচরি, এই সেই কান্ত কৃষ্ণ, আজ আবার কুরুক্ষেত্রে (রথারূঢ় হইয়া) আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন, আমিও সেই রাধা আজ এখানে। এখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধার ইহাই সুখের মিলন! এও মিলন বটে, ইহাতে আনন্দ নাই, তাহাও বলিতে পারি না; তথাপি সখি, সেই যমুনার পুলিনে নিভৃত নিকুঞ্জ কানন—যেখানে শ্যামের অধরসুধার আস্বাদনে উন্মত্ত হইয়া ক্রীড়াশীল মুরলী মধুর পঞ্চম স্বরে দিঙ্‌মণ্ডলকে মধুময় করিয়া তুলিত, সেই নিকুঞ্জ কাননের জন্য এক অতৃপ্ত তৃষা আমার মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে।"

এই শ্লোক শুনিয়া ভক্তবৃন্দের হৃদয়ের সকল সংশয় দূর হইল, রথযাত্রাকালে শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া অকস্মাৎ উদ্দণ্ডনৃত্য পরিহারপূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গদেব কেন যে সাহিত্যদর্পণধৃত "যঃ কৌমারহরঃ" ইত্যাদি শ্লোক আবিষ্টভাবে পাঠ করিয়াছিলেন, শ্রীরূপের মধুর কবিতা শুনিয়া এক্ষণে তাঁহারা তাহা বিশদভাবে বুঝিতে সমর্থ হইয়া অসীম আনন্দ উপভোগ করিলেন।

ভাগবতে রথযাত্রার সূচনা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতানুসারে ইহাই হইল—রথযাত্রার শ্রীমদ্ভাগবত

সম্মত গূঢ়রহস্য, এ রহস্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে শ্রীমদ্‌ভাগবতের শরণ লওয়া আবশ্যক, তাহাই এখন দেখাইব।

শ্রীমদভাগবতের দশম স্কন্ধে বিরাশী অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সূর্য্যগ্রহণে স্নান-প্রসঙ্গে কুরুক্ষেত্র-যাত্রা বর্ণিত হইয়াছে, এই যাত্রাই শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রার সূত্র-স্থানীয়। এই যাত্রায় সকল যাদব বন্ধু সমভিব্যাহারে মহার্হ রথে আরূঢ় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই আগমনসংবাদ জনমুখে পূর্ব্ব হইতে অবগত হইয়া ব্রজবাসী গোপ ও গোপীগণকে সঙ্গে করিয়া শ্রীনন্দ একবার চোখের দেখা দেখিবার আশায় বৃন্দাবন হইতে কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন, ইহাও শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। শুধু আসিয়া দূর হইতে ব্রজনাথকে দেখিয়াই যে তাঁহারা শূণ্য মনে ব্রজে ফিরিয়া গিয়াছিলেন, তাহা নহে—অনেক সাধ্যসাধনার ফলে ব্রজগোপীগণ গোপীনাথের সহিত সাক্ষাৎও করিতে পারিয়াছিলেন। সাক্ষাৎকার পাইয়া বিদায়ের সময় গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে যে প্রাণের কথা বলিয়া অনন্তকালের জন্য অনন্তের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছিলেন, সেই কথা গোপীর মুখেই শোভা পায়।

গোপীগণের বিদায়বাণী

তাঁহারা বলিয়াছিলেন কি, তাহা ভাগবতের ভাষাতেই শ্রবণযোগ্য—

"আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥"

"গোপীগণ বলিয়াছিলেন, হে নলিননাভ! অগাধবোধ যোগেশ্বরগণ সর্ব্বদা যাহা হৃদয়ে ধ্যান করিবার জন্য তৎপর হইয়া থাকেন, যাহা সংসার-কূপে নিপতিত প্রাণিসমূহের একমাত্র উদ্ধারের হেতু, তোমার সেই পদারবিন্দ যেন আমাদের মনে সমুদিত হয়, যদি কখনও আমাদের মন গৃহে আসক্ত হয়, তখনই যেন ঐ চরণারবিন্দ হৃদয়ে উদিত হয়। ইহাই শ্রীচরণে আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।" ইহাই শ্রীধর স্বামী ও অন্যান্য টীকাকারগণের উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা। শ্রীগৌরাঙ্গদেব কিন্তু এ ব্যাখ্যায় পরিতোষলাভ করিতে পারেন নাই, এরূপ ব্যাখ্যা অঙ্গীকার করিলে ব্রজদেবী গোপীগণের রাগানুগা ভক্তির স্বরূপ সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের তাৎপর্য্য বর্ণন

শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভাবোন্মাদের প্রেরণায় ভাগবতের এই সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকটির যেরূপ তাৎপর্য্য-বর্ণন করিয়াছেন, তাহা চৈতন্য-চরিতামৃতের মধুর ভাষায় বড়ই সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে।

অন্যের যে অন্য মন আমার মন বৃন্দাবন
মনে মনে এক করি জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥
প্রাণনাথ শুন মোর সত্য নিবেদন।
ব্রজ আমার সদন তাহাতে তোমার সঙ্গম
না পাইলে না রহে জীবন॥

পূর্ব্বে উদ্ধব দ্বারে এবে চ সাক্ষাৎ আমারে
যোগ জ্ঞানের কহিলে উপায়।
তুমি বিদগ্ধ কৃপাময় জান আমার হৃদয়
আমার ঐছে কহিতে না যুয়ায়॥

চিত্ত কাড়ি তোমা হইতে বিষয়ে চাহি লাগাইতে
যত্ন করি, নারি কাড়িবারে।
তারে জ্ঞান দান কর লোক হাসাইয়া মার
স্থানাস্থান না কর বিচারে॥

নহে গোপী যোগেশ্বর তোমার পদ কমল—
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ।
তোমার বাক্য পরিপাটী তার মধ্যে কুটিনাটি
শুনি গোপীর বাঢ়ে আরও রোষ॥

দেহ-স্মৃতি নাহি যার সংসার-কূপ কাঁহা তার
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ-সমুদ্রজলে কাম তিমিঙ্গিলে গিলে
গোপীগণে লহ তার পার॥

বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন মাতা পিতা বন্ধুজন
বড় চিত্র! কেমনে পাসরিলা।

বিদগ্ধ মৃদু সদ্‌গুণ সুশীল স্নিগ্ধ করুণ
তুমি, তোমার নাহি দোষাভাস।
তবে তোমার মন নাহি স্মরে ব্রজজন
সে আমার দুর্দ্দৈব বিলাস॥

না গণে আপন দুঃখ দেখি ব্রজেশ্বরী মুখ
ব্রজজন-হৃদয় বিদরে।
কিবা মার ব্রজবাসী কিবা জীয়াও ব্রজে আসি
কেনে জীয়াও দুঃখ সহিবারে॥

তোমার সে অন্য বেশ অন্য সঙ্গ অন্য দেশ
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে তোমা না দেখিলে মরে
ব্রজজনের কি হবে উপায়॥

তুমি ব্রজের জীবন তুমি ব্রজের প্রাণধন
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ।
কৃপার্দ্র তোমার মন আসি জীয়াও ব্রজজন
ব্রজে উদয় করহ নিজপদ॥

(চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্য পঃ ১৩)

ইহাই হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-সার-রহস্য।

প্রপঞ্চরথে দারুব্রহ্ম—ভক্তের বিরহ-বিক্ষোভ

হৃদয়-বৃন্দাবন শূণ্য করিয়া রসঘন চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্ বাহিরে ঐশ্বর্য্যের লীলা প্রকট করিতেছেন, এদৃশ্য গোপীর প্রাণে সহে না। প্রাণারাম প্রাণগেহ দেহ উপেক্ষা করিয়া প্রপঞ্চের মর্য্যাদা বিধান করিতে ব্যগ্র, আর তাঁহার সাধের লীলাক্ষেত্র ভক্তের হৃদয়-বৃন্দাবনে অদর্শনের নিবিড় অন্ধকার উত্তরোত্তর পুঞ্জে পুঞ্জে জমিয়া বসিতেছে, ইহাতে ভক্ত বাঁচিবে কেমনে? প্রাকৃত-বাহ্যচাকচিক্যময় নীরস শুষ্ক প্রপঞ্চরথে তাঁহার দারুব্রহ্ম মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তের ভাবসমুদ্র তীব্র বিরহের প্রলয়ঙ্করী অনুভূতি-বাত্যাতে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছে। সেই তরঙ্গাবলীর বহির্বিবর্ত্তরূপ অশ্রুধারা নদীর আকার ধারণ

করিয়া নয়নপথ দিয়া প্রবলবেগে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাই ভক্তের আকুল প্রাণ কান্দিয়া কান্দিয়া শ্রীভগবানের চরণে এই শেষের সম্বল নিবেদন করিতেছে, আর বলিতেছে,—

"তোমার সে অন্য বেশ অন্য সঙ্গ অন্য দেশ
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে তোমা না দেখিলে মরে
ব্রজজনে কি হবে উপায়॥"

তাই প্রার্থনা করি,—

"তুমি ব্রজের জীবন তুমি ব্রজের প্রাণধন
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ।
কৃপার্দ্র তোমার মন আসি জীয়াও ব্রজজন
ব্রজে উদয় করাহ নিজপদ॥"

বাঙ্গালী জীবনে রথযাত্রার প্রেরণা

চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর হৃদয়সর্ব্বস্ব নদীয়ায় প্রেমবন্যার প্রবর্ত্তক কাঙালের বাউল ঠাকুর গৌরহরি এই ভাবেরই আবেগে বিহ্বল হইয়া নীলাচলের রথে বামন দর্শন করিয়াছিলেন। ইহা নিশার স্বপন নহে, কবি-কল্পনার ভিত্তিহীন বিলাস নহে, ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনেতিহাসের সার সত্য, একথা যেদিন বাঙ্গালী ভুলিবে, সেদিন হইতে বাঙ্গালীর অস্তিত্ব অনন্ত কালসাগরে চিরবিস্মৃতির মোহময় অতলগর্ভে চিরদিনের জন্য ডুবিয়া যাইবে।

স্বরাজ-সাধনার দিগন্তব্যাপী ডিণ্ডিমনিনাদে বাঙ্গালার আকাশ পবন ও ভূমি মুখরিত হইয়া উঠিতেছে, বাঙ্গালার অনন্যসাধারণ বিরাট জাতীয় জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশাময়ী ঘোষণা আজ বাঙ্গালীর অবসন্ন জীবনে বিজয়িনী উষার আলোক ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার মঙ্গল মুহূর্ত্তে, আজ দলে দলে বাঙ্গালী হিন্দু নরনারী বাহিরের রথে আরূঢ় জগন্নাথকে আবার নিজ মনোময় রথে চড়াইয়া আন্তর বৃন্দাবনে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ব্যাকুলভাবে নীলাচলের পথে ধাবমান হইতেছে। শ্রীভগবানের চরণারবিন্দে প্রার্থনা এই যে, বাঙ্গালী নরনারীবৃন্দের এই রথযাত্রা দর্শন

সফল হউক, স্বরাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রেমের ডোরে বাঁধিয়া তাহাদের শূন্যহৃদয়রূপ বৃন্দাবনে সদ্ভাবময় নিকুঞ্জকাননে বিশ্বজনীন প্রীতির শান্তিময় সিংহাসনে বসাইয়া স্বরাজসাধনার মহীয়সী সিদ্ধিলাভে বাঙ্গালীর জীবন চরিতার্থ করুক।

বিশ্বরূপের অমৃতবাণী

ভক্তিভরে বিশুদ্ধচিত্তে রথারূঢ় শ্রীভগবানের নিকট এইভাবে আমাদের প্রার্থনা কখনই নিষ্ফল হইতে পারে না, এই বিশ্বাস প্রত্যেক দর্শনার্থী বাঙ্গালীর হৃদয়কে যেন পরিত্যাগ না করে। কুরুক্ষেত্রে দর্শনলালস ব্রজগোপিকাগণের প্রার্থনায় তিনি যাহা উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাই যেন আমাদের চিরবিক্ষুব্ধ সংসার-সমুদ্রে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানহারা ভাসমান জীবনতরীর ধ্রুবনক্ষত্ররূপে অভিমানের মেঘ হইতে নির্ম্মুক্ত হৃদয়াকাশে ধ্রুব জ্যোতিঃবিকিরণের জন্য সর্ব্বদা সমুদিত থাকে। কুরুক্ষেত্রের তড়িদ্বিকাশবৎ অচিরস্থায়িমিলনের অন্তিমক্ষণে বিরহভাবনায় ব্যাকুল ব্রজবাসিনী গোপিকাগণকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন,—

"বায়ুর্যথা ঘনানীকং তৃণং মূলং রজাংসি চ।
সংযোজ্যাক্ষিপতে ভূয়স্তথা ভূতানি ভূতকৃৎ॥
ময়ি ভক্তির্হি ভূতানাং অমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্ মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥
অয়ং হি সর্ব্বভূতানামাদিরন্তোঽন্তরং বহিঃ।
ভৌতিকানাং যথা খং বা ভূর্বায়ুর্জ্যোতিরঙ্গনাঃ॥

(শ্রীমদ্‌ভাগবত দশম স্কন্ধ, ৮২ অধ্যায়)

"হে ব্রজগোপীগণ! বায়ু যেমন মেঘাবলী, তৃণ, মূল ও ধূলিনিচয়কে কিয়ৎকালের জন্য সংযুক্ত করিয়া আবার বিযুক্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ ভূতস্রষ্টা সেই সনাতন পুরুষই প্রাণিনিচয়কে এই সংসারে মিলিত ও যুক্ত করিয়া থাকেন। এই সংযোগ-বিয়োগরূপ জন্মমরণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের একমাত্র উপায়, আমার প্রতি প্রেমলক্ষণা ভক্তিই হইয়া থাকে, সেই ভক্তি বা ভালবাসাই তোমাদিগকে অনন্তকালের জন্য আমার সহিত মিলিত করিয়াছে; এ মিলনে বিরহের সম্ভাবনা নাই। ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিও, আমিই সকলের আদি, আমিই সকলের অন্ত, আমিই সকলের বাহিরে, আবার আমিই সকলের অন্তরে সর্ব্বদা একরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছি। যেমন ভৌতিক প্রপঞ্চের সহিত

তাহার উপাদান আকাশ, অগ্নি, বায়ু, জল ও পৃথিবীর কখনও বিয়োগ হয় না—প্রপঞ্চের অন্তর ও বাহিরে প্রপঞ্চের উপাদান ও আশ্রয়রূপে ইহারা সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে, আমিও সর্ব্বপ্রপঞ্চে সেইরূপে সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছি ॥"

রথযাত্রায় শ্রীভগবানের এই চিদানন্দময় বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া বাঙ্গালী নরনারীর স্বরাজ-সাধনায় অক্ষয় সিদ্ধি হউক, ইহাই রথারূঢ় বামনদেবের শ্রীচরণে অকিঞ্চনের প্রার্থনা।